অন্য প্ল্যানেটের মানুষ

দ্বিতীয় পর্ব

বিমল সরকার

পরিবেশনায় :
দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
অমৃত পাবলিশার্স
৬৭২ ব্লক ও
কলিকাতা-৭০০০৫৩

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৮

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—গৌতম রায়

মুদ্রক :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস

ভারতবর্ষের মধ্যে বম্বে শহরের কোলাবা, গেট অব ইণ্ডিয়া, মেরিণ-ড্রাইভ এইসব জায়গার লোকালয়, রাস্তা, দোকান-পসার, হোটেল-মোটেল প্রভৃতি দেখলে মনে হবে ভারতবর্ষের কোন শহরের কোন জায়গার সাথে বম্বে শহরের এইসব জায়গার কোন তুলনা চলে না। তাই অ্যারাবিয়ানরা বম্বে শহরের এই জায়গাগুলি বেছে নিয়েছে। তারা দলবল নিয়ে, পুরো পরিবার নিয়ে মাসের পর মাস এইসব জায়গার বাছাই করা হোটেলগুলিতে থাকছে।

কলগার্লের প্রথা বম্বে শহরের এই সব হোটেল-গুলিতেই বিস্তারিত। অনেক বাঙ্গালী মেয়েরাও এই কলগার্লের উপজীবিকায় মত্ত হয়ে গিয়েছে।

অ্যারাবিয়ানদের অর্থের প্রাচুর্য্য এতো—অ্যারাবিয়ান ছাড়া অন্য টুরিষ্টদের এইসব জায়গার হোটেলে স্থান পাওয়া খুবই কষ্টকর।

এইসব জায়গার কোন এক হোটেলের পটভূমিকায় অ্যারাবিয়ানদের রোমান্স নিয়ে কিছু অংশ এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

তবে এই গ্রন্থের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক।

গ্রন্থকার

সমর্পণ

দেবাদীদেব মহাদেব
শ্রীভগবানের পাদপদ্মে
এই গ্রন্থখানি ভক্তিভরে
অর্পণ করিলাম

এই উপন্যাসে প্রথম পর্বের শেষের কাহিনী হল নায়ক সুজিত চ্যাটার্জি বন্ধুপত্নী মিলির উপর ঘৃণিত লালসা চরিতার্থ করতে না পেরে প্রতিহিংসায় মিলির জীবনের সব শান্তি নষ্ট করে দেবার জন্য, মিলির তিন বছর বয়সের মেয়ে টিঙ্কুকে চুপিসারে নিয়ে পালিয়ে যায়, যখন টিঙ্কু পার্কে তারই সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করছিল আর টিঙ্কুর আয়া অন্য সব আয়াদের সাথে এক জায়গায় বসে গল্প করছিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সেই সন্ধ্যার আধা অন্ধকারে সুজিত টিঙ্কুকে ট্যাক্সি করে হাওড়া স্টেশন ছাড়িয়ে কিছু দূরে এক স্টেশনে নিয়ে গিয়ে প্লাটফরম থেকে অনেক দূরে রেললাইনের উপর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। সোজা ট্যাক্সি করে চলে আসে দমদম এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে এয়ারে আমেরিকায় চলে যায়।

রেললাইন ধরে টিঙ্কু লেভেল ক্রসিং-এর লাল আলোর দিকে হাঁটছে আর পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠে হাঁটছে আর কাঁদছে আর বলছে—পাপাজি, মামিজি, হামকো লে যাও।

সেদিন অপরাহ্নে তিনটে নাগাদ বম্বের নামজাদা হোটেল 'সমুন্দর কা সুন্দরীর মালিক ভার্মা সাহেবের চিঠি নিয়ে তার অতি বিশ্বস্ত লোক ম্যাক্ ও জুডা মারসিডিস্ গাড়ি করে বম্বে রোড ধরে কলকাতায় পৌঁছে, তাদের মালিকের নির্দেশমত বড়বাজার অঞ্চলে এসে মিস্টার বালাজী নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর সাথে দেখা করার জন্য তাদের গাড়ি নিয়ে মিস্টার বালাজীর বাড়ির সামনে থামল।

মিস্টার বালাজীর বাড়ির দারোয়ান দলবীর সিং ঐ মারসিডিস্ গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে দেখে দুবার তার বিরাট গোঁফ পাকিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাক্ ও জুডাকে জিজ্ঞাসা করল—আপলোক কিস্‌কো

চাহিয়ে। দারোয়ান দলবীর সিং এমনভাব দেখালো যে ঐরকম চকচকে মারসিডিস্ গাড়ি দেখে সে মোটেই অবাক হয়নি, সে এইভাব দেখালো যে এই রকম ক্রেন গাড়ি দেখাই তার অভ্যাস। মিস্টার বালাজীর বাড়িতে যারাই আসে তারা এই রকম গাড়ি করে আসে।

ম্যাক্ ও জুডা দারোয়ানকে বলল—তারা বম্বে থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে, তাদের সাহেব এই বালাজী সাহেবের বিশেষ বন্ধু, এই বলে তারা দারোয়ানের কাছে একটি শ্লিপ দিল। শ্লিপে ম্যাক্ লিখল—তারা 'সমুন্দর কা সুন্দরী' হোটেলের মালিক মিস্টার ভার্মার কাছ থেকে বিশেষ সীল করা খাম এনেছে, দেখা করা বিশেষ দরকার। তাদের হাতে সময় খুবই কম।

দারোয়ান ম্যাক্ ও জুডার কাছ থেকে শ্লিপ নিয়ে বালাজী সাহেবকে দিল। বালাজী সাহেব তখনই মিস্টার ভার্মার সাথে কথা বলছিলেন। মিস্টায় বালাজী ফোনে বললেন—মিস্টার ভার্মা, আপনার লোক এইমাত্র এখানে পৌঁছেছে। আমি এইমাত্র তাদের কাছ থেকে শ্লিপ পেলাম। চিন্তা করবেন না মিস্টার ভার্মা, সব ঠিক আছে—এই বলে ফোন রেখে দিলেন।

বালাজী তার দারোয়ানকে বললেন, যে সাহেবরা এইমাত্র এসেছেন তাদেরকে সসম্মানে আমার কাছে নিয়ে এসো।

দারোয়ান তার সাহেবকে সেলাম করে বাইরে এসে ম্যাক্ ও জুডাকে বলল—আপ্‌লোক মেহেরবানি করকে ভিতরমে চলিয়ে, হামারা সাব আপ্‌লোককা লিয়ে বৈঠা হ্যায়। এই বলে দারোয়ান ম্যাক্ ও জুডাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। একটা ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বলল—আপ্‌লোক ভিতরমে যাইয়ে, হমার সাব এই কামরাকা ভিতরমে বৈঠা হ্যায়, ঘাবড়াইয়ে মত্। হামারা সাব বহুত আচ্ছা আদমি হ্যায়।

ম্যাক্ ও জুডা দেখল ঐ ঘরের দরজায় বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা—'ENGAGED—DO NOT

DISTURBE' তারা দারোয়ানের কথামত অটোমেটিক স্প্রিং ডোর ঠেলে ঐ কামরার ভিতরে ঢুকল, ঢুকেই তারা দেখল, একজন পঞ্চাশ বছর বয়সের বেশ শক্তসামর্থ লোক বসে আছেন। এক পলকে ম্যাক্ তার ভার্মা সাহেবের চেহারার বর্ণনার সাথে বালাজী সাহেবের চেহারা মিলিয়ে নিল। ম্যাক্ মনে মনে বুঝতে পারল তার ভার্মা সাহেব এই বালাজী সাহেবের চেহারার যে রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বালাজী সাহেব ঠিক সেই রকমই দেখতে।

ম্যাক ও জুডা বালাজী সাহেবকে অভিবাদন করে বলল—আমি ম্যাক্, আর জুডাকে দেখিয়ে বলল, ও আমার সহকর্মী, ও বন্ধু জুডা। আমরা বম্বের 'সমুন্দর কা সুন্দরী' হোটেলের মালিক ভার্মা সাহেবের কাছ থেকে এসেছি। বাই রোড গাড়ি করে এসেছি। আপনার জন্য একটা সীল করা খাম আমাদের ভার্মা সাহেবের কাছ থেকে এনেছি—এই বলে বালাজী সাহেবকে একটা সীল করা খাম তার পকেট থেকে দিল।

বালাজী সাহেব ম্যাক্ ও জুডাকে বললেন—আমি আপনাদের কথা সব জানি। এইমাত্র ভার্মা সাহেবের সাথে আপনাদের সম্বন্ধে সব কথা হল। আপনাদের জন্যই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি—এই বলে ওদেরকে বসতে বলে মিস্টার বালাজী ভার্মা সাহেবের সীল করা খামখানা নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলেন।

মিস্টার বালাজী খামখানা খুলে দেখলেন তার নামে চার লাখ টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফট্। ঐ ড্রাফটের সাথে মিস্টার ভার্মা একটা চিঠিও দিয়েছেন। মিস্টার বালাজী চিঠিটা পড়লেন—

প্রিয় মিস্টার বালাজী,

আপনার সাথে আমার যে কথা হয়েছে সেই কথামত আমি আমার দুজন বিশ্বস্ত লোক ম্যাক্ ও জুডাকে দিয়ে চার লাখ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট পাঠালাম। আপনার যে জিনিস দেওয়ার কথা হয়েছে এবং যার জন্য এই চার লাখ টাকা পাঠালাম সেই

জিনিস ম্যাক্ ও জুডায় হাতে দিয়ে দেবেন, যেন অন্যথা না হয়। যদিও ওদের আপনার ওখানে পৌঁছোবার আগেই ফোনে আপনার সাথে কথা বলব। হ্যাঁ—আর একটা কথা মিস্টার বালাজী, আমার লোকদেরকে আপনার এরিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে আসার বন্দোবস্ত করবেন। আপনি আপনার ওদেশের বিরাট নামজাদা ব্যবসায়ী। আপনার নিশ্চয়ই সব মহলের লোকেদের সাথে পরিচয় আছে। আমার লোকেরা আমাদের মহারাষ্ট্রের সীমানায় পৌঁছে গেলে আর কোন ভয় থাকবে না। তারপর থেকে ওদের বম্বে আসা পর্যন্ত সব দায়িত্ব আমার। আপনার আর কোন ঝুঁকি থাকবে না। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমাদের লোকেদের নিরাপদে ফিরে আসার দায়িত্ব আপনার। নমস্কার।

ইতি—ভবদীয়
মিস্টার ভার্মা

মিস্টার বালাজী মনে মনে বললেন চিঠিতে এই সব লিখে সতর্ক করার কী প্রয়োজন আছে। আমার এরিয়াতে যদি আমার এই ব্যবসার জন্য ফ্রিলি লোকজন আসতে যেতে না পারে তবে কি করে এত লাভজনক ব্যবসা করব। আগে থেকেই সেইজন্য বন্দোবস্ত করে রেখেছি যাতে মিস্টার ভার্মার লোকেরা নিরাপদে ফিরে যেতে পারে।

মিস্টার বালাজী তার সিক্রিট ওয়াল আয়রণ চেষ্ট খুলে একটা ছোট এটাচি ও চারখানা সীল-করা খাম বের করে নিয়ে এলেন। এটাচিটা ম্যাকের হাতে দিয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই এটাচি ভার্মা সাহেব ছাড়া আর কারোর হাতে দেবেন না। এটা ভার্মা সাহেবেরর পার্শোনাল জিনিস। তারপর চারখানা সীল-করা খাম দিয়ে বললেন, এগুলি আপনাদের মহারাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছোবার মহৌষধ। দেখবেন প্রত্যেক খামে এক নম্বর, দু নম্বর,

তিন নম্বর, চার নম্বর করে লেখা আছে। আপনাদের মহারাষ্ট্রের সীমানায় পৌঁছোতে চারটে চেকপোস্ট আছে। যখনই যে চেকপোস্টে পৌঁছোবেন, সেই চেকপোস্টের লোকজন যেই চেক করতে আসবে তাকেই সেই নাম্বারের খাম দেবেন। তারা আমার খামের নিশানা জানে। আপনারা নিরাপদে সেই চেকপোস্ট বিনা চেকিং-এ পার হয়ে যাবেন।

ম্যাক্ ও জুডা মিস্টার বালাজীকে অভিবাদন করে এটাচি ও খাম চারখানা নিয়ে ঐ কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের গাড়িতে বসল। মিস্টার বালাজীর দারোয়ান দলবীর সিং উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাক্ ও জুডাকে সেলাম করল কিন্তু ওরা সেদিকে ফিরেও তাকাল না।

ম্যাক্ স্টিয়ারিং ধরে বসল আর জুডা ম্যাকের পাশে বসল। মুহূর্তে ওদের মারসিডিস্ গাড়ি বড়বাজার এলাকা ছাড়িয়ে হাওড়া ব্রিজ ক্রস করে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে বম্বে রোডের দিকে ছুটল। ম্যাক্ স্টিয়ারিং ধরে অ্যাকসেলিটারে ক্রমশঃ চাপ দিতে লাগল। জুডা দেখল মাইল মিটারে একশ কিলোমিটারের কাছে স্পীড উঠে গিয়েছে। জুডা বলল—ম্যাক্, তুমি এত স্পীডে যাচ্ছ কেন? ম্যাক্ বলল—এই পশ্চিমবাংলার বর্ডার তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে হবে আমাদের, ভার্মা সাহেবের এই নির্দেশ।

ম্যাক্ তার গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোতে দেখল সামনেই একটু দূরে রেলের লেভেল ক্রসিং এবং লেভেল ক্রসিংয়ের গেট উঁচু থেকে নিচুর দিকে নেমে আসছে। গেট নিচে নেমে এলেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার গেট খুলতে অনেক সময় লাগবে। তাই ম্যাক্ একটু বেশী স্পীড দিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট নিচে পড়ার আগেই বেরিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করল কিন্তু তা হল না। গাড়ি লেভেল ক্রসিংয়ে পৌছোবার আগেই অটোমেটিক গেট বন্ধ হয়ে গেল। ম্যাক্ বাধ্য হয়ে ব্রেক কসে গাড়ি থামিয়ে দিল।

জনমানবশূন্য জায়গা। বম্বে রোডের গাড়ি যাতে রেলের সাথে ধাক্কা না লাগে তাই এই অটোমেটিক লেভেল ক্রসিং।

ধারে কাছে কোন লোকালয় নেই যে টিঙ্কুর কান্না শুনে টিঙ্কুকে বাঁচাতে আসবে। টিঙ্কু দেখল দূর থেকে একটা আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে তারই দিকে ছুটে আসছে। সেই আলো দেখে টিঙ্কু পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হয়ে সেই উজ্জ্বল আলোর দিকে দৌড়াতে লাগল। ঠিক সেই সময় ম্যাক্ ও জুডার গাড়ি লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে থামল।

ম্যাক্ তার গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোতে টিঙ্কুকে ওই অবস্থায় দেখে বলল—জুডা 'আই মাস্ট সেভ দ্যা বেবি', 'আই মাস্ট সেভ দ্যা বেবি' এই বলে ম্যাক্ গাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। জুডো ম্যাককে বাধা দিয়ে বলল—ম্যাক্, 'আর ইউ ম্যাড। তুমি এই মেয়েটা বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ হারাবে।

ম্যাক্ জুডার কথায় কর্ণপাত না করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—জুডা, 'আই শ্যাল টেক দ্যা রিস্ক' এই বলে ম্যাক দৌড়ে গিয়ে টিঙ্কুকে কোলে নিয়ে রেললাইন থেকে এক পা বেরিয়েছে তখনই ট্রেনটা বায়ুবেগে হুশ করে ওদের পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলে গেল।

ট্রেনটা ম্যাকের গা ঘেসে চলে যাওয়াতে এবং ট্রেনটার গতির আচমকা বাতাসে ম্যাক্ দারুন শক্ পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে টিঙ্কুকে নিয়ে মাটিতে রেললাইনের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

রেলগাড়িটা নিমেষে ছুটে চলে গেল। দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। খালি দেখা যাচ্ছে রেলগাড়িটার পিছনের লাল আলো। তাও নিমেষে অন্তর্ধান হয়ে গেল। জুডা ম্যাকের এই ক্রিয়াকলাপ দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। জুডা যখন দেখল রেলগাড়িটা চলে যাওয়ার সাথে সাথে ম্যাক্ সেই মেয়েটিকে নিয়ে রেললাইনের কাছে পড়ে গেল তখন জুডা ভাবল

নিশ্চয়ই ম্যাক্‌ ও সেই মেয়েটি ট্রেনে কাটা পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

জুডার বিমূঢ় ভাব কেটে গেলে জুডা দৌড়ে গিয়ে দেখল ম্যাক্‌ ঐ মেয়েটিকে নিয়ে রেল লাইনের বাইরে পড়ে আছে। ম্যাকের জ্ঞান নেই। মেয়েটিকে ম্যাক ঠিক নিজের মেয়ের মত বুকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে কিন্তু সেই মেয়েটির জ্ঞান হারায়নি। ম্যাকের বুকে শুয়ে পাপাজি, মামিজি বলে কাঁদছে।

জুডা দৌড়ে গিয়ে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে একটা জলের বোতল নিয়ে এল। ম্যাকের চোখে, মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাক চোখ মেলে তাকাল। জুডাকে সামনে দেখে ম্যাক বলল – জুডা, আমাদের কিছু হয়নি তো? জুডা বলল—তোমাদের কারোর কিছু হয়নি। ভগবান তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। রেলগাড়িটা বায়ুগতিতে চলে যাওয়ায় সাথে সাথেই তুমি মেয়েটিকে কোলে নিয়ে রেললাইনের উপর পড়ে গেলে, আমি ভেবেছিলাম তোমরা দুজনে ট্রেনে কাটা পড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছ, কিন্তু দৌড়ে এসে দেখলাম তোমরা রেললাইনের বাইরে পড়ে আছ। তোমাদের শরীরে কোন চোট লাগেনি। তোমার মত সাহসী লোকও ভয়ে এবং শকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে। এখনি ওঠ, চল।

ম্যাক মেয়েটিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। জুডা বলল—দেখ ম্যাক, খুব হয়েছে। মেয়েটিকে প্রাণে বাঁচিয়েছ এই যথেষ্ট। এই মেয়েটিকে সাথে করে নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। দেখছ না, এই মেয়েটি কিভাবে পাপাজী মামিজী বলে কাঁদছে। ওকে সাথে নিয়ে গেলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ভাল ফ্যামিলির মেয়ে এবং কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন বড় অবাঙ্গালী ঘরের মেয়ে। মেয়েটিকে খুঁজে বের করার জন্য ওর বাবা এবং মা নিশ্চয়ই পুলিশে এবং সব মহলে খবর দিয়েছেন। ওর

আত্মীয়স্বজনরাও হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমরা এখন মেয়েটিকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনেও জমা দিতে পারছি না, সেটা হবে আরও বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। তার থেকে মেয়েটিকে রেখে চলে যাই।

হঠাৎ মেয়েটি ম্যাকের কোলে বসে ম্যাককে বলল—আংকেল, 'হামকো পাপাজী মামিজী কা পাস্ লে চল'।

তার এই কথা শুনে ম্যাক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল—তোমকো পাপাজী আউর মামিজী কা পাস্ লে যায়গা।

আর জুডাকে বলল—দেখ জুডা, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখ কি লাভলি চেহারা। একে বাঁচাবার জন্য আমার জীবন দিতে গিয়েছিলাম, আর এই অন্ধকারে নির্জন জায়গায় একে ফেলে রেখে যেতে বলছ? তা কখনই হতে পারে না। আমরা দুনম্বর কাজের লাইনের লোক হতে পারি কিন্তু এরকম পশুর মত কাজ কখনই করতে পারব না। আমি যখন আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছি তখন আমি সব রকম বিপদেরও ঝুঁকি নেব। আমার তো কোন খারাপ মতলব নেই। আমেরিকার দেশের মত —সেই দেশে শুনেছি দুনম্বর লাইনের লোকেরা ধনী সাদা ফ্যামিলি ছেলে-মেয়েদেরকে চুরি করে নিয়ে যায়, তারপর ওরা সেই সব ছেলে-মেয়েদের বাবা মার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়ে ফিরিয়ে দেয়। সেইজন্য সাদারা, কালোরা যেখানে থাকে সেই এরিয়াতে কিছুতেই থাকে না। আমার এই মেয়েটির বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফিরিয়ে দেবার কোন ইচ্ছা নেই। আমরা আমাদের ভার্মা সাহেবের খুবই বিশ্বস্ত লোক। আমাদের সাহেবকে না বলে কোনদিনই কিছু করিনি এবং করব না। স্রেফ নিয়ে গিয়ে সাহেবের কাছে এই মেয়েটিকে পৌঁছে দেব। দেখ আমাদের সাহেব এই মেয়েটিকে খুব ভালভাবে রেখে মানুষ করবেন। এই বলে ম্যাক্ মেয়েটিকে কোলে নিয়ে গাড়ির পিছনের সীটে গিয়ে বসল।

ম্যাক জুডাকে বলল—আমি এই শক পেয়ে বেশ নার্ভাস অনুভব করছি। কিছুক্ষণ আরাম না করে আমার পক্ষে এখন গাড়ি চালান সম্ভব নয়। তুমি গাড়ি চালাও এবং একটু স্পীডেই চালাও।

জুডা স্টিয়ারিং ধরে বসল। স্টার্ট দিয়ে ফাস্ট গীয়ার দেবে, সেই সময় ম্যাক বলল—জুডা, আমি শক পেয়ে খুবই নার্ভাস ফিল করছি। প্লিজ আমাকে এক পেগ হুইস্‌কি দাও। হুইস্‌কি পেটে পড়লেই নার্ভাসনেস কেটে যাবে।

জুডা গাড়ির ড্যাস বোর্ড থেকে ফরেন হুইস্‌কির বোতল, গ্লাস ও জলের বোতল বের করে, দুটো গ্লাসে হুইস্‌কি ঢেলে জল মিশিয়ে একটা গ্লাস ম্যাককে দিল ও নিজে একটা গ্লাস নিল। ম্যাক্ 'গুড লাক ফর মাই বেবি' এই বলে গ্লাসে চুমুক দিল।

জুডা বলল—এখন আমি গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছি। এই অন্ধকারে, এই নির্জন জায়গায়, লেভেল ক্রসিংএর কাছে গাড়ি থামিয়ে এই মেয়েটিকে নিয়ে আর থাকা উচিত হবে না। যে কোন সময় পুলিশের ওয়ারলেস ভ্যান এসে আমাদেরকে চেক করতে পারে।

শুনেছি পশ্চিম বাংলার পুলিশ এই সব ব্যাপারে খুব অ্যালার্ট। আর দেখছ এই মেয়েটি কিভাবে পাপাজী, মামিজী বলে কাঁদছে।

ম্যাক বলল—জুডা, তুমি যেটা ভাল মনে করবে তাই করবে। এখন আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

জুডা তার গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে, গ্লাসটা পাশে রেখে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বম্বে রোড ধরে ছুটে চলল।

ম্যাক্ টিঙ্কুকে নিয়ে পিছনের সিটে বসে হুইস্‌কির গ্লাসে চুমুক লাগাল। তখন ম্যাক্ ভাবল এই মেয়েটিকে একটু হুইস্‌কি খাওয়াতে পারলে, এই হুইস্‌কির গুণে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়বে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর চিন্তার বা ভয়ের কারণ থাকবে না। এই ভেবে ম্যাক্ তার হুইস্‌কির গ্লাস টিঙ্কুর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল—থোড়া পিও বেবি।

টিঙ্কু অমনি হুইস্‌কির গ্লাস মুখের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল—নেহি, আংকেল হম নেহি পিয়েগা, হম চকলেট খায়গা। ম্যাককে টিঙ্কু এইভাবে আংকেল বলাতে, ওরা উভয়ে অবাক হয়ে গেল। ওরা তো জানে না যে টিঙ্কুর আংকেল ও ভাইয়া বলার অভ্যাস আছে। পাপাজীর মত বন্ধু স্থানীয় লোক দেখলেই আংকেল বলে এবং মামিজীর মত মহিলাদের আণ্টি বলে ডাকে ও বয়, বেয়ারা ও ড্রাইভার প্রভৃতি লোকদেরকে ভাইয়া বলে ডাকে যেমন টিঙ্কুদের ড্রাইভারের নাম ছিল সরোজ। তাকে টিঙ্কু সরোজ ভাইয়া বলে ডাকত।

ম্যাক্ টিঙ্কুর মুখের কাছ থেকে গ্লাস সরিয়ে নিয়ে বলল—মাই বেবি আভি তুমকো ক্যাডবারি চকলেট কিনকে দেগা।

চকলেটের নাম শুনে টিঙ্কুর কান্না থেমে গেল। ম্যাক্ টিঙ্কুকে বলল—তোমার পাপাজী, মামিজী কা পাস্ জরুর লে যায়গা।

পাপাজী ও মামিজীর নাম শুনে টিঙ্কু অমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল, আর বলল—অংকেল হামকো ছোড়কে কাঁহা চলা গিয়া। ম্যাককে বলল—আংকেল হামকো পাপাজী মামিজী কা পাস লে চল।

টিঙ্কুর এই কথা শুনে ম্যাকু জুডাকে বলল—টিঙ্কুর কথা শুনেছ? টিঙ্কুর কথায় আমার মনে হচ্ছে, বিশেষ জানাশুনা লোকের সাথে টিঙ্কু বেরিয়েছিল, হয়ত কোন কারণে সেই লোক টিঙ্কুর এই অবস্থা করেছে, আর তা না হলে তার কাছ থেকে টিঙ্কু হারিয়ে গিয়েছে।

টিঙ্কুকে ম্যাক্ অনেকবার জিজ্ঞাসা করল—তোমারা নাম কেয়া? তোমারা পাপাজীকা নাম কেয়া? তোমারা পাপাজী কাঁহা রহতে হ্যায়?

কিন্তু টিঙ্কু এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। খালি বলে চলল—আংকেল হমকো পাপাজীকা পাস লে চল।

টিঙ্কুর কথায় ম্যাক্ বুঝতে পারল টিঙ্কু খালি পাপাজী, মামিজী,

আংকেল এই সব কথাই বলতে শিখেছে। খালি এই সব কথাই বলতে পারে। আর কোন কথা বোঝে না আর বলতেও পারে না।

ম্যাক্ আর সে দিকে না গিয়ে, অর্থাৎ টিঙ্কুকে ওর পাপাজীর অথবা মামিজীর কথা জিজ্ঞাসা না করে টিঙ্কুর মুখের কাছে আবার গ্লাস নিয়ে গিয়ে বলল—মেরা বেবি থোড়া পিও। টিঙ্কু অমনি বলল—হাম পুরা খা লেগা। এই বলে গ্লাসে একটু চুমুক দিল। তারপর মুখটা ভ্রূকুটি করে মুখের কাছ থেকে গ্লাস সরিয়ে দিয়ে বলল—নেহি হাম চকলেট খায়গা।

তখন জুডা গাড়ি নিয়ে বম্বে রোডের একটা বড় পেট্রল পাম্পে ঢুকিয়ে দিল। এই বম্বে রোডে পনের কুড়ি মাইল অন্তর অন্তর বেশ বড় বড় পেট্রল পাম্প আছে। সেই পেট্রল পাম্পগুলিতে ভাল হোটেল আছে এবং স্টেশনারি জিনিষও পাওয়া যায়। এই বম্বে রোডের সবরকম গাড়ির আরোহীদের, ট্রাকের লোকজনদের খাবার এবং বিশ্রাম নেবার বন্দোবস্ত আছে। আবার দূর পাল্লার বাস-যাত্রীদেরকে বাসড্রাইভাররা এই সব পেট্রল পাম্পে বাস নিয়ে এসে সকালে প্রাতকৃত করায় এবং দিনে ও রাত্রে আহার করিয়ে নেয়। পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা বাথরুমের বন্দোবস্ত আছে।

জুডা পেট্রল পাম্পে গাড়ি থামিয়ে বলল—ম্যাক্, আমি বাথরুমে যাচ্ছি—এই বলে জুডা বাথরুমের দিকে চলে গেল। জুডার চালচলনে মনে হল—সে ম্যাকের উপর খুব বিরক্ত হয়েছে, এই মেয়েটিকে ম্যাক্ নিয়ে এসেছে বলে। ম্যাক্ও টিঙ্কুকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে প্রস্রাব করল, তারপর ওই পেট্রল পাম্পের স্টেশনারি দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা বড় ক্যাডবারি চকলেট কিনে দিল। ক্যাডবারি চকলেট পেয়ে টিঙ্কু মহা আনন্দে ম্যাকের কোলে বসে চকলেট খেতে লাগল।

জুডা বাথরুম থেকে ফিরে এসে ম্যাককে বলল—চল আমরা এই

পেট্রল পাম্পের হোটেল থেকেই রাতের খাওয়া সেরে নিই। ওরা টিঙ্কুকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে বসল। টিঙ্কু দেখল পাশের টেবিলে বসে একটা লোক ইয়া বড় একটা চিকেনের ঠ্যাং ধরে খাচ্ছে। তাই দেখে টিঙ্কু ম্যাককে বলল—'আংকেল হাম চিকেন খায়গা।'

টিঙ্কুকে ম্যাক তার কোল থেকে নামিয়ে পাশের চেয়ারে বসাল। ম্যাক্ বেয়ারাকে ডেকে তিন প্লেট পরটা এবং তিন প্লেট চিকেন মসল্লার অর্ডার দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বেয়ারা তিন প্লেট পরটা এবং তিন প্লেট চিকেন মসল্লা দিয়ে গেল।

ম্যাক্ টিঙ্কুকে এক প্লেট চিকেন ও এক প্লেট পরটা দেখিয়ে বলল—এই দোনো প্লেট তোমারা হ্যায়। তুম খা লেও।

টিঙ্কু তার জন্য আলাদা প্লেটে অত খাবার পেয়ে মহাখুশী। টিঙ্কু তো কোন দিন আলাদা বসে আলাদা প্লেটে খায়নি। পাপাজী, মামিজীর সাথেই বরাবর খেয়ে এসেছে। মামিজীই বরাবর খাইয়ে দিয়েছে। পাপাজী এবং মামিজী বাইরে কোনদিন পার্টিতে গেলে আয়া খাইয়ে দিত।

ম্যাক্ দেখল টিঙ্কু দু হাত দিয়ে চিকেনের ঠ্যাং ধরে খাবার চেষ্টা করছে কিন্তু খেতে পারছে না। দুহাত দিয়ে চিকেনের ঠ্যাং ধরা, আর পরটা খাবে কোন হাতে? ম্যাক বুঝল টিঙ্কুর নিজের হাতে খাবার অভ্যাস নেই। তখন ম্যাক্ পরটা একটু একটু করে ছিঁড়ে চিকেনের সাথে মুড়ে টিঙ্কুর মুখে দিতে লাগল। টিঙ্কুও বেশ আনন্দের সাথে খেতে লাগল। ম্যাক্ নিজের খাওয়া বন্ধ করে টিঙ্কুকে খাওয়াতে লাগল। টিঙ্কুর খাওয়া হয়ে গেলে, টিঙ্কুর হাত মুখ ধুয়ে মুছিয়ে দিয়ে, ম্যাক্ নিজে খেতে লাগল। জুডার অনেক আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ম্যাক্ জুডাকে বলল—তুমি গাড়িতে গিয়ে বস, আমি খেয়ে এখনি মেয়েটিকে নিয়ে আসছি।

জুডা খুব বিরক্তির ভাব দেখিয়ে হোটেল থেকে এসে গাড়িতে বসল; জুডা গাড়ির পিছনের সিটে বসল এবং মনে মনে বলল—

আমার ম্যাক্ বা ওই মেয়েটির উপর কোন সহানুভূতি নেই। একটা কাজ করতে আসলাম—সেই কাজ তো প্রায় হয়েই গিয়েছে, এখন ম্যাকের পাল্লায় পড়ে অন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছি। ধরা পড়লে আমি সব ফাঁস করে দেব। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে গুম হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে ম্যাক্ টিঙ্কুকে নিয়ে এসে দেখল—জুডা গাড়ির পিছনের সিটে গুম হয়ে বসে আছে। তাই দেখে ম্যাক্ রাগতভাবে জুডার দিকে তাকিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল। টিঙ্কু অত বড় চিকেনের ঠ্যাং খেয়ে এবং এত বড় ক্যাডবারি চকলেট পেয়ে খুব খুশী। ম্যাক্ টিঙ্কুকে তার পাশে বসিয়ে দিল।

ম্যাক্ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে, ফাস্ট গীয়ার দিয়ে অ্যাকসেলিটারে পা দিয়ে চাপ দিয়ে নিমেষে পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। জুডার ব্যবহারে তার মেজাজ খিচিয়ে আছে। আবার টিঙ্কুকে খুশী দেখে ম্যাকের খুব ভাল লাগছে। ম্যাক পটাপট সেকেণ্ড গীযার, থার্ড গীয়ার দিয়ে, টপ-গীয়ার দিয়ে অ্যাকসেলিটারে খুব চাপ দিয়ে ৮০ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চালাতে লাগল। জুডা পিছনের সিটে বসে তার শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকল, ম্যাকের সাথে কোন কথাবার্তা বলল না। ম্যাক গাড়ির ভিতরের ট্র্যানজিস্টার রেডিওর বোতাম টিপে দিল। অমনি ট্র্যানজিস্টার থেকে রেডিও স্টেশনের গান ভেসে উঠল। মনে হল টিঙ্কুও গান শুনে মাথা দোলাচ্ছে। পরক্ষণে ম্যাক দেখল টিঙ্কুর চোখ ঘুমে বুজে আসছে। ম্যাক্ টিঙ্কুকে ওর কোলে শুইয়ে দিল। টিঙ্কু অঘোরে ঘুমতে লাগল।

হঠাৎ রেডিওতে বলল—এবার একটা খুব মারাত্মক খবর ঘোষণা করা হচ্ছে। এটা একটা সেনসেশন্যাল খবর—আজ কলকাতার বুকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি একটি তিন সাড়ে তিন বছরের মেয়ে—নাম টিঙ্কু, বাবার নাম

—অলক সেন, কলম্যান্ ইণ্ডাসট্রিস প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেকটর—টিঙ্কু একটি ফুটফুটে মেয়ে। দেখলেই তাকে আদর করতে ইচ্ছা করবে। সেই টিঙ্কুকে আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় যখন সে তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাথে পার্কে খেলা করছিল তখন টিঙ্কুর আয়ার অলক্ষে টিঙ্কুর বাবা অলক সেনের বাল্যবন্ধু সুজিত চ্যাটার্জি একটা ঘৃণিত আক্রোশের বশে টিঙ্কুকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সুজিত চ্যাটার্জিকে পুলিশ চেস্ করেছিল। কিন্তু তাকে ধরা যায়নি, দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে পুলিশ খোঁজ পেল একটু আগেই সুজিত চ্যাটার্জি বি ও এ সি প্লেনে করে এদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছে। সুজিত চ্যাটার্জি একজন আমেরিকান সিটিজেন। তার আমেরিকান পাসপোর্ট। কাজেই তাকে আর ফিরিয়ে আনার কোন পথ নেই। তবে খোঁজ নিয়ে এও জানা গেল—সুজিত চ্যাটার্জি একাই চলে গিয়েছে। কাজেই মনে হচ্ছে টিঙ্কুকে কলকাতার আশেপাশেই কোথাও রেখে গিয়েছে। টিঙ্কু সুজিত চ্যাটার্জিকে আংকেল বলে ডাকত এবং সুজিত চ্যাটার্জির খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, আর একটা কথা টিঙ্কুকে চেনবার একটা স্পেশাল চিহ্ন আছে, তার বাঁ-হাতের কব্জির উপর দিকে একটা উল্কা চিহ্নের মত ইংরাজীতে A.S. মেশিনে লেখা আছে। যেমন অনেকের হাতে দেখতে পাওয়া যায় ফুল বা পাখীর ছবি।. রেডিওতে আরও বলতে লাগল—আপনাদের সাহায্য ছাড়া টিঙ্কুকে খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, চেনা-জানা সবাইকে এই খবর দিয়ে অনুরোধ করুন। তারা যেন টিঙ্কুর কথা মনে রাখেন। সব সময়ই যেন চোখ, কান খুলে চলেন।

রেডিওতে এই খবর শুনে ম্যাক্ গাড়ীর স্পীড চল্লিশে নামিয়ে ফেলল। জুডাও বসে কান পেতে শুনছিল। টিঙ্কু তখন ম্যাকের কোলে অঘোরে ঘুমচ্ছিল। ম্যাক্ টিঙ্কুর হাত ঘুরিয়ে টর্চের আলোতে দেখল A. S. এই দুটি অক্ষর জ্বল জ্বল করছে।

রেডিওতে আবার বলল—আমরা এই ঘোষণাটা আবার রিপীট করছি—তখনই ম্যাক টেপ রেকর্ড বের করে টেপ করা শুরু করল। এবং আগাগোড়া সব খবরই টেপ করে নিল।

টিঙ্কু তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে ম্যাকের কোলে মাথা রেখে। ম্যাক খালি মনে মনে বলল ও মেয়েটির নাম টিঙ্কু। বাঃ কি সুন্দর নাম। সত্যি দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করবে। পিছনের সিট থেকে জুডা বলল—শুনলে তো ? রেডিওতে কি বলল ? তুমি ইচ্ছে করে নিজের ঘাড়ে বিপদ নিয়ে বসে আছ। ভাল চাও তো মেয়েটিকে রাস্তায় রেখে আমরা পালিয়ে যাই। পশ্চিম বাংলার এরিয়াতে এখনও আমরা রয়েছি। যে কোন মুহূর্তে ওয়ারলেস ভ্যান আমাদেরকে এসে চেক করতে পারে। আমাদের ভার্মা সাহেবের যে মহামূল্য জিনিস আমরা নিয়ে যাচ্ছি তাও হারাতে পারি। সেই মহামূল্য জিনিসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের চলা উচিৎ।

ম্যাক ক্যাচ শব্দ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিল। জুডা ভাবল যাক ভালই হল। ম্যাকের সুবুদ্ধি উদয় হয়েছে। মেয়েটিকে এইখানে রেখে আমরা নিরাপদে চলে যাব।

কিন্তু ম্যাক টিঙ্কুকে কোলে করে গাড়ি থেকে নেমে এসে জুডাকে আদেশের স্বরে বলল—জুডা, তুমি স্টিয়ারিং এ বসে গাড়ি চালাও। আমি পিছনের সিটে বসে টিঙ্কুকে নিয়ে থাকব—এই বলে ম্যাক পিছনের সিটের দরজা খুলল। জুডা গজ গজ করতে করতে পিছনের সিটের থেকে নেমে এসে স্টিয়ারিং ধরে বসল। আর ম্যাক টিঙ্কুকে নিয়ে পিছনের সিটে বসল। টিঙ্কুকে সিটের উপর শুইয়ে দিল এবং চাদর দিয়ে যত্ন সহকারে ঢেকে দিল। ম্যাক টিঙ্কুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, আর মনে মনে বলল—কী সুন্দর মুখ, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ম্যাক জুডাকে বলল—তোমার চেহারা তো দেখতে মানুষের মত। কিন্তু মানুষের কোন গুণই থাকবে না। এটা তো ঠিক না।

এই যে রেডিওতে বলল টিঙ্কুর আংকেল আক্রোশের বশে টিঙ্কুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। সেই লোক টিঙ্কুকে মেরে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার ভিতরেও একটু মনুষ্যত্ব আছে। যার জন্য টিঙ্কুকে মেরে ফেলতে পারেনি। টিঙ্কুর এই সুন্দর মুখ দেখলে কেউ ওকে মেরে ফেলতে পারবে না। তুমি কি করে বলতে পারলে এই রাতে, এই অন্ধকারে, এই রকম নির্জন জায়গায়, যেখানে ধারে কাছে অনেক শেয়াল শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে এই শিশুকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া মানে টিঙ্কুকে মেরে ফেলে দেওয়া।

ম্যাক আরও বলতে লাগল—দেখ জুডা, আমি আমার জীবনের রিস্ক নিয়ে যখন টিঙ্কুকে বাঁচিয়েছি, তখন শেষ পর্যন্ত সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে টিঙ্কুকে আমাদের ভার্মা সাহেবের কাছে পৌছে দেব। এর মধ্যে আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। যত বিপদই আসুক সব বিপদই আমি ফেস্ করব। তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তোমার টিঙ্কু:ক নিয়ে একটুকুও ভাবতে হবে না। তুমি গাড়ি চালিয়ে যাও।

জুডা গাড়ি চালাচ্ছে—জুডার চোখে তো ঘুম আসতেই পারে না। ওই রেডিওতে খবর শোনার পর থেকে দুশ্চিন্তায় ম্যাকেরও চোখ থেকে ঘুম চলে গিয়েছে। খালি পিছনের সিটে বসে ভগবানকে ডাকছে এবং মনে মনে বলছে—হাঁ কৃষ্ণ রক্ষা কর কৃষ্ণ।

জুডা হেডলাইটে দেখল—একটু দূরেই রাস্তায় বেশ উচু বাম্প—আর বড় হয়ফে লেখা রয়েছে—চেকপোস্ট। গাড়ির স্পীড কমাল। দরকার হলে চেকিং-এর জন্য থামাতে হবে।

জুডা ম্যাককে বলল—বি কেয়ারফুল। সামনেই বাম্প ও চেকপোস্ট। ম্যাক এক চোঁখ টিঙ্কুকে দেখে নিল। টিঙ্কু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। টিঙ্কুর আপাদ মস্তক চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর বালাজী সাহেব যে চারখানা সিল করা খাম দিয়েছিল তার থেকে এক

নম্বর খাম বের করে জুডাকে দিয়ে বলল—চেকপোস্টের লোক গাড়ির কাছে আসলেই এই খামখানা দিয়ে বলবে—কলকাতার থেকে বালাজী সাহেব আপনাদেরকে দেবার জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

জুডা চেক পোস্টের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দিল। তখন রাত বারটা বেজে গিয়েছে। চেকপোস্টের অফিসার তার অফিসের ভিতরে। গাড়ি থামলে দুজন সিপাহী গাড়ির কাছে আসলে, ম্যাকের কথামত জুডা খামখানা তাদের হাতে দিয়ে বলল কলকাতা থেকে বালাজী সাহেব আপনাদেরকে দেবার জন্য দিয়েছেন।

একজন সিপাহী বলল—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসছি। জুডা বলল—ঠিক হ্যাঁয়, একজন সিপাহী গাড়ির কাছে থাকল দাঁড়িয়ে, আরেকজন খামখানা নিয়ে অফিসারের সাথে দেখা করতে গেল। একটু বাদেই সেই সিপাহী ফিরে এসে বলল—আপলোক যাইয়ে। জুডা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে স্পীডে বেরিয়ে গেল।

ম্যাক পিছনের সিটে ঘুমের ভান করে চোখ বুজে বসেছিল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চেক পোস্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়াতে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে বসল। আর জুডাকে বলল—চেকপোস্টের লোকদের সাথে বেশী কথা বলোনি, খুব ভাল করেছে। এই রাতের মধ্যে বালাজী সাদেবের এরিয়ায় আর তিনটে চেক পোস্ট আমাদের ছাড়িয়ে যেতে হবেই। সকাল হবার আগেই আমাদের ভার্মা সাহেবের এরিয়াতে পড়তে হবে। তুমি এখন গাড়ি থামিয়ে আমার পাশে বস—আমি গাড়ি চালাব। আমার নার্ভ আবার সতেজ হয়েছে মনে হচ্ছে টিঙ্কু আর রাতে উঠবে না। সারা রাতই আমি গাড়ি চালাতে পারব।

ম্যাকের হাতে স্টিয়ারিং। মারসিডিস গাড়ি আবার সতেজ হয়ে উঠল। জুডা দেখল মাইল মিটারের ৮০ কিলোমিটারে কাঁটা। ম্যাক জুডাকে বলল—দেখ, জুডা, উই আর ডুইং সাম এ্যাক্‌সন্।

ভয় পেলে তো চলবে না। আমাদের জীবনের যা কাজ ভয় পেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সেই রাতের মধ্যে ম্যাক মিস্টার বালাজীর তিনখানা খাম দিয়ে তিনটে চেকপোস্ট পার হয়ে গেল। খালি রাস্তায় এক পেট্রল পাম্প থেকে ত্রিরিশ লিটার পেট্রল গাড়িতে ভরে নিল, সেই পেট্রল পাম্পে জুডার চা খাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ম্যাক বলল— না, এখন নয়। আগে আমরা ভার্মা সাহেবের এরিয়াতে যাই। তখন নিশ্চিন্তে চা খাওয়া যাবে।

এই ভোর পাঁচটা নাগাদ ম্যাক গাড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের সীমানায় তাদের ভার্মা সাহেবের এরিয়াতে এসে পৌঁছল। সেই এরিয়ায় প্রথম পেট্রলপাম্পে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে জুডাকে বলল—যাও, বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে এসো। তারপর আমরা একসাথে বসে চা খাব।

ম্যাক গাড়ি থেকে নেমে পিছনের সিটে এসে দেখল টিঙ্কুও ঘুম থেকে উঠেছে। ম্যাককে দেখে উঠে বসল এবং বলল--আংকেল হাম্ মামিজী পাপাজীকো পাস যায়গা। ম্যাক বলল—হা টিঙ্কু হাম আভি তুমকো পাপাজী মামিজী কা পাছ লে যায়গা। টিঙ্কু বসল হাম পোটি করে গা। টিঙ্কুকে ওর মামিজী ছোট থেকেই সকাল আটটার সময় বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বাথরুম করান অভ্যেস করিয়েছিলো আর দিল্লীতে ছোট সময়ে পাঞ্জাবী ফ্যামিলিদের সাথে থাকতে বাথরুম করাটা ওদের ভাষায় পটি করা বলত। তাই ওর মামিজী টিঙ্কুকে বাথরুম করাটা পটি করা বলা শিখিয়েছে, আর সেই অভ্যাসমত সকাল আটটা বাজলেই ওর বাথরুম পেয়ে যায়। এখন ওই পেট্রলপাম্পে এসে ওর পটি পেয়ে গেল। টিঙ্কু পটি করে গা বলাতে ম্যাক ঠিক বুঝতে পারল না। টিঙ্কু আবার বলল— আংকেল হম বাথরুমে পটি করে গা।

এইবার ম্যাক বুঝতে পেরে টিঙ্কুকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওর ইজার খুলে পায়খানায় বসিয়ে দিল, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে

ম্যাক বাইরে দাড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ বাদে টিঙ্কু আয়া আয়া বলে ডাকতে লাগল। ম্যাক বাথরুমের দরজা খুলে দেখল—টিঙ্কুর পটি করা হয়ে গিয়েছে এবং দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাক বুঝল টিঙ্কু জল দিয়ে ধোয়া শেখেনি, আয়াই ওকে ধুইয়ে দিত। তাই আয়া বলে ডাকল। ম্যাক আর কি করে—ওকে কলের কাছে নিয়ে গিয়ে ধুইয়ে দিল এবং ওর রুমাল দিয়ে মুছে ইজার পরিয়ে টিঙ্কুকে নিয়ে হোটেলে চলে এল। ম্যাক দেখল জুডা আগে থেকে এসে একটা টেবিল চেয়ার নিয়ে তারই অপেক্ষায় বসে আছে। ম্যাক টিঙ্কুকে নিয়ে জুডার পাশে দুটো চেয়ার নিয়ে বসল, একটা নিজে, আরেকটা টিঙ্কু। ম্যাক টিঙ্কুকে জিজ্ঞাসা করল—কেয়া খায়গা? টিঙ্কু অমনি বলল—চিকেন খায়গা, এগ্ খায়গা আউর চকলেট খায়গা। ম্যাক বুঝল টিঙ্কু এই তিনটে নামই শিখেছে। ম্যাক তিন প্লেট আলু পরটা ও তিন প্লেট অমলেট অর্ডার দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার চলে এল। ম্যাক তো জানে টিঙ্কু নিজের হাতে খেতে জানে না। কাজেই ও টিঙ্কুকে পরটা ছিড়ে ছিড়ে অমলেট দিয়ে খাইয়ে দিতে লাগল। টিঙ্কুর খাওয়া শেষ হলে একটা বড় ক্যাডবারি চকলেট ওই হোটেল থেকে কিনে টিঙ্কুকে দিল। টিঙ্কুতো অত বড় চকলেট পেয়ে এবং পেটভরে খেয়ে খুব খুশী, ম্যাক ওর খাবার খেয়ে গাড়িতে এসে বসল। এবার আর জুডাকে কিছু বলতে হল না। জুডা নিজে থেকেই স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে বসল! গাড়িতে পেট্রল ভর্ত্তি করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জুডা এখন অন্যমুডে গাড়ি চালাচ্ছে আর বলছে পশ্চিমবাংলা আর মহারাষ্ট্র, কলকাতা আর বম্বে কত তফাৎ। কলকাতা থেকে বেড়িয়ে আসতে তোমার কত সময় লেগেছিল? বল ম্যাক। ব্র্যাবোর্নে রোডে এসেই তো জ্যামের মধ্যে পড়েছিলাম। খালি গাড়ি আর গাড়ি কে আগে যাবে তার চেষ্টা। আর মানুষ আর মানুষ এত মানুষ আমি কোন শহরে দেখিনি। ওখানকার মানুষগুলোকে দেখেছ? যেখান সেখান দিয়ে

হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে। গাড়িগুলোকে চোখেই দেখ্ছেনা। ওই মানুষ-গুলোকে দেখলেই মনে হবে—গাড়িগুলোর উপর ভীষণ আক্রোশ। একটু যদি কারোর গায়ে লাগে, তবে একেবারে শেষ করে দেবে। ফুটপাত রয়েছে।—পেডেষ্ট্রীয়ান ক্রসিং রয়েছে, ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে। কিন্তু ওই মানুষগুলো আইনের ধার ধারে না। পুলিশের কথা তো শোনেই না, পুলিশও ভয়েতে ওদেরকে কিছু বলতে সাহস করে না। কিন্তু গাড়িগুলোকে দেখছ? বেশির ভাগ গাড়িই পুলিশের সিগন্যাল মেনে চলছে। আর আমাদের বোম্বেতে দেখেছ রাস্তায় যে মানুষগুলো চলে—সব ফুটপাত দিয়ে এবং রাস্তা পার হয় পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসং দিয়ে। গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হয় না। আর প্রায় রাস্তাই তো ওয়ান ওয়ে, কলকাতায় প্রায় সব রাস্তাই ডবল ওয়ে।

ম্যাক বলল আর এসব ভেবে কি হবে, যে দেশের মানুষ যে ভাবে ছোট থেকে দেখছে বড় হয়ে তাই করছে। আর একটা কথা তুমি হয়তো জান না। পশ্চিম বাঙলায় দুনম্বর কাজ খুবই কম হয়। যা নাকি আমাদের বম্বেতে খুবই বেশী। আর ওদেশে অন্যায় জুলুম করে রেহাই খুব কম লোকই পায়। একটু কিছু হলেই মিছিল নিয়ে বেড়িয়ে পরবে। ঘুরবে কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায়। ওদেশের ইউনিয়নগুলি খুবই স্ট্রং।

কোন কলকারখানায় বা অফিসে নিজেদের দাবি ছাড়াও উপর ওয়ালাদের জুলুম হলেই ধর্মঘট করে বসবে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা বম্বেতে এ সব হয় না।

ওরা সাড়ে বারটা নাগাদ আরেকটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি গিয়ে দুপুরের খাবার সেরে নিল। এখানেও চিকেনের ঠ্যাং পেয়ে টিঙ্কু খুব খুশি এবং দেখা গেল ক্রমশঃ টিঙ্কু স্বাভাবিক হয়ে আসছে। রাত এই বারটা নাগাদ ম্যাক ও জুডা টিঙ্কুকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে সমুন্দর কা সুন্দরী হোটেলে ঢুকল। বম্বে শহর চারিদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা।

ভার্মা সাহেব নিজের পছন্দমত বম্বে শহরের একটু দূরে দশ কাটা পরিমিত সমুদ্রের জল সমেত জায়গা কিনে অনেক টাকা খরচ করে এই হোটেল বানিয়েছেন। এই হোটেলে ঢুকতে সমুদ্রের পার থেকে কম করেও একশত মিটার লম্বা এবং পাঁচ মিটার চওড়া ফ্লোটিং রাস্তা পেরতে হবে। এই রাস্তায় বাউণ্ডারি ওয়াল ও দুই মিটারের মত উঁচু। এবং সেই বাউণ্ডারি ওয়াল লতাপাতায় ঘেরা, রাত্রে লাল, নীল আলোতে সাজানো থাকে। এই রাস্তার উপর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সমুদ্রের সেই উত্তাল গর্জন করে। অনেক রকমের অটোমেটিক লাইট জ্বলছে আর নিবছে। রোজ রাত দশটায় এই হোটেলের ছাদের উপর ট্যারেসে শো হয়। যতই রাত বাড়তে থাকে ততই শো জমে ওঠে। এই হোটেলের প্রায় সবই বাসিন্দা অ্যারাবিয়ান। অনেক অ্যারাবিয়ান ফ্যামিলি নিয়ে থাকে এবং অনেক অ্যারেবিয়্যান অনেক টাকা পয়সা নিয়ে আসে আমোদ স্ফূর্তি করতে।

সেই রাতে ম্যাক হোটেলে ঢুকতেই শুনল সেই রাত্রে স্পেশাল অ্যারেবিয়্যান নাইট শো হচ্ছে ট্যারেসে। ভার্মা সাহেবও সেখানে আছেন। ম্যাক জানে দু, তিন, মাস অন্তর ভার্মা সাহেব ধনী অ্যারে-বিয়্যানদের জন্য এইসব শোয়ের বন্দোবস্ত করেন, খুব সুন্দর মেয়েদের আনানো হয়। গান হয়, নাচ হয়, শেষে বিউটি প্যারেড হয়।

ম্যাক একহাতে এটাচি ও কোলে টিঙ্কুকে নিয়ে ওই ট্যারেসে গিয়ে ঢুকল। ম্যাক এই দৃশ্য দেখে বলল অপূর্ব—একটি সুন্দরী মেয়ে ক্যাবারে ডান্‌ছারের পোষক পরে ইংরাজীতে গাইছে আর নাচছে। আর সব নিমন্ত্রিত অ্যারোবিয়্যানরা দুপাশে লাইন করে বসে আছে আর দুপাশে দু লাইনের মাঝখানে বেশ চওড়া প্যাসেজ রয়েছে। সেই প্যাসেজে অনেকগুলো কাঠের ড্রাম সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক ড্রামে ককটেল ড্রিঙ্ক ভর্ত্তি। সেই সব ড্রামের মধ্যে বেশ লম্বা লম্বা পাইপ রয়েছে। পাইপের একটা দিক ড্রামের মধ্যে আরেকটা দিক

অ্যারেবিয়্যানদের মুখে, অ্যারেবিয়্যানরা সেই ড্রামের মদিরা পাইপ দিয়ে চুষে পান করছে আর নাচ দেখছে আর গান শুনছে। প্রত্যেক আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর গানের ও নাচের জন্য সুন্দরী চেঞ্জ হয়ে অন্য সুন্দরী আসছে। ম্যাক আর সুন্দরীদের পোষাক, খুঁতিয়ে দেখল না। কারণ ক্যাবারে ডানস্ প্রত্যেক রাত্রেই হয়। পোষাক তো একই রকম। ওর চোখে আর কোন বিশেষত্ব ধরা পরল না। খালি দেখল মেয়েগুলি সব নতুন। আরেকটা জিনিস দেখে ম্যাক মনে মনে বলল—হাঁ, এটা একটা নতুন জিনিস দেখছি, মাঝে মাঝে কয়েকটা মেয়ে স্টেজের অন্য পাশ দিয়ে এসে ওই মদিরায় ড্রামের মধ্যে থেকে দুহাত দিয়ে অ্যারেবিয়্যানদের গয়ে মদিরা ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর অ্যারেবিয়্যানরা খুব হো হো করে হেসে আনন্দ উপভোগ করছে। আবার কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে ওই মেয়েদেরকে ধরবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে কিন্তু হাত ধরলেও মেয়েগুলোর হাত নিমেষে অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে ওই আবছা আলোতে। আবার খানিকক্ষণ পরে এসে আবার ড্রাম থেকে মদিরা ছটাচ্ছে আবার অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে। এই রকম ভাবে ওই সুন্দরীরা অ্যারবিয়ানদের সাথে লুকোচুরি খেলছে। ম্যাক এও জানে সর্বশেষ আইটেম হবে বিউটি প্যারেড। তখন সব মেয়েরা বুকে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা নম্বর লাগিয়ে লাইন দিয়ে দাড়াবে। অ্যারেবিয়্যানরা মদিরার নেশায় মশগুল হয়ে—কে কোন মেয়েটিকে বিয়ে করে নিজের দেশে নিয়ে যাবে এবং সেই বিয়েতে কত টাকা উপঢৌকন দিতে পারবে তাই লিখ নিজের নাম ঠিকানা লিখে স্টেজের কাছে একটা সিল বক্স আছে। সেই বাকসে একটা ফাঁক আছে। সেই ফাঁকের মধ্যে লেখা ফেলে দিয়ে একে একে চলে যাবে। তাদেরকে মাত্র পনের মিনিট সময় দেবে। পনের মিনিট পর সব বিউটি প্যারেডের মেয়েরা একে একে চলে যাবে। অ্যারেবিয়্যানরা সব চলে গেলে ভার্মা সাহেব সেই সীল বাক্স নিয়ে নিচের কামরায় চলে যাবেন।

এই সব একটু ভেবেই ম্যাক টিঙ্কুকে কোলে নিয়ে 'মে আই কাম ইন স্যার' এই বলে স্টেজের পাশেই ভার্মা সাহেবের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

ভার্মা সাহেব 'টিঙ্কুকে' ম্যাকের কোলে দেখে টিঙ্কুর দিকে কিছু সময়ের জন্য তাকিয়ে থেকে বললেন—ম্যাক, এত সুন্দর ফুল তুমি কোথায় পেলে? ভার্মা সাহেব মুখ থেকে বেরিয়ে এল—এই মেয়ে বড় হলে কত সুন্দর হবে দেখতে, যে দেখবে তার মাথা ঘুরে যাবে। তুমি কোথায় পেলে বল ম্যাক।

ম্যাক টিঙ্কুকে কি ভাবে দেখেছে, রেললাইনের উপর কিভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে টিঙ্কুকে বাঁচিয়েছে, পরিশেষে রেডিওর খবর বলল—এবং টেপ করে নিয়ে এসেছিল তাও শোনাল। এরমধ্যে টিঙ্কু ম্যাকের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভার্মা সাহেব বললেন—তোমার এই সাহসিকতার জন্য, তোমার মনুষ্যত্বের জন্য তোমাকে এই দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিচ্ছি। এই বলে তার আয়রণ চেস্ট থেকে দশ হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল দিল।

ম্যাক বলল—স্যার, আমি জানি, আপনি আমার এই কাজ অ্যাপ্রীশিয়েট করবেন। এবং খুব ভালভাবে মেয়েটিকে মানুষ করবেন।

ভার্মা সাহেব বললেন—ম্যাক তুমি এই মেয়েটিকে পাশের কামরায় বিছানাতে শুইয়ে দিয়ে চলে যাও। এই মেয়েটির সম্বন্ধে তুমি কাউকে কিছু বলবে না আর জুডাকেও সাবধান করে দিও যেন কাউকে মেয়েটির সম্বন্ধে কোন কথা না বলে। মেয়েটিকে পেয়ে চিন্তায় বিভোর হয়ে ভাবছিল বড় হলে এই ধর পনের, ষোল বছর পর যখন গান, নাচ শিক্ষায় পারদর্শিনী হবে—কত লাখ টাকা আমি পাব। তারপর ম্যাকের দেওয়া এটাচি পেয়ে ভার্মা সাহেবের সম্বিত ফিরে এল আর মনে মনে বলল—আরে আমি পনের ষোল

বছরের পরের লাভের কথা ভাবছিলাম, আর এখন যে কত লাভ হবে এই এটাচির মধ্যের জিনিষে? এই বলে এটাচি খুলে তার মধ্যে জিনিস দেখে মনে মনে বলল—মিস্টার বালাজী আমাকে ঠকায়নি। যা বলেছি ঠিকই জিনিস দিয়েছে। এই বলে এটাচি লক করে আয়রণ সেফে রেখে দিলেন। ভার্মা সাহেব পাশের ঘরে গিয়ে আলোতে ভাল করে আরেকবার টিঙ্কুকে দেখে নিলেন। কী সুন্দর মুখ, কী সুন্দর বিউটি স্পট। রেডিওর খবরের টেপের সেই আইডেন্টিফিকেসন মার্ক দেখলেন বাঁ হাতের কব্জির উপর পরিস্কার A. S. মেশিনে লেখা রয়েছে। মনে মনে ভার্মা সাহেব ভাবল—এই লেখা নষ্ট করতে হলে এসিড দিয়ে পোড়াতে হবে, তাতে ফল ভাল হবে না। মেয়েটি খুব কান্নাকাটি করবে এবং জানাজানি হবার খুবই সম্ভাবনা আছে। না কোন দরকার নেই। কোথায় কলকাতা শহর আর কোথায় বম্বে শহর। এখানকার লোক এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারো এই সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে? সবাই এখানে কাজে ব্যস্ত, টাকা রোজগার করার জন্য ব্যস্ত যেভাবে অন্য সব মেয়েদেরকে মানুষ করেছি একে আরোও ভালভাবে মানুষ করব। এর দ্বারা আমি অনেক লাভবান হব।

এই ভেবে ভার্মা সাহেব ডায়াল করল—'ফোর নাইন থ্রী থ্রী জিরো ওয়ান। টেলিফোনের ওধার থেকে বলল—হ্যালো, আমি বিপিন ভাই বলছি। ভার্মা সাহেব বললেন—দেখুন বিপিন ভাই এইমাত্র আমার এক বন্ধু রজনী কাপুর তার সাড়ে তিন বছরের মেয়ে আমার কাছে দিয়ে বলল—এই মেয়েটির মা নেই। তার সেকেণ্ড ওয়াইফ এই মেয়েটিকে তার কাছে রাখতে রাজি নয়। আমাকেই মেয়েটিকে মানুষ করতে হবে।

বিপিন ভাই বললেন—ভার্মা সাহেব, তা এত রাত্রে কেন? ভার্মা সাহেব, তা এত রাত্রে কেন? ভার্মা সাহেব বললেন—তার বন্ধু তাকে বলছে—তার দ্বিতীয় স্ত্রী—এখনই এই রাত্রে বাড়ি থেকে

বের করে দিয়েছিল। তাই মানবতার জন্যে আমি রেখেছি—আর আধঘণ্টার মধ্যেই মেয়েটিকে নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি।

বিপিন ভাই বললেন—ভার্মা সাহেব আপনি যে কথা বললেন মেয়েটির সম্বন্ধে তাকে আশ্রয় না দিলে অমানুষের কাজ হবে। কিন্তু আপনার ভাবী আমাকে বলেছেন ভার্মা সাহেব আর মেয়ে দিলে রাখতে রাজি হবে না। কেন না ভার্মা সাহেবের কতকগুলো দেওয়া মেয়ে মানুষ করে বড় করলে, মেয়েদের বাবাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি এই বলে যে নিয়ে যাওয়া হয়—তারপর আর তাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনার ভাবী আর নতুন করে কোন মেয়ে মানুষ করতে রাজি হচ্চে না।

ভার্মা সাহেব বললেন—দেখুন বিপিন ভাই, আমি এই সব মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে গান নাচ শিখিয়ে মানুষ করে দিচ্ছি সেটা কী আমার ভাবীর চোখে খারাপ লাগছে? দেখুন বিপিন ভাই—আপনি আমাকে ভাল করে জানেন—আমার এই সব কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। আপনি ভাবিজীকে ভাল করে আমার কথা বুঝিয়ে বলবেন। যখন যে টাকা চেয়েছেন, পেয়েছেন। আরও দরকার হয়তো আরও দেব। এই মেয়েটিকে তিনটে ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত করবেন। ইংরাজী হিন্দী আর বাংলা। আর গান এবং নাচ। আপনার ওখানে মোট এখন কটি মেয়ে আছে? বিপিন ভাই বললেন—এমন সাতটি মেয়ে আছে। এই নতুন মেয়েটিকে নিলে আটটি হবে। তিন থেকে চার বছর বয়সের এই মেয়েটিকে নিয়ে চারটি, আর পাঁচ বছর থেকে নয় বছর বয়সের আর চারটে। বিপিন ভাই বললেন—আমার কাছে চারজন ট্রেনার আছে, একজন ইউরোপীয়ান লেডি ইংরাজী শেখায়। একজন গুজরাটি হিন্দি শেখায়। আর দুজন গুজরাটি মহিলা আছেন, তারা গান ও নাচ শেখায়। হ্যাঁ, আরেকটা কথা ভার্মা সাহেব। আজ যে দশজন ট্রেণ্ড বড় মেয়েদেরকে এখান থেকে নিয়ে গেলেন—তারা

কোথায় গেল? ভার্মা সাহেব বললেন—অত জানবার আগ্রহ কেন? তাদেরকে তাদের গার্ডিয়ানদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তাহারা খুব প্লিজড্। শুনুন বিপিন ভাই—আপনার ওই ট্রেনারদের এই মাস থেকে একশ টাকা করে বাড়িয়ে দিন। আর আপনার মাসোহারাও আমি দুশো টাকা বাড়িয়ে দিলাম। আর এই নতুন মেয়েটির জন্য আপনি মাসে পাঁচশত টাকা করে একস্ট্র্যা পাবেন। এই মেয়েটিকে বাংলা শেখাবার জন্য আরেকজন মহিলা ট্রেনার জোগাড় করুন। এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই। দেখে শুনে বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। আমি এখনই মেয়েটিকে নিয়ে আসছি। মেয়েটির নাম—মিঠুন কাপুর, আর বাবার নাম রজনী কাপুর।

বিপিন ভাই বললেন—একটু ধরুন, নাম লিখে নিচ্ছি। আর বললেন—বাবার নাম যখন রজনী কাপুর—সে তো পাঞ্জাবী। বাংলা শেখাতে বলছেন কেন? ভার্মা সাহেব বললেম—আমার মনে হল বলেই বলেছিলাম, বাংলা শেখাবার কোন স্পেশাল কারণ নেই। এখন আপনার ইচ্ছে। তবে বিপিন ভাই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করে এটা আমি পছন্দ করি না। এই বলে ভার্মা সাহেব টেলিফোনের রিসিভার রেখে দিলেন।

ভার্মা সাহেব টিঙ্কুকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে কোলে করে তার হোটেলের ট্যারেসের কামরা থেকে বেরিয়ে লিফট করে নিচে নেমে গেলেন। তার নিজস্ব দুটো গাড়ি। একটা তার ড্রাইভার চালায়, আরেকটা তিনি নিজেই ড্রাইভ করেন। যখন কোন স্পেশাল কাজে যান তখন তিনি নিজেই চালান। ভার্মা সাহেব এটা পছন্দ করেন না যে তার গোপন কাজ, তার পার্সন্যাল কাজ কেউ দেখে বা কেউ সাক্ষী থাকে। তাই ভার্মা সাহেব তার পার্সন্যাল গাড়ির দরজা চাবি দিয়ে খুলে স্টিয়ারিং-এ বসলেন। টিঙ্কুকে তার কোলে মাথা রেখে শুইয়ে দিলেন।

ভার্মা সাহেব তার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সেই সুন্দর সমুদ্রের

উপরের ফ্লোটিং রাস্তা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়লেন। তখন নিঝুম রাত। রাস্তায় জনমানব শূন্য খুব কম গাড়িই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। এই ৮০ কি.মি. স্পীডে গাড়ি চালিয়ে বম্বের উপকণ্ঠে এক বাড়ির সামনে গাড়ি থালালেন। এই বাড়ির ধারে কাছে কোন লোকালয় নেই এবং আলোও নেই। আগের থেকেই বিপিন ভাই তার দারোয়ানকে সাবধান করে বলে রেখেছিলেন যে ভার্মা সাহেব আসছেন। তার গাড়ির আলো দেখলেই যেন গেট খুলে দেয়। হর্ন বাজবার আগেই দারোয়ান এলার্ট হয়ে গেটে বসে বসেছিল। ভার্মা সাহেবের গাড়ির হেডলাইট দূর থেকে গেটে পড়তেই দারোয়ান লোহার বড় গেট খুলে দিল আর ভার্মা সাহেব স্পীডে তার গাড়ি কমপাউণ্ডের ভিতরে একেবারে বিপিন ভাইয়ের কটেজের দরজার সামেনই এসে দাঁড়াল। বিপিন ভাই দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভার্মা সাহেব তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে টিঙ্কুকে কোলে নিয়ে বিপিন ভাইয়ের কটেজের বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন। টিঙ্কু তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছিল।

বিপিন ভাই তার স্ত্রী মানে ভার্মা সাহেব যাকে ভাবিজী বলে ডাকেন, তাকে ডেকে বললেন, দেখে যাও সুষমা—এই রকম একটি ফুটফুটে মেয়েকে এত রাতে এই মেয়েটির স্টেপ মাদার রাস্তায় বের করে দিয়েছে। সুষমা দেবীও ওই ঘরের কাছেই ছিলেন, বিপিন ভাই ডাকতেই ওইখানে চলে এলেন আর বিপিনভাই বলতে লাগলেন এই মেয়েটির বাবা রজনী কাপুর মেয়েটিকে লালন পালন ও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য ভার্মা সাহেবের কাছে রেখে গিয়েছেন। মানবতার জন্য ভার্মা সাহেব ওই রজনী কাপুরকে না বলতে পারেন নি। আমাকে কিছুক্ষণ আগে ভার্মা সাহেব টেলিফোনে সব বলেছেন। আমি তোমাকে বলিনি এইজন্য যে তুমি আর কোন মেয়েকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে আর মানুষ করবে না বলে বলেছিলে। এখন এই অবস্থায় ভেবে দেখ আমরা কি এই মেয়েটিকে

এখানে রেখে মানুষ করতে অস্বীকার করতে পারি? মেয়েটির মুখখানা চেয়ে দেখ—কী সুন্দর, কী পবিত্র, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ভার্মা সাহেব বললেন—ঠিক বলেছেন বিপিন ভাই। আমি এই মেয়েটিকে প্রথম দেখেই কিছুক্ষণ এই মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম আর ভাবছিলাম এর স্টেপ মাদার কি প্রকৃতির?

সুষমা দেবী বললেন—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন এই মেয়েকে আমি ভালভাবে মানুষ করব। আজ থেকে আমি, এই মেয়েটির দিদাজী আর আপনার বিপিন ভাই দাদাজী হল। এই মেয়েটির কি যেন নাম? বিপিন ভাই বলল এর নাম মিঠুন কাপুর। সুষমা দেবী বললেন—এর নামের কাপুর আমি বাদ দিয়ে দিলাম। এর শুধু নাম থাকবে মিঠুন। উচ্চ শিক্ষা, গান, নাচ সব খুব ভালভাবে শেখাব। বড় হলে ওর বাবা অথবা স্টেপ মাদার নিতে আসলে কখনই দেব না।

ভার্মা সাহেব বললেন—ভাবিজী, আমি তো আপনার অন্তঃকরণ জানি। আপনি তো নিঃস্বার্থভাবে কত মেয়েকে মানুষ করলেন। সেই সব মেয়েরা এখন কতভালভাবে আছে। এই সব বলে ভার্মা সাহেব পকেট থেকে এক বাণ্ডেল নোট এই হাজার পাঁচেক হবে বিপিন ভাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন—এই মিঠুনের সাজপোষাক, খাওয়া-দাওয়া, কোন কিছুর যেন অভাব না হয়। টাকার দরকার হলেই জানাবেন। আমি সব সময়ই টাকা জুগিয়ে যাবো। এই বলে ভার্মা সাহেব তার গাড়িতে গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। ভার্মা সাহেব গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বিপিন ভাইয়ের কটেজের গেট থেকে বেরিয়ে গেলেন। দারোয়ান গেট খুলে দাড়িয়েছিল।

ভার্মা সাহেব মেয়েটিকে বিপিন ভাই ও ভাবীর হাতে দিয়ে এসে মনে একটু আনন্দ উপভোগ করছিলেন। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ভাবছিলেন এই বিপিন ভাই ও ভাবী তো তারই তৈরী করা

মানুষ এই বাড়িতো সেই তৈরী করে এদেরকে এখানে রেখেছে। তবে এ তো তারই স্বার্থের জন্য। বিপিন ভাইয়ের একটি মাত্র ছেলে ছিল বেশ বড়ই হয়েছিল কিন্তু একরাত্রে একটা অজানা গাড়ির ধাক্কায় নকড ডাউন ডেড এই কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে উঠল। আবার ভাবল ছেলেটির বয়স বিশ বছর হয়েছিল। আজ বেঁচে থাকলে বিপিন ভাই আমাকে তোয়াক্কা করত না। আমার কনট্রোল থেকে বেরিয়ে যেত। কিন্তু আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। বিপিন ভাইয়ের একমাত্র সহায় সম্বল চলে গেল, আর একেবারে আমার হাতের মুঠোয় চলে আসল। এখন তবুও চিন্তা করে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে। এর আগে পুত্রশোকে কোন কিছু চিন্তা করবারই শক্তি ছিল না। যা বলতাম তাই করত এখনও করে। কিন্তু এখন একটু বিবেক হয়েছে দেখছি। তবে মেয়েদেরকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করে পুত্রশোক প্রায় ভুলে গিয়েছে। টাকা পয়সা যথেষ্ট পাচ্ছে। কাজেই নিজেদের দুঃখশোক সব ভুলে গিয়েছে। আজ এই দশটি মেয়ে এখান থেকে নিয়ে যাওয়াতে সন্দেহ জেগেছে। কোথায় নিয়ে গেলাম—কী করলাম। আরে আমি কী গোপনে কিছু করছি বা মেয়েদের অমতে কিছু করবো ? এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ভার্মা সাহেব তার হোটেলে এসে পৌছে গেল। লিফট করে ট্যারেসে উঠে গিয়ে একেবারে এক নজরে শো দেখলেন। দেখলেন শো ঠিক মতই চলছে—নাচ. গান, খুব ভালই হচ্ছে আর অ্যারেবিয়্যানরা মদিরা পান করে একেবারে প্রায় বুজড্। তখন প্রায় রাত তিনটে হবে।

ভার্মা সাহেব ট্যারেসে তার কামরায় গিয়ে মিসেস হেনাকে ডাকলেন। একটু পরেই হেনা তার কামরায় আসলেন। আজ ভার্মা সাহেব মিসেস হেনাকে একটু ভাল করে দেখে বললেন—আজ তোমাকে খুব প্রেটি এবং স্মার্ট দেখাচ্ছে। তুমি আজকের ট্যারেসের শো খুব ভালভাবে অর্গানাইজ করেছো। তোমার প্ল্যানে,

মেয়েদের ড্রেস খুবই অ্যাট্র্যাক্টিভ হয়েছে। আর পাইপ দিয়ে মেয়েদের হাতের ছোঁয়া মদিরা পান করে সব বুজড হয়ে গিয়েছে। তোমাকে আজ অনেক ইয়াং দেখাচ্ছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে নট মোর দ্যান থার্টি ফাইভ।

এই সব ভাল ভাল কথা মিসেস হেনা কোন দিনই ভার্মা সাহের মুখ থেকে শোনেনি। এর আগে যখনই ডেকেছে তখনই ক্রুটি বিচ্যুতির জন্য কথা শুনেছে। তাই মিসেস হেনা একেবারে হেসে ফেলে ভাবল কী ব্যাপার? আজ ভার্মা সাহেবের এত ভাল মুড কেন?

ভার্মা সাহেব মিসেস হেনার হাসি দেখে বললেন—থ্যাঙ্কস্ হেনা। থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর লাভলি লাফ। এই বলে ড্রয়ার থেকে পাঁচ শত টাকার নোটের একটা বাণ্ডেল মিসেস হেনাকে দিয়ে বললেন—এখন রাত তিনটে বেজে গিয়েছে তুমি মাইকে অ্যানাউনস্ কর—এখন আমাদের শেষ আইটেম হবে বিউটি প্যারেড। এতক্ষণ যে সব সুন্দরীরা স্টেজে নেচেছে, গান গেয়েছে, মদিরার ড্রাম ছুঁয়ে আপনাদের সাথে লুকোচুরি খেলেছে সব এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর ও আরও সব নম্বর লাগিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়াবে। ভার্মা সাহেবের নির্দেশমত মিসেস হেনা আরও বলল—আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্রে যা গোপন নির্দেশ আছে—যা আপনাদের প্রাণে চায় সেই মত লিখে স্টেজের দক্ষিণ দিকে সীল বাক্স আছে। বাক্সে ফেলবার যায়গা রয়েছে তাতে আপনাদের বক্তব্য লিখে রেখে যাবেন। আর দশ মিনিটের মধ্যে সুন্দরীরা আপনাদের সামনে আসবে। স্টেজে বেশ জোরে আলো জ্বলে উঠল, ভার্মা সাহেব স্টেজের নিচে যেখানে অ্যারোবিয়্যানরা বসেছিল। প্রথম কয়েক লাইনে বেশীর ভাগ ধনী অ্যারোবিয়্যান বসেছিল তাদের কাছে গিয়ে ভার্মা সাহেব করমর্দন করে বললেন। কাল আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, এই বলে তিনি তার কামরায় চলে গেলেন।

একটু পরেই সব মেয়েরা মডার্ন ভারতীয় পোষাকে সজ্জিতা হয়ে স্টেজে লাইন করে দাঁড়াল। সবার বুকে নম্বর লাগান। নম্বর দেখে অ্যারেবিয়ানরা ঠিক করে নিতে লাগল—কে কত নম্বরের সুন্দরীকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যাবে। দশ পনের মিনিট পরেই মিসেস হেনার ইসারায় মেয়েরা স্টেজ থেকে চলে এলো। আর অ্যারেবিয়ানরা যার যা বক্তব্য লিখে, সীল বাক্সে ফেলে যার যে রুমে বা অন্য হোটেলে চলে গেলেন।

ওই সব মেয়েদের থাকার জন্য আলাদা আলাদা ঘর অ্যালট করা ছিল। ভার্মা সাহেবের নির্দেশ মত মিসেস হেনা সেই সব কামরায় মেয়েদেরকে নিয়ে গেল, সেই সব কোন রুমই পাশাপাশি ছিল না। কোন কোন রুমগুলি একতলায় আবার কতকগুলি রুম দোতলায় যেন একটি মেয়ে আরেকটি মেয়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারে। মিসেস হেনা সেই মেয়েদেরকে বলল—আমাদের ভার্মা সাহেব খুব ভাললোক। তিনি তোমাদের সাথে দু চার কথা বলবেন। তোমাদেরকে আমি ডেকে নিয়ে যাব। প্রত্যেক মেয়েকে আলাদা আলাদা বলল। এই রাতের মধ্যেই ভার্মা সাহেব তোমাদের সাথে কথা বলা শেষ করতে চান।

এদিকে ট্যারেসে শো শেষ হয়ে গেলে মেয়েদের যার যার নির্দিষ্ট কামরায় পৌঁছে দিয়ে মিসেস হেনা স্টেজের কাছ থেকে সীল বাক্স নিয়ে ভার্মা সাহেবের ঘরে ঢুকল। ভার্মা সাহেব ইসারায়—মিসেস হেনা, বাক্সটা পাশের টেবিলের উপর রাখল। ভার্মা সাহেব মিসেস হেনাকে বললেন এখন যাও একটা একটি করে মেয়েদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। ওদেরকে আনবার সময় আলাদা আলাদা করে বলবে—আমাদের ভার্মা সাহেবের কথা কেউ অমান্য করে না। তিনি সবার ভালোর জন্যই সব সময় কাজ করে যান। কাজেই তিনি যা বলবেন সেই মত কাজ করবে। তাহলেই তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে। যাও মিসেস হেনা সব মেয়েকে বুঝিয়ে এক এক করে নিয়ে এস।

একটু পরেই মিসেস হেনা এক নম্বর মেয়েকে নিয়ে এল। ভার্মা সাহেব মেয়েটিকে বলল—তোমারা নাচ, গান, আদবকায়দা খুব ভাল করে শিখেছ। এতদিন তুমি যেখানে ছিলে সেটা আমারই জায়গা। আমিই টাকা পয়সা খরচ করে তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষিত করেছি। এখন আর ওখানে তোমাদের থাকবার প্রয়োজন নেই। কারণ ওখানে আর তোমাদের কোন কিছু শেখার নেই। তোমাদের যাতে ভবিষ্যতে ভাল হয় তার ব্যবস্থা করেছি। কাল সকাল দশটার সময় তুমি তোমার কামরায় রেডি হয়ে থাকবে সেই সময় মিসেস হেনা, যে তোমাদর দেখাশুনা করেছেন, তিনি তোমাকে নিয়ে এক ধনী লোকের সাথে আলাপ করিয়ে দেবেন। সেই লোকের সাথে রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ হবে। এবং সেই লোকের সাথেই রাত্রের ফ্লাইটে তাদের দেশে চলে যাবে। সেই লোক খুবই ধনী লোক। খুব সুখে শান্তিতে থাকবে। এখন যাও তোমার কামরাতে গিয়ে রেস্ট নাও। মিসেস হেনা ভার্মার কামরায় দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিল। ভার্মা সাহেব ডাকতেই ভিতরে এসে সেই মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল। সেই মেয়েটিকে তার রুমে রেখে, আরেকটি মেয়েকে ভার্মা সাহেবের রুমে নিয়ে এল। তাকেও ভার্মা সাহেব একই কথা বললেন। এক এক করে সব মেয়েকেই একই কথা বললেন। তার মধ্যে একটি মেয়ে বলেছিল কোন লোক ? কোন দেশের লোক ? তাকে জানলাম না—আর তাকে বলতে না দিয়ে ভার্মা সাহেব বললেন—যাতে সারা জীবন ধরে জানতে পার, বুঝতে পার, দেখতে পার, তারই ব্যবস্থা করেছি। আমি খুব টায়ার্ড। আর কিছু বলবে না। যা বলেছি তাই তোমাদের করতে হবে। তোমাদের ভবিষ্যতের ভালোর জন্যেই।

সব মেয়েদেরকে তাদের নির্দিষ্ট কামরায় রেখে এসে মিসেস্ হেনা আবার ভার্মা সাহেবের কামরায় এল। ভার্মা সাহেব তাকে বললেন—কাল ঠিক সাড়ে নয়টার সময় আমার এই কামরায় আসবে। আমি দশজন অ্যারেবিয়ানকে বসিয়ে রাখব। তারা এই

সব মেয়েদেরকে পছন্দ করেছে এবং বিয়ে করে ওদের দেশে নিয়ে যাবে। আমি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ঠিক করে রেখেছি। এদের দুজন করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রির বন্দোবস্ত করবে। রেজেস্ট্রি হয়ে গেলে এক একটি মেয়েকে ওদের হাতে তুলে দেবে। পাসপোর্ট এয়ার টিকিট সব রেডি করা আছে। রেজেস্ট্রি হয়ে গেলে কে কোন ফ্লাইটে যাবে বলে দেবে এবং এয়ার টিকিট, পাসপোর্ট ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সারটিফিকেট সব দিয়ে দেবে। এয়ারপোর্টে আমার লোক থাকবে এবং দেখবে সব ঠিক মত চলে যাচ্ছে না গোলমাল করছে। মেয়েদেরকে সাবধান করে দিও যাতে তারা সব ভালভাবে মেনে নেয় কোন ঝামেলা না করে। যাও, মিসেস হেনা। আজ তুমি অনেক কাজ করেছ। কাল সবকাজ ভালভাবে হয়ে গেলে—আই শ্যাল গিভ্ ইউ এ হ্যাণ্ডসাম রিউয়ার্ড। তোমার কথা আমার সব সময় মনে থাকবে। গুড বাই বলে মিসেস হেনা তার কামরায় চলে গেল।

পরদিন ঠিক সাড়ে নয়টার সময় মিসেস হেনা ভার্মা সাহেবের কামরাতে এসে দেখল ঠিক দশজন অ্যারাবিয়ান একেবারে ধোপদুরস্ত ওদের দেশের পোষাক পরে ভার্মা সাহেবের সামনে বসে আছেন ভার্মা সাহেব ওদের উপদেশ দিচ্ছেন কী করে আমাদের দেশের এই সব ট্রেণ্ড মেয়েদের সাথে ব্যবহার করে বশে আনতে হয়। ভার্মা সাহেব ওদেরকে বলছিলেন—দেখ তোমাদের দেশের মত আমাদের দেশের মেয়েরা অত স্টাউড্ এবং স্ট্রং নয়, তবে তারা খুব কাম এবং কোয়াইয়েট্। তাদের সাথে সফ্ট ব্যবহার করবে এবং খুব আস্তে আস্তে সইয়ে নেবে। মিসেস্ হেনার দিকে তাকিয়ে ভার্মা সাহেব বললেন—মিসেস হেনা, এইবার তোমার কাজ শুরু কর। এই দশটা প্যাকেট নাও। প্রত্যেক প্যাকেটে এক নম্বর, দু নম্বর করে দশ নম্বর পর্যন্ত লেখা আছে। ম্যারেজ রেজেস্ট্রি হয়ে গেলেই প্রত্যেক নম্বরের কাপল্‌কে সেই নম্বরের প্যাকেট দিবে। তাতে

ওদের সব ডকিউমেণ্ট্ আছে এবং কোন ফ্লাইটে যাবে তার টিকিট আছে, আমি এখন যাচ্ছি। আমার অন্য কাজ আছে। আমার লোক অলক্ষে সব নজর রাখবে যাতে কাজের কেউ কোন অসুবিধা না ঘটায়। অ্যারেবিয়্যানদের ভার্মাসাহেব বললেন—তোমরা, আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিসেস্ হেনা যা বলবে তাই শুনবে আর যা করতে বলবে তাই করবে। আজকেই তোমরা তোমাদের নিউলি ম্যারেড ওয়াইফ নিয়ে তোমাদের দেশে চলে যাবে। আর এদেশে থাকবে না। গুড বাই বলে টাকা ভর্তি এ্যাটাচি কেস নিয়ে ভার্মা সাহেব তার কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার নিজস্ব গাড়িতে স্টিয়ারিংএ বসলেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে তার হোটেলের কমপাউণ্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন। পথে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সাথে দেখা করে তাকে দশহাজার টাকা দিলেন। প্রত্যেক কাপ্‌লদের নাম, বাবার নাম, বয়স সব আগে থাকতেই ভার্মাসাহেব সেই অফিসারকে দিয়ে রেখেছিল। সেই অফিসার লিখে সব কাগজ রেডি করে রেখেছেন। মিসেস্ হেনা এক এক কাপল্ নিয়ে এসেই সই করালেই ম্যারেজ রেজেস্ট্রি কম্প্লিট হয়ে যাবে। সব ডকিউমেণ্ট দেখে ভার্মাসাহেব সেই ম্যারেজ রেরিস্ট্রেশন অফিসারকে বললেন—থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর কুইক এ্যাকসন। ভার্মাসাহেব ওই রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অফিসে বসলেন। কিছু পরেই মিসেস হেনা—এক নম্বর কাপলকে নিয়ে এল।

ম্যারজ রেজিস্ট্রেশন অফিসার সেই এক নম্বর কাপলএর মেয়েকে বলল—গুড, ভেরি গুড, তুমি এখন অ্যাডাণ্ট হয়েছ। তুমি স্বেচ্ছায় এই অ্যারেবিয়্যানকে বিয়ে করছ। নাও সই কর। বলে দুজনকেই সই করালেন। মিসেস হেনা তার ব্যাগ থেকে একনম্বর প্যাকেট সেই অ্যারেবিয়্যানকে দিল। ভার্মাসাহেব সেই অ্যারেবিয়্যানকে বলল—এখনি সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাও। আর এক ঘণ্টা পর তোমার ফ্লাইট। তুমি তোমার দেশে গিয়ে নিউলি ম্যারেড ওয়াইফ

নিয়ে হানিমূন্ করবে। এদেশে নয়। গো-কুইক্ ওরা একটি ট্যাক্‌সি নিয়ে এয়ার পোর্টের দিকে চলে গেল। ভার্মা সাহেব মিসেস হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—শী ইজ্ লুকিং এ বিট নার্ভাস, তাকে বললেন—মিসেস হেনা, তোমার ভয় পাবার বা নার্ভাস হবার কোন কারণ নেই। আমি এখানে শেষ পর্যন্ত বসে থাকব। তুমি যাও তাড়াতাড়ি আরেকটা কাপ্‌ল নিয়ে এস। এক ঘণ্টার মধ্যে সব কাজ সমাধা হল। প্রত্যেক কাপ্‌লকে ডকিউমেণ্ট দিয়ে মিসেস হেনা ও মিস্টার ভার্মা বিদায় নিলেন। তারা সবাই এয়ার পোর্টের দিকে চলে গেল।

ভার্মা সাহেব রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সাথে করমর্দন করলেন। রেজিস্টেশন অফিসার বললেন—আপনার কোন রিস্ক নেই। সব মেয়েরাই অ্যাডাল্ট এবং স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে বলে সই করেছে। ডুপ্লিকেট কপি আমার অফিসে রেকর্ড হয়ে থাকবে। কোন সময় দরকার হলে, তখন এই সব ডকিউমেণ্ট দেখান যাবে।

থ্যাঙ্কস্। সব ভাল ভাবে হয়ে গেল—এই বলে মিস্টার ভার্মা তার টাকা ভর্ত্তি এ্যাটাচি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মিসেস হেনা বাইরে দাড়িয়েছিল। তাকে দেখে মিস্টার ভার্মা বললেন—মিসেস হেনা সারাদিন তোমার ছুটি। তুমি তোমার কামরায় গিয়ে যা যা খুসি খেয়ে, রেস্ট নাও। রাত নটায় আমার সাথে আমার ট্যারেসের কামরায় দেখা করবে। আজ কোন রকম ট্যারেসে শো হবে না। আজ রাতে তোমার সাথে আমি ডিনার খাব। বাই বলে রাতে মিস্টার ভার্মা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিসেস হেনা একটু কী ভেবে সেও তার হোটেলের গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরে এল। মিসেস হেনা হোটেলে পৌঁছে তার কামরায় চলে গেল। তার বাথটাব নেই। খালি বোর্ডারদের কামরায় ভাল বাথটাব আছে। আর আছে ভার্মা সাহেবের লাকসারি কামরায়। মিসেস হেনা বাথরুমে ঢুকে তার শরীরের বসন এক্ এক্ করে খুলে

ফেলে শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল আর তন্ময় হয়ে ভাবল কী কুক্ষণে এই বছর পাঁচেক আগে এই হোটেলে রিসেপ্‌শনিস্টের চাকরী পেয়ে আসলাম। কিছুদিনের মধ্যে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল আর ফিরল না। ভার্মা সাহেবকে প্রথমে কিছুই বলিনি ভেবেছি হয়ত কোথায় গিয়েছে, আবার ফিরে আসবে। আমি গোয়ানিস্ আমার স্বামী মহারাষ্ট্রিয়ান। পনের দিন আমার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করলাম কিন্তু আর ফিরল না। তখন আমি ভার্মা সাহেবকে সব খুলে বললাম। ভার্মা সাহেব সব শুনে বললেন ভেরি স্যাড্, তুমি যখন আমার কাছে আছ তখন তো তোমার ভালমন্দ আমার দেখতেই হবে। তুমি তোমার স্বামীর জন্য কোন চিন্তা করো না। ও বদ লোক ছিল। চলে গিয়েছে ভালই হয়েছে। তুমি আমার কাছে থাক। নিশ্চিন্ত মনে থাক তোমাকে থাকবার জন্য আমার এই হোটেলে একটা রুম অ্যাট্যাচট্ বাথরুম দেব, সেই রুমেই থাকবে এবং হোটেলে ফ্রি খাবে। থাকা খাওয়ার কোন টাকাপয়সা লাগবে না। তবে আমার খুব বিশ্বস্ত হয়ে থাকতে হবে। আমি যা বলব শুনতে হবে। সেই থেকে আমি ভার্মা সাহেবের হাতের মুঠোর মধ্যে আছি। প্রথম প্রথম আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করত তার লাক্‌সারি কামরায় নিয়ে অনেকদিন তার সাথে ডিনার খেয়েছি, ড্রিঙ্ক্‌স্ করেছি মাঝখানে দেখতাম সব সময়ই আমার সাথে মুখ করে কথা বলতেন। একসাথে ডিনার করা তো ভুলেই গিয়েছি। আমার হঠাৎ গতকাল এবং আজ আমার সাথে সেই আগের মত ভাল ব্যবহার করেছেন। আজ রাতে নটার সময় ওর লাকসারি কামরায় যাব, আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছেন।

এদিকে ভার্মা সাহেব টাকা ভর্তি এ্যাটাচি নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন এত টাকা? সব শুদ্ধ এই আশী লক্ষের মতন। এক কোটি টাকার কাছে। এত টাকা তো জীবনে

দেখিনি—এক সাথে আয় করার কথা ভাবতেও পারিনি। ভাগ্যে পেয়ে গেলাম। এই মেয়েগুলোকে ভালভাবে মানুষ করেছি বলেই। অ্যারেবিয়ানরা এত টাকা দিয়ে মেয়েগুলোকে বিয়ে করে নিয়ে গেল। তারপর ভাবতে লাগল এতগুলো টাকা কোথায় রাখবো? ভার্মা সাহেব ভেবে ভেবে ঠিক করলেন তার তো তিনটে ব্যাঙ্কেই লকার আছে। আপাততঃ সেই তিনটে ব্যাঙ্কের লকারেই টাকাগুলো রেখে দেই। এই ঠিক করে মিস্টার ভার্মা টাকাগুলো ভাগ করে তিনটে ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিয়ে মনের আনন্দে সারা শহরে ঘুরলেন, ম্যাটিনি সিনেমা দেখলেন—বিকালে গাড়ি রেখে গেট অব ইণ্ডিয়ার সমুদ্রের কাছে ঘুরলেন—একা একা পায়চারি করতে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ অনুভব করলেন। তখন তার মনে হল রাত নটায় তো সে মিসেস্ হেনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন? এই কথা মনে হওয়াতে মিস্টার ভার্মা সন্ধ্যার পর তার হোটেলে ফিরে এলেন এবং নিজের লাকসারি কামরায় ঢুকলেন। তিনি একটু টায়ার্ড ফিল্ করছিলেন। শরীর একটু বিশ্রাম চাইছিল। তাই কোট, টাই, বুট খুলে তার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে তার অতীতের কার্য্যকলাপ তার চোখের উপর ভেসে উঠল আর মনে মনে বলল—আমার কী লাভ্লি এবং বিদুষী ওয়াইফ ছিল। তার মন ফুলের মত নির্মল ছিল আর আমার মন ছিল হিংস্র। আমার কাজ তার মোটেই পছন্দ হত না। তাই, অকালে তার দুটি শিশু পুত্র রেখে একেবারে চলে যেতে হয়েছিল। এখন আমার এই প্রৌঢ় বয়সে, তার কথা, তার অভাব অনুভব করছি। সুপরামর্শ দেবার আমার তো ধারে কাছে কোন লোক নেই। শিশুপুত্র দুটিকে তাদের মাতৃবিয়োগের পরই লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানেই তারা ওই দেশীয় প্রথায় মানুষ হচ্ছে। লণ্ডন ব্যাঙ্কে যেখানে আমার এ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে নির্দেশ দেওয়া আছে ওরা মাসে কত টাকা পর্য্যন্ত ওই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে পারবে। ওরা টাকা পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওরা

কোনদিনই বাবা, মার স্নেহ ভালবাসা পায়নি। ওদের বাবার উপরও কোন পিতৃভক্তি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকবে এটা আমি মোটেই আশা করতে পারি না। ওরা চিঠিপত্র তো মোটেই লেখে না আমিও লিখি না। আমি তো সত্যি একা. একা, একা। আমার আপনার বলতে কেউ নেই। এই সব কথা ভেবে তার মিসেস্ হেনার কথা মনে হল মনে হল সেও তো একা—তারও তো আপনার কেউ নেই। আজ রাতেই তার সাথে কথা হবে—এই নিঃসঙ্গ জীবন এত কাজ আর ভাল লাগছে না। মিস্টার ভার্মা ভাল করে স্নান করে, ওয়েল ড্রেস্‌ড্ হয়ে মিসেস হেনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর বারে বারে ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

ঠিক রাত নটার সময় মিসেস হেনা এসে মিস্টার ভার্মা সাহেবের কামরায় টোকা দিয়ে বলল—আমি মিসেস হেনা—ভিতরে আসতে পারি? এই কথা শুনে মিস্টার ভার্মা উঠে দরজা খুলে—মিসেস হেনাকে বললেন—ইউ আর ওয়েলকাম ডার্লিং এই বলে হাত ধরে মিসেস হেনাকে ভিতরে নিয়ে এসে সোফায় বসালেন।

মিস্টার ভার্মা বললেন—দেখ, আজ থেকে, এখন থেকে তোমাকে আর মিসেস হেনা বলব না। তোমাকে ডার্লিং বলে ডাকব। তোমাকে সবাই মিসেস ভার্মা বলে চিনবে জানবে। তোমারও এই পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। আমারও কেউ নেই—আপনার জন বলতে যাকে নিজের বলে বিশ্বাস করতে পারি। যাকে অকপটে সব কিছু বলতে পারি। আমার আজ মনে হচ্ছে—তুমি আমার আপনার হবে। তোমাকে আমি সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করব। আমারও বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে আর তোমারও বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। আমাদের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই। এখন আমার ইচ্ছে আমাদের এই শেষ জীবন শান্তিতে কাটিয়ে দিতে চাই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে কালই আমরা সকালে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি করব।

তুমি এটা ভেব না যে তোমার স্বামী ফিরে এসে তোমাকে আবার ক্লেম করবে। তুমিও উয়িডো আর আমিও উয়িডোয়ার কাজেই আমাদের বিবাহে কোন বাধা নেই।

মিসেস হেনা বলল—দেখুন ভার্মা সাহেব, আপনার সাথে আমার বিবাহ—এটা আমার বিশেষ সৌভাগ্য মনে করব। এটাই আমার প্রথম থেকেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

মিস্টার ভার্মা বললেন—এখন থেকে তুমি আর আমাকে ভার্মা সাহেব বলে ডাকবে না। তুমিও আমাকে ডার্লিং বলে ডাকবে আর আমিও তোমাকে ডার্লিং বলে ডাকব। এই বলে মিস্টার ভার্মা হেনাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন।

সেই রাতে ডিনারে ওরা ওদের অনেক প্রাণের সুখ দুঃখের কথা সেরে যে যার কামরাতে সেই রাত কাটাল। ঠিক হল সকাল দশটার সময় ওরা একসাথে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে ওদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রি করবে।

পরের দিন ঠিক সকাল সাড়ে নটায় মিসেস হেনা, মিস্টার ভার্মার কামরায় এসে দেখল মিস্টার ভার্মা স্যুট পরে রেডি হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। মিসেস হেনা এলেই মিস্টার ভার্মা বললেন—তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি—ডার্লিং। চল আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাই। এই বলে দুজনে হাত ধরাধরি করে হোটেল থেকে বেরিয়ে মিস্টার ভার্মার নিজস্ব গাড়িতে গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসলেন আর মিসেস হেনাকে বললেন—ডার্লিং আমার পাশে বস। এখন থেকে তুমি আমার পাশে সব সময়েই থাকবে। মিসেস হেনা মিস্টার ভার্মার পাশে জড়সড় হয়ে বসল। তাই দেখে মিস্টার ভার্মা বললেন—ডার্লিং এখন আর আমি তোমার ভার্মা সাহেব নই। এখন আমি তোমার স্বামী। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। কাজেই ওই রকম জড়সড় হয়ে বসবার কোন কারণ নেই। বি হ্যাপি, স্ত্রীর মত স্বামীর

পাশে বস। এই কথা শুনে মিসেস হেনা মিস্টার ভার্মার পাশে, তার গা ঘেসে বসল।

মিস্টার ভার্মা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ওর হোটেলের এরিয়া ছেড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। মিস্টার ভার্মা সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে গাড়ি থামালেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসার তখনি অফিসে এসেছেন। মিস্টার ভার্মা ও মিসেস হেনাকে এক সাথে আসতে দেখে বললেন—কী ব্যাপার? এত সকালে একেবারে ছুজনেই হাজির! গতকালের ব্যাপারে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?

মিস্টার ভার্মা বললেন—নো, থ্যাঙ্কস কিছুই গোলমাল হয়নি। সব অ্যারোবিয়্যানরা খুব পিসফুলি ওদের নিউলি ম্যারেড ওয়াইফদেরকে নিয়ে ওদের দেশে চলে গেছেন। ওদের বিয়ে দেখে আমাদের তুজনেরও বিয়ে করতে ইচ্ছে হল। তাই আপনার অফিসে এসেছি আমাদের ম্যারেজ রেজেস্ট্রি করতে। মিসেস হেনা উয়িডো এবং আমি উইডোয়ার। কাজেই আমাদের বিবাহে কোন বাধা নেই।

ম্যারেজ অফিসার বললেন—ঠিক আছে মিস্টার ভার্মা। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে একখানা ফরম বের করে সব লিখে নিলেন। তারপর মিস্টার ভার্মা ও মিসেস হেনা সই করলেন। মিসেস হেনা আরও লিখল—আমি এখানে ঘোষণা করছি যে আমার স্বামী মৃত এবং আমি স্বেচ্ছায় মিস্টার ভার্মার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। আমরা তুজনেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা কেউ কারোর প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করিব না। এই কথা লিখে আবার সই করল।

মিস্টার ভার্মাও লিখলেন—আমার স্ত্রী জীবিত নেই। তাই জীবিত নেই। তাই আমিও স্বেচ্ছায় মিসেস হেনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি। আজ থেকেই মিসেস হেনা, মিসেস ভার্মা বলে

পরিচিতা হবেন। আমরা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা কেউ কারোর প্রতি অবিশ্বাসের কাজ কখনই করিব না। এই সব লিখে মিস্টার ভার্মাও তার পুরো নাম লিখে সই করলেন।

ম্যারেজ অফিসার বললেন—এই তো আপনাদের বিয়ে হয়ে গেল, মিস্টার ভার্মা ও মিসেস ভার্মা আপনাদের হ্যাপি লাইফ কামনা করি। এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আপনাদের বাকি জীবন সুখ ও শান্তিতে কেটে যায়। মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা ম্যারেজ অফিসারকে নমস্কার বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলেন। মিসেস ভার্মা ও মিস্টার ভার্মার পাশে বসে বললেন—আজ তোমাকে কী সুইট্ দেখাচ্ছে।

মিস্টার ভার্মা বললেন—চল আমরা লণ্ডনে গিয়ে হানিমুন করি এবং দুসপ্তাহ কাটিয়ে আসি। আমাদের লাইফ একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। ডার্লিং তুমি বোধ হয় জান না আমার দুই ছেলে আছে। শিশু অবস্থায়ই ওদের মা চলে গিয়েছে। তারপরই আমি ওদেরকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই থেকেই ওরা লণ্ডনে থাকে। কোনদিন ওরা আসতে চায়নি। এবং আমার এই পরিবেশে ওদেরকে আনি নি। এখন ওরা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। কারোর বয়স একুশ, কারোর বয়স এই তেইশ বছর হবে। আমার ওদেশেও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে। ওরা আমার অ্যাকাণ্ট থেকে ওদের চাহিদা মত টাকা তুলে নিচ্ছে। এবার গিয়ে ওদের সাথে মিট করব। ছেলেরা হয়ত আমাকে দেখে চিনতে পারবে না। তবে নাম শুনে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এবং তোমার সাথেও আলাপ পরিচয় হবে।

মিসেস ভার্মা বললেন—আমি শুনে খুব খুশী হলাম যে তোমার দুইছেলে এই পরিবেশে না থেকে লণ্ডনে মানুষ হচ্ছে। চল সেখানে যাই, এবং ওদের সাথে আলাপ পরিচয় করে আসি।

মিস্টার ভার্মা গাড়ি স্টার্ট করে ব্রিটিশ এয়ার কোম্পানির অফিসে এসে কালকের ফ্লাইটের দুখানি টিকিট কাটলেন। মিস্টার

ভার্মা মিসেস ভার্মাকে নিয়ে হোটেলে চলে এসে দুজনই মিস্টার ভার্মার লাকসারি কামরায় প্রবেশ করলেন। মিস্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে বললেন—চল ডার্লিং আমরা অফিসে গিয়ে আমার সব বিশ্বস্ত লোকজনদের ডেকে আমাদের বিবাহের কথা জানাই এবং আজ রাতেই একটা পার্টি দিই এবং তাতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করি। মিসেস ভার্মা বললেন—খুব ভাল প্রপোজাল, আমি সর্বান্তকরণে অ্যাগ্রী করছি।

মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা ট্যারেসের অফিসে ঘরে গিয়ে বসলেন কলিং বেল টিপতে মিস্টার ভার্মার নিজস্ব বেয়ারা লজপৎ সিং এসে হাজির হয়ে বলল—সাব হামকো বোলায়া ? মিস্টার ভার্মা বললেন হা তুমকো বোলায়া, বহুৎ আচ্ছা খবর হ্যায়। সব কইকো আভি হাম্‌কো সাথ ভেট করনে কো বোল। ম্যাক, জুডা, সোনা, ইয়া উয়েসা সব কইকো বোলা—বহুৎ আচ্ছা খবর হ্যায়—সব কইকো হ্যাম্ শুনায়গা।

বেয়ারা লজপৎ সিং সবাইকে খবর দিতে চলে গেল। মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং তুমি যখন সুইট হও, তোমার থেকে আর কেউ বেশী সুইট হতে জানে না। আবার যখন তুমি ক্রুয়েল হও, তখন তোমার মুখের চেহারা দেখলে সবাই ভয়ে আঁতকিয়ে ওঠে।

মিস্টার ভার্মা বললেন—ডার্লিং তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমার কথার কেউ অবাধ্য হলে আমি ক্রুয়েলের টপে উঠে যেতাম। তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে একটুকুও দ্বিধা করতাম না। যার জন্য কেউই আমার অবাধ্য হতে সাহস করত না। তবে ডার্লিং দেখ—এখন থেকে আমি আর ওই রকম ক্রুয়েল হব না। আমি খালি সব সময় সুইট থাকতে চেষ্টা করব।

এর মধ্যে ভার্মা সাহেবের ডাকে ওই হোটেলের সব লোকজন ভার্মা সাহেবের অফিস ঘরে এসে গেল। সবাইকে ভার্মা সাহেব বললেন—দেখ, তোমরা সব আমার আপনার লোক। তোমরা

আমার সাথে সবাই খুব বিশ্বস্ত সহকারে কাজ করে আসছ। আমি তোমাদের কাজে খুবই খুশী যার জন্য আমি আমার অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে বলে দিয়েছি যে এই হোটেলের সব কর্মচারি এক মাসের বেতন এক্সট্র্যা পুরস্কার হিসাবে পাবে। এই একটা তোমাদের সুখবর। আর একটা সুখবর আজ আমি মিসেস হেনাকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছি। আশা করি এই খবর শুনে তোমরা সবাই খুশি হয়েছে। আজ থেকে মিসেস হেনা মিসেস ভার্মা বলে পরিচিত এই কথা শুনে সবাই করতালি দিয়ে মিস্টার এবং মিসেস ভার্মাকে কন্‌গ্র্যাচুলেশন করল।

মিস্টার ভার্মা বললেন—দেখ, আরেকটা সুখবর আছে। আমি মিসেসস ভার্মাকে নিয়ে কালই লণ্ডনে যাচ্ছি। সেখানে দুসপ্তাহ থাকব। আমাদের হানিমূনও হবে আর আমার দুছেলে তাদের শিশু বয়স থেকে ওদেশে মানুষ হচ্ছে তাদের সাথেও দেখা করে আসব। আর আমাদের বিবাহ উপলক্ষে আজ রাত আটটায় এই ট্যারেসে পার্টি হবে। সেই পার্টিতে তোমরা সবাই আমার নিমন্ত্রিত গেষ্ট। প্রাণে যা চাইবে যত চাইবে তাই খাবে। ড্রিঙ্ক করবে। আর মিসেস ভার্মার দিকে তাকিয়ে বললেন—ডার্লিং তুমি ভাল ক্যাবারে ডানসার দিয়ে শো পরিচালনা করবে। খাবার এবং ড্রিঙ্ক পরিবেশনার ইনচার্জ সোমাকে মিস্টার ভার্মা বললেন—সবাই যাতে সুখাদ্য এবং ভাল পানীয় ইচ্ছামত পায় সে দিকে তুমি নজর রাখবে। আর নিজেই খেয়ে বুজড্ হয়ে থাকলে চলবে না। আর ম্যাকের দিকে তাকিয়ে বললেন—ম্যাক তোমাকে আমি এই হোটেলের সব ভার দিয়ে যাচ্ছি, যতদিন আমি কলকাতার বাইরে থাকব। ততদিন তুমি আমার হোটেলের সব কাজ পরিচালনা করবে। তোমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে এবং তুমি সকলেরই প্রিয়ভাজন এবং নির্ভরশীল। আমরা কালই ব্রিটিশ এয়ার কোম্পানির ফ্লাইটে লণ্ডন রওনা হয়ে যাব। কালকের থেকেই তোমার

পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা এখন তোমরা যাও। আমার আরও দুচারটে কাজ বাকি আছে সেগুলো যাবার আগে সারতে হবে।

এদিকে সকালে ঘুম থেকে উঠে, টিঙ্কু সব অচেনা লোক দেখে কাঁদতে লাগল—এই বলে মামিজীকা পাস যায়গা—পাপাজী হামকে লে যাও।

ম্যাকের কাছ থেকে মিস্টার ভার্মা টিঙ্কুর নেচার সম্বন্ধে সব শুনেছিলেন—যেমন টিঙ্কু চিকেনের ঠ্যাং খেতে ভালবাসে। ব্রেকফাস্টে পরটা অমলেট দিয়ে খেতে ভালবাসে—চকলেট খেতে ভালবাসে আর আর সকালে এই আটটার সময় বলবে পটি করেগা। আর সবাইকে আংকেল বলা অভ্যাস।

মিস্টার ভার্মা টিঙ্কুর এই সব নেচার বিপিনভাইকে বলে দিয়েছিলেন। এবং আরও বলেছিলেন টিঙ্কুর এই অভ্যাস মত টিঙ্কু যা ভালবাসে সেই মত ব্যবহার করতে এবং মিস্টার ভার্মা বিপিন ভাইকে আরও বলেছিলেন—টিঙ্কুকে যেন একটু আলাদা ভাবে একটু ভালভাবে মানুষ করা হয়। টিঙ্কু খুব বড় ঘরের মেয়ে। সব সময়ের জন্য তার একজন আয়া থাকবে।

পরদিন সকালে উঠে টিঙ্কু যখন কান্না শুরু করল তখন—বিপিন ভাই এসে বলল—মিঠুন (টিঙ্কুর নতুন নাম) হামকো পাস আও।

তুমকো দিদাজীকো পাস লে যায়গা। টিঙ্কু বলে উঠল—হাম দিদাজীকা পাস যায়গা। দিদাজী টিঙ্কুর কাছে এসে একটা চকলেট দিল। দিদাজীর কাছ থেকে চকলেট নিয়ে টিঙ্কু দিদাজীর কোলে চেপে বসল। দিদাজী বাথরুমে নিয়ে গিয়ে টিঙ্কুর হাত মুখ ধুয়ে যেই দেখল আটটা বাজে বাজে। তখন দিদাজী টিঙ্কুকে বলল—আভি পাটি করে গা? টিঙ্কু অমনি মাথা নাড়ল। দিদাজী অমনি

বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পটি করিয়ে ভাল করে ধুয়ে পুছে খাবার ঘরে নিয়ে এসে ব্রেকফাসটের টেবিলে বসলেন।

সুষমা দেবী বিপিন ভাইকে বললেন—তুমি টিঙ্কুকে খাইয়ে দাও। তাহলে তেমোর সাথে টিঙ্কুর ভাব হবে। এই বলে সুষমা দেবী আয়াকে ডেকে বললেন—টিঙ্কুর খাবার নিয়ে এস। অল্প সময়ের মধ্যে আয়া টিঙ্কুর খাবার আলুপরটা ও ডিমের অমলেট নিয়ে এল। বিপিন ভাইকে দেখিয়ে সুষমা দেবী টিঙ্কুকে বললেন—মিঠুন, দাদাজী তোমাকো খানা খিলায়েগা। বিপিনভাই পরটা ছিড়ে অমলেট দিয়ে টিঙ্কুর মুখে দিতে লাগলেন। টিঙ্কুও আনন্দের সাথে খেতে লাগল। তাই দেখে সুষমা দেবী (টিঙ্কুর দাদাজী) সেখান থেকে চলে গেলেন। টিঙ্কু দাদাজীর হাত থেকে পরটা খেল। এক গ্লাস দুধ খেল। তারপর জল খেল। টিঙ্কুর পেট ভরে গেল। টিঙ্কুর এখন অভ্যেস মত পার্কে যাওয়ার নিয়ম। টিঙ্কুর তো এখন বই পড়ার বয়স হয়নি। আর এক বছর পর হবে। টিঙ্কুকে নিয়ে বিপিন ভাই ওদের বাড়ির কম্পাউণ্ডের ভিতর একটা চিলড্রেন পার্ক আছে সেখানে নিয়ে গেলেন। ওর বয়স থেকে একটু বড় এই চার পাঁচটি মেয়ে তখন সেই পার্কে খেলা করছিল। বিপিনভাই টিঙ্কুকে ওদের সাথে খেলা করার জন্য ছেড়ে দিলেন। টিঙ্কুও দদাজী (বিপিন ভাইর) কোল থেকে নেমে ওই সব ওরই বয়সী (একটু বড়) মেয়েদের সাথে মিশে গিয়ে খেলা করতে লাগল। ওসব বাচ্চা বাচ্চা সব মেয়েরাই বিপিন ভাইকে দাদাজী বলে ডাকে, বিপিন ভাই টিঙ্কুকে নিয়ে ওই মেয়েদের কাছে আসতেই ওই সব মেয়েরা এক-যোগে চেঁচিয়ে বলে উঠল—দাদজী আগিয়া। দাদাজী আ-গিয়া। এবং ওদের নতুন আরেকজন সাথি পেয়ে ওরাও খুব খুশি। বিপিন ভাই ওই সব মেয়েদেরকে বললেন—এই নতুন মেয়েটির নাম মিঠুন। বিপিন ভাই ওদের খেলার জায়গা থেকে একটু দূরে চেয়ারে বসে ওদের দৌড়াদৌড়ি খেলা দেখতে লাগলেন। এই ঘণ্টাখানেক

খেলাধুলা করার পর বিপিন ভাই টিঙ্কুকে কোলে করে বাড়িতে ফিরে এলেন। আর সব মেয়েরাও হৈ হৈ করে বাড়িতে ওদের ঘরে ফিরে এল। যতদিন না টিঙ্কু নরম্যাল হচ্ছে ততদিন টিঙ্কু ওর দাদাজী ও দিদাজীর কাছেই থাকবে এবং টিঙ্কুর পার্সন্যাল আয়াত্ত দেখাশুনা করবে।

এই এগারটার সময় আয়া টিঙ্কুকে স্নান করিয়ে দিল। ভাল জামা পরিয়ে স্নো, পাউডার মাখিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে এসে বসাল। এর মধ্যে অন্য সব মেয়েরাও এসে খাবার টেবিলে বসে পরেছে। বেয়ারা সামনে খাবার প্লেট দিয়ে গেল। আজকের মেনু চিকেনকারি ও রাইস। টিঙ্কুর প্লেটে বেশ বড় একটা চিকেনের ঠ্যাং। ঠ্যাং দেখে টিঙ্কু মহাখুশি এবং জোরে চেঁচিয়ে বলে উঠল হাম চিকেন খায়গা। এর মধ্যে সুষমা দেবী ওদের খাবারের টেবিলে এসে গেলেন। অমনি সব মেয়েরা চেঁচিয়ে বলে উঠল—দিদাজী আ গিয়া, দিদাজী আ গিয়া। টিঙ্কুও ওদের সাথে চেঁচিয়ে বলে উঠল—দিদাজী আ গিয়া। সুষমাদেবী টিঙ্কুর গালে চুমু দিয়ে আদর করলেন। সুষমাদেবী টিঙ্কুকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। টিঙ্কু পেট ভরে মহা আনন্দে চিকেন দিয়ে পেট ভরে খেয়ে দিদাজীর কোলে ঘুরে ঘুরে ঘুমিয়ে পরল। তার পর আয়া টিঙ্কুকে নিয়ে ওর বিছানায় শুইয়ে দিল। বিকেল চারটের সময় টিঙ্কু ঘুম থেকে উঠে দেখল, দাদাজী ওর কাছেই বসে আছেন দাদাজী টিঙ্কুকে কোলে তুলে নিলেন এবং আয়াকে ডেকে বললেন—টিঙ্কুর জন্য দুধ নিয়ে এস। আয়া দুধ নিয়ে এল। আয়া টিঙ্কুর মুখে দুধের গ্রাস ধরল। টিঙ্কু দুধ খেয়ে নিল। আয়াকে বিপিনবাবু বললেন—মিঠুনকে ভাল সাজপোষাক পরিয়ে পার্কে নিয়ে যাও। পার্কের নাম শুনে টিঙ্কুর দাদাজীর কোল থেকে আয়ার কোলে চলে গেল। আয়া টিঙ্কুকে ভাল করে সাজপোষাক পরিয়ে পার্কে নিয়ে গিয়ে আর অন্য সব মেয়েদের কাছে ছেড়ে দিল—ওই সব মেয়েরা মিঠুনকে দেখে বলল—আও মিঠুন

আও। হামলোক খেলে গা। টিঙ্কুও ওদের সাথে মিশে দৌড়া দৌড়া করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিপিন ভাই ও সুষমাদেবী ওই সব মেয়েদের কাছে আসলেন। তাদেরকে দেখতে পেয়েই ওই সব মেয়েরা খুব জোড়ে চেঁচিয়ে বলে ওয়েলকাম করল—দাদাজী আ গিয়া দিদাজী আ গিয়া। টিঙ্কুও ওদের দেখাদেখি চেঁচিয়ে বলে উঠল দাদাজী আ গিয়া, দিদাজী আ গিয়া এই বলে টিঙ্কু দৌড়ে ওর দিদাজীর কাছে চলে এল। দিদাজীও টিংকে কোলে তুলে নিলেন।

এইভাবে আদরে টিঙ্কু ওর দাদাজী, দিদাজী এবং আয়ার কাছে মানুষ হতে লাগল। টিঙ্কু আস্তে আস্তে তার বলা পাপাজি কো পাস যায়গা। মামিজীকো পাছ যায়গা ভুলে যেতে লাগল।

টিঙ্কু যতই বড় হতে লাগল, ততই তার লেখা-পড়ার দিকে বেশ ঝোঁক দেখা যেতে লাগল।

বিপিন ভাই টিঙ্কুকে সব বিষয়ে ইংলিস মিডিয়ামে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দুইজন ইউরোপীয়্যান মহিলাকে রেখেছিলেন টিঙ্কুকে সব বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য।

* * * * *

পরের দিন সকাল সাড়ে দশটায় মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা লণ্ডনে যাবার জন্য সান্তাক্রুজ এয়ার পোর্টে গিয়ে ব্রিটিশ এয়ার কোম্পানির প্লেনে তাদের সংরক্ষিত আসনে গিয়ে বসলেন। গেটে একজন ক্রু প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের প্লেনে ঢুককার এনট্রি কার্ড চেক করলেন, সব প্যাসেঞ্জার উঠে এলে, পাইলট ক্রু এবং এয়ার হোসটেসরাও উঠে এলো। প্লেনের গেট বন্ধ হয়ে গেল।

মিস্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে বললেন ডালিং আমি অনেক বছর পর এই বিদেশে এত বড় প্লেনে করে যাচ্ছি। এটাও একটা আমার বিরাট একস্‌পীরিয়েন্স হবে। মিসেস ভার্মা বললেন—

ডার্লিং আমার এর আগে আর কোথায়ও প্লেনে যাওয়া হয়নি। এটাই আমার প্লেনে যাওয়ার প্রথম একস্‌পীরিয়েন্স। কাজেই এই প্লেনের সব লোক জন, ক্রু, এয়ারহোসটেসের চলাফেরা কাজকর্ম সব খুঁটিয়ে দেখব। মিস্টার ভার্মা বললেন—ডার্লিং তুমি সব দেখ, আমি তো একটু বাদেই ড্রিঙ্কস নিয়ে বসব।

প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে এয়ার হোসটেস ইংরাজীতে ঘোষণা করলেন—শ্রদ্ধেয় প্যাসেঞ্জারগণ আপনাদের সকলকেই আমরা ওয়েলকাম করছি। আমরা এখন ক্যাপটেন ক্রুসের কমাণ্ডে আছি। এখনি আমাদের প্লেন ছাড়বে। কাল সকাল আটটার সময় আমরা লণ্ডন এয়ার পোর্টে গিয়ে পৌছাব। আমাদের লণ্ডনে পৌছতে একুশ ঘণ্টা সময় লাগবে. এখনি প্লেন টেক অফ্‌ করবে। আপনারা আপনাদের কোমরের বেল্ট শক্ত করে বাধুন আর টেক অফ কররার সময় আর নামবার সময় ধুম পান করবেন না। দুর্যোগ আবহাওয়ার জন্য কখনও আমাদের ফোরস ল্যাণ্ডিং করতে হতে পারে। সে রকম সিচিউয়েশন হলে আপনাদেরকে জানানো হবে। থ্যাঙ্কস্‌ বলে এয়ার হোসটেস চুপ করলেন। প্লেন স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা এবং অন্য প্যাসেঞ্জাররাও যে যার কোমরে প্রত্যেক সিটের সাথে বেল্ট থাকে সেই বেল্ট কোমরে এঁটে দিলেন।

মিসেস ভার্মার সিটের পাশেই বেশি বড় না গোলকাচের জানালা সেই কাঁচের জানালা দিয়ে পরিস্কার সব দেখা যায়! সেই জানালা দিয়ে মিসেস ভার্মা দেখতে লাগলেন। প্লেন খানা ঘুরে এসে ছোট রাণওয়ে দিয়ে বড় এবং খুব লম্বা রাণওয়েতে পরল। তারপর ইঞ্জিনের শব্দ একটু বাড়ল এবং প্লেনটা তার রবারের চাকা দিয়ে খুব জোরে দৌড়াতে লাগল। এই রকম মিনিট দুই দৌড়াবার পরে একটু যার্ক দিকে রাণওয়ে ছেড়ে উপরে উঠে পড়ল, ক্রমশঃই উপরের দিকে উঠতে লাগল। তখন সবাই হাফ্‌ছেড়ে কোমরের

বেল্ট খুলে ফেলতে লাগলেন। মিসেস ভার্মা দেখতে লাগলেন প্লেনটা ক্রমশই উপরের দিকে উঠছে। মেঘের অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে। মেঘগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল পেজা তুলো। সমুদ্র, রাস্তা, বাড়ি, ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

এয়ার হোসটেস্‌দের কারোর হাতে ট্রে ভর্তি চকলেট। কারোর হাতে ট্রে ভর্তি বিস্কুট। আর কেউ চা এবং কফির টিপট নিয়ে সব প্যাসেনজারদের কাছে যাচ্ছে যার যেটা খাবার ইচ্ছা তুলে নিচ্ছেন। সামনের চেয়ারের পিছনে পিঠের সাথে টেবিল ফোল্ড করা আছে। টান দিলেই ছোট খাবার টেবিল হয়ে যাবে। আবার ঠেলে দিলেই সামনের চেয়ারের পিঠের সাথে ফোল্ড হয়ে যাবে। মিসেস ভার্মা সবই লক্ষ্য করছিলেন। যে কফি বা চা খাচ্ছেন, তাকেই ওই ফোল্ডিং টেবিল পেতে এয়ার হোসটেসরা চা বা কফি দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার খাওয়া হলেই টেবিল ঠেলে ফোল্ড করে দিচ্ছিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে চা বা কফির কাপ এয়ার হোস্টেসরা নিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার কোন কোন প্যাসেঞ্জার কোলড ড্রিঙ্ক চাওয়ায় কোক্‌ দিয়ে যাচ্ছিল। এইসব খাবারের জন্য কোন একস্ট্রা পয়সা লাগে না তবে আবার কেউ কেউ স্ট্রং ড্রিঙ্ক চাচ্ছিলেন যেমন কোল্ড বিয়ার বা হুইস্‌কি ইত্যাদি। সেই সব পানীয়ও এয়ার হোসটেস্‌রা দিয়ে যাচ্ছিল। তবে সেই সব স্ট্রং ড্রিঙ্কসের জন্য একস্‌ট্রা পয়সা দিতে হয়। মিস্টার ভার্মা তার ও মিসেস ভার্মার জন্য কোল্ড বিয়ার এবং একপ্লেট ফিঙ্গার চিপসের অর্ডার দিলেন। একটু পরেই এয়ার হোসটেস দু বোতল কোল্ড বিয়ার এবং এক প্লেট গরম ফিঙ্গার চিপস্‌ নিয়ে এসে চেয়ারের পিছন থেকে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বিয়ারের বোতল ও গ্লাস দিয়ে গেল। মিসেস ভার্মা বিয়ার পান করছিলেন ও তার পাশের কাঁচের গোল জানালা দিয়ে দেখছিলেন। এক একবার তাদের প্লেন উপরে উঠে যাচ্ছিল আবার অনেক নীচে

নেমে পড়ছিল। এক একবার আবার ডান দিকে বা বাম দিকে কাত হয়েও যাচ্ছিল।

মিসেস ভার্মা মিস্টার ভার্মাকে বললেন—ডার্লিং আমাদের এই বেশী বয়সে বিয়ে হলেও আমরা বিয়ের পর থেকেই আনন্দ উপভোগ করছি। এই যে হঠাৎ লণ্ডনে যাওয়ার একটা প্রেগ্রাম করে ফেললে এবং আমরা এই এত বড় প্লেনে কেমন ভাবে উড়ে যাচ্ছি। এটাও সত্যি খুব আনন্দদায়ক। মিস্টার ভার্মা বললেন—ডার্লিং তুমি ঠিকই বলেছ – এতদিন শুধু কাজ আর কাজ। কোথা দিয়ে যে আমার পঞ্চাশ বছর কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। গতকালই শুধু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে আমার জীবনের সব ভাল সময় কেটে গিয়েছে খালি কাজের মধ্য দিয়ে। রিলাক্স করার জন্য একটুও সময় নষ্ট করিনি। তাই ভাবলাম বাকি জীবনটা এত খেটে কাজ করে টাকা উপায় করে কী হবে। তার থেকে ঠিক করলাম তোমাকে বিয়ে করে বাকি জীবনটা যতটা পারা যায় একটু শান্তিতে কাটিয়ে দেব। তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে দেখছি। তোমার মত সোবার টাইপ মেয়ে আমার সাথে খাপ খাইয়ে মানিয়ে নিতে পারবে। যখন তুমিও আমার সব নেচার জান।

মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং রিয়ালি তোমাকে আমর খুব সুইট লাগছে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে।

তখন এয়ার হোসটেসরা প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নোট করে নিতে লাগল লাঞ্চে কে ভেজ খাবে আর কারা ননভেজ খাবে। সেই মত লাঞ্চে খাবার ওরা পরিবেশন করবে।

মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা ননভেজ খাবার দেওয়ার জন্য বলে দিলেন। মিসেস ভার্মাকে মিস্টার ভার্মা বললে—জান ডার্লিং, এই খাবারের জন্যও কোন একসট্রা চার্জ দিতে হয় না।

এই দেড়টা নাগাদ এয়ার হোসটেসরা সব প্যাসেঞ্জারদেরকে

লাঞ্চের খাবার পরিবেশন করতে লাগল। যারা ভেজ চেয়েছিলেন—তাদেরকে ভেজের প্লেট দিতে লাগল—আর যারা নন্‌ভেজ চেয়েছিলেন তাদেরকে নন্‌ভেজের প্লেট দিতে লাগল। মিসেস ভার্মা তাদের নন্‌ভেজের প্লেট দেখল—তুরকম মিট আছে, পোলাউ আছে আর ছ্যালাড আছে আর ব্রেডও আছে। মিসেস ভার্মা তাদের পাশের প্যাসেঞ্জারদের খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—ভেজের প্লেট দিয়েছে। ভেজের প্লেটে দেখলেন—তিনরকম বেশ সুন্দব করে সাজিয়ে তরকারি দিয়েছে, দৈ আর তুরকম মিষ্টি। তাই দেখে মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং দেখছ ভেজের প্লেটে কতরকম ভাল ভাল খাবার দিয়েছে। রাত্রে আমরা ডিনারে ভেজ খাব।

মিস্টার ভার্মা বললেন—বেশ তো প্রাণে যা চায় তাই খাবে। এই বলে ওরা খাবার খেতে শুরু করলেন। খেতে খেতে মিসেস ভার্মা বললেন—দেখেছ তুরকম মিটই বিফের প্রিপ্যারেশন। ব্রিটিশ এয়ার কোম্পানি তো ? ওরা বেশি বিশি বিফ্‌ই পছন্দ করে এবং খাবারের সময় বিফই পরিবেশন করে। আমরা বিফ খেয়ে অভ্যস্ত কাজেই আমাদের কিছু যায় আসে না। এই বলে ওরা ওদের খাবার খেয়ে নিলেন।

মিসেস ভার্মা দেখলেন—কিছু কম বয়সের প্যাসেঞ্জার এয়ার হোসটেসের কাছ থেকে একরকম মেশিন পাঁচ ডলার দিয়ে ভাড়া করে কানে লাগিয়ে নিল। তাই দেখে মিসেস ভার্মাও একটা মেশিন এয়ারহোসটেসের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে কানে লাগিয়ে নিলেন। খুব সুন্দর সুন্দর গান অমনি শুনতে পেলেন। ইংরেজী গান হচ্ছিল। মিসেস ভার্মা বললেন—তুমি একটু এই মেশিনটা কানে দিয়ে দেখ কত ভাল ভাল গান হচ্ছে এই বলে মিসেস ভার্মা মিস্টার ভার্মার কানে সেই মেশিনটা লাগিয়ে দিলেন। মিস্টার ভার্মা বললেন সত্যি কি অপূর্ব গান হচ্ছে। মিস্টার ভার্মা কয়েকটা গান শুনে

আবার মেশিনটা মিসেস ভার্মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—ডার্লিং আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে তো—এখন এই লাকসারী চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে তুমিও একটু রিল্যাকস কর আমিও একটু রিল্যাক্স্ করি এই বলে মিস্টার ভার্মা একটু পা দিয়ে ঠেলে চেয়ারটা ইজি চেয়ারের মত করে তার শরীরটা এলিয়ে দিলেন। তাই দেখে মিসেস ভার্মা মিস্টার ভার্মার মত চেয়াটা করে তার শরীর এলিয়ে দিলেন। কানে ওই মেশিনটা রেখেই গান শুনতে শুনতে একটু চোখ বুজলেন।

এই আবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এয়ার হোসটেসরা সব প্যাসেঞ্জারদের কাছে এসে যারা চা খাবেন, তাদের চা দিতে লাগল। আবার যারা কফি খাবেন তাদের কফি দিতে লাগল। বিস্কুট, চকলেট, ট্রে ভর্তি করে প্যাসেঞ্জারদের কাছ দিয়ে ঘুরতে লাগল। যার যা ইচ্ছে তুলে নিতে লাগল। যারা কোক চাইল তাদের কোক্ এনে দিতে লাগল।

এই সন্ধ্যে সাতটা হবার সাথে সাথেই মিস্টার ভার্মা ও আরও কয়েকজন প্যাসেঞ্জার এয়ার হোসটেসকে ডেকে হুইসকির অর্ডার দিলেন। একটু সময়ের মধ্যে স্কচ হুইসকি এসে গেল। মিস্টার ভার্মা এবং মিসেস ভার্মা ওই হুইসকি পান করতে লাগলেন। দুজনেই পান করে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, একটু আনন্দের স্বর দুজনের গলা থেকে বের হল। মিসেস ভার্মা তিন পেগ হুইসকি আর মিস্টার ভার্মা চারপেগ হুইসকি পান করলেন। এরপর ডিনারের সময় হয়ে গেল। মিসেস ভার্মা এয়ার হোসটেসকে ডিনারে ভেজ দিতে বললেন—এবার ডিনারে ভেজের প্লেটে রকমারি সুখাদ্য দেখে মিসেস ভার্মা খুব খুশি। ওরা খুব আনন্দের সাথে খেয়ে বলল—ননভেজের থেকে ভেজই খেতে ভাল।

খাওয়া হয়ে গেলে ওরা সেই দুপুরের মত সিটগুলি ইজিচেয়ারের মত করে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কাঁচের জানালা

দিয়ে মিসেস ভার্মা তাকিয়ে দেখতে লাগলেন খালি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, উপরে তাকিয়ে দেখলেন—আকাশে তারাগুলি ঝিকমিক করছে। নিচে মাটি থেকে তারাগুলি যেমন ছোট দেখায় প্লেন এতটা উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারাগুলো সেই রকমই ছোট দেখাচ্ছে। মেশিনে গান শুনতে শুনতে এবং তারা দেখতে দেখতে মিসেস ভার্মা ও ঘুমিয়ে পড়লেন। তার আগে মিসেস ভার্মা দেখলেন মিস্টার ভার্মাও ঘুমিয়ে পড়েছেন—নিশ্চয়ই ওই হুইকির গুণে, এবং মনে মনে ভাবলেন তা না হলে তো এত কম রাতে ওনার ঘুমোবার অভ্যেস নেই।

এই ভোর ছটা বাজতে না বাজতে এয়ার হোসটেসরা সব প্যাসেঞ্জারদের মুখের কাছে চা নিয়ে ঘুরতে লাগল। যারা জেগেছিল তারা ওদের কাছ থেকে চা নিয়ে খেতে লাগলেন। চায়ের ভাল ফ্লেভারের গন্ধে মিস্টার এবং মিসেসেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁরাও ওদের কাছ থেকে চা নিয়ে খেতে লাগলেন। মিস্টার ভার্মার সকালে এককাপ চাতে ঘুমের ঘোর কাটে না। দু কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস। তাই মিস্টার ভার্মা এয়ার হোস্টেসেয় কাছ থেকে আরেক কাপ চা চেয়ে নিলেন। মিসেস ভার্মাকে মিস্টার ভার্মা বললেন—ডার্লিং হ্যাভ ওয়ানকাপ মোর। 'ইউ উইল ফিল বেটার। এই বলে এয়ার হোসটেসকে ডেকে মিসেস ভার্মাকে আরেক কাপ চা দিতে বললেন। মিসেস ভার্মাও আরেক কাপ চা নিয়ে খেতে লাগলেন।

তখন ভোর প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে বাজে। এয়ার হোসটেস তার মাইকে বললেন—শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ আমরা প্রায় লণ্ডন এয়ারপোর্টের কাছে পৌছে গিয়েছি। একটু বাদেই আমরা লণ্ডন এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করব। আপনারা আপনাদের কেমরের বেল্ট বেশ ভাল করে বেঁধে ফেলুন। এখন আর কেউ সিগারেট খাবেন না। আপনারা সবাই তৈরী হয়ে যান। প্লেন

একদম এয়ারপোর্টে না থামলে কেউ সিট থেকে উঠবেন না। আমাদের সাথে আপনারা এতক্ষণ ধরে কষ্ট করে এসেছেন। সেই জন্য আমাদের কমাণ্ডের ক্যাপটেন ক্রুস্ আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তারপর থ্যাঙ্কস্ বলে মাইকের কথা বন্ধ করে দিল।

সব প্যাসেঞ্জার কোমরের বেল্ট বেশ ভাল করে বেধে নিলেন। মিসেস ভার্মা দেখলেন তার পাশের কাঁচের জানালা দিয়ে প্লেন ক্রমশঃ ঘুরে ঘুরে নিচের দিকে নামছে। তারপর লম্বা সোজা রানওয়ে এসে প্লেনের নিচের দিকের তিনটে চাকা বেরিয়ে গেল। তারপর একটা বেশ বড় রকমের ঝাকুনি দিয়ে চাকা তিনটে রাণওয়েতে ঠেকিয়ে দৌড়াতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে স্পীড কমিয়ে এয়ার পোটের বাউণ্ডারিতে এসে প্লেন থামল। এয়ার হোসটেস দুদিকের প্লেনের দরজা খুলে দিল এবং নামার জন্য সিড়ি লেগে গেল। প্লেনের দুই দরজার সামনে হাত জোড় করে দুই এয়ার হোসটেস দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জারদের যারা নেমে যাচ্ছিলেন তাদেরকে থ্যাঙ্কস, বাই বলে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। মিসেস ভার্মা তাই দেখে বললেন—এটাই সব এয়ার কোম্পানির বৈশিষ্ট। এরকম অভ্যর্থনা আর কোথাও দেখা যায় না।

মিস্টার ভার্মা এই লণ্ডনে আসার জন্য এই ফ্লাইটে রওনা হওয়ার আগেই তার দুই ছেলেকে ট্রাঙ্ককলে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি তোমাদের স্টেপমাদারকে নিয়ে আজ সকাল আটটার সময় লণ্ডন এয়ারপোটে পৌছবেন। যদি সম্ভব হয় এবং সময় থাকে তাহলে তারা যেন লণ্ডন এয়ারপোর্টে ওই সময় উপস্থিত থাকে।

মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা প্লেন থেকে নেমে গুডস্ ডেলিভারি কাউণ্টারে চলে গেলেন; তাদের মাল (দুটো স্যুটকেস) নেবার জন্য। তার আগে তাদের হেলথ্ সারটিফিকেট এবং পাসপোর্ট চেকিং হয়ে গেল।

গুডস্ ডেলিভারির জায়গায় গিয়ে মিসেস ভার্মা দেখলেন—একটা রিভলভিং গোলাকার কাউন্টার—খালি ঘুরছে তো ঘুরছে। গুড্স্ ক্যারিং গাড়িতে করে প্যাসেঞ্জারদের সব মাল আনছে আর ওই রিভলভিং কাউন্টারে সাজিয়ে রাখছে। যে যার মাল সেই রিভলরিং কাউন্টারের উপর থেকে তুলে নিচ্ছে। মিসেস ভার্মা দেখলেন ওই সব মালের সাথে একটা বড় কুকুর ও ঘুরছে। সেই কুকুরের যে মালিক এক অ্যামেরিকান প্রৌঢ় মেম সাহেব সেই কুকুরটিকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। মিস্টার ভার্মা ও তার স্যুটকেস দুটি সেই রিভলবিং কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে মিসেস ভার্মাকে নিয়ে কাসটম কাউন্টারে চলে গেলেন। সেখানে তাদের মাল চেক করে মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা কাসটম এনক্লোজার থেকে বাইরে বেড়িয়ে এলেন। মিস্টার ভার্মা মনে মনে জানতেন তার ছেলেরা এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই আসবে। তারাও প্রথম তাদের বাবাকে দেখবে আর মিস্টার ভার্মাও তাদের ছেলেদের প্রথম দেখবেন। এই সব চিন্তা করতে করতে মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা তাদের মাল নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইয়ে এসে দাড়ালেন। তখন মিস্টার ও মিসেস ভার্মা দেখলেন—দুটি হ্যাণ্ডসাম যুবক তাদের দিকে এগিয়ে এসে দুজনেই মিস্টার এবং মিসেস ভার্মার সাথে করমর্দন করে বলল—মাইড্যাড্ মিস্টার ভার্মা, মাইমামি মিসেস ভার্মা। মিস্টার ভার্মা তাদেরকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে বললেন—মাইসন, তোমরা ভাল আছ?

মিসেস ভার্মা দেখলেন—ছেলে দুটির কারোর বয়স কুড়ি বছর কারোর বয়স বাইশ বছর। কী সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা? ছোট থেকে এই লণ্ডনে মানুষ হচ্ছে বলে একেবারে ইউরোপিয়ানদের মতই চেহারা, কথা বলং ঢং চলা ফেরা হয়ে গিয়েছে। ভাল করে মুখের দিকে খুটিয়ে দেখলে—মিস্টার ভার্মারই ছেলে বলে মনে হচ্চে। তবে ওদের গায়ের রং একেবারে ফুটফুটে ফর্সা। ওদের

মায়ের রঙ পেয়েছে। এখানকার আবহাওয়াতে ওদের গায়ের রঙ সাদার সাথে লাল আভা মিশে গিয়েছে।

বড় ছেলে বলল—ড্যাড্, আমার নাম রবার্ট ও আমার ছোট ভাইয়ের নাম ডেভিড্। আমরা ব্রিটিশ সিটিজেন হয়ে গিয়েছি। আমরা দুজনেই মেডিক্যাল কোর্স নিয়ে পড়ছি। আর তিনবছর পর আমরা মেডিক্যাল গ্র্যাজিউয়েট হয়ে যাব। আমরা এখন মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে আছি এবং আমাদের কোর্স শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা ওই হস্টেলেই থাবক। মিস্টার এবং মিসেস ভার্মাকে তাদের বড় ছেলে রবার্ট আরও বলল—ড্যাড্, তোমাদের জন্য একটা ভাল হোটেলে, একটা লাক্সারি ডবলবেডের কামরা রির্জাব করে রেখেছি। চল তোমাদেরকে সেই হোটেলে নিয়ে যাই।

ওরা একটা ক্যাব ভাড়া করে সেই হোটেলে চলে গেল। হোটেলের কামরা দেখে মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা খুবই খুশি হলেন। মিস্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে বললেন—আমাদের সমুন্দর কা সুন্দরী হোটেল থেকে এখানকার ব্যবস্থা খুবই ভাল। বসার ঘরেও একটা ফোন ও টিভি রয়েছে এবং শোবার কামরাতে একটা ফোন টিভি রয়েছে। হিটিং এর ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কিছুরই অভাব নেই। মিস্টার ভার্মা রবার্ট ও ডেভিডকে বললেন —তোমরা এখন তোমাদের হস্টেলে যাও। তোমাদেরকে ফোনে পরে কনটাকট করব। রবার্ট ও ডেভিড—বাই বাই ড্যাড এবং বাই বাই মামি এই বলে চলে গেল।

মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং তোমার হোটেল তো প্রাকটিক্যাল অ্যারেবিয়ানদের জন্য। অ্যারেবিয়ান ছাড়া অন্য প্যাসেঞ্জাররা তোমার ওই হোটেলে থাকবার জন্য রুম চাইলে রিসেপসন থেকে অমনি বলে দেয়—ঘর খালি নেই সব ভর্ত্তি।

মিস্টার ভার্মা বললেন—দেখ মাই ডার্লিং, তুমি আমাকে

অ্যাকিউজ করছ যে অ্যারেবিয়ান ছাড়া অন্য কোন লোককে ঘর চাইলে ঘর দেওয়া হয় না। এটা তোমার ভুল ধারণা। অ্যারেবিয়ান ছাড়া আরও অন্য দেশের ফরেনারস্‌ও আমার হোটেলে থাকে। আমরা আবার যখন বম্বে ফিরে যাব তুমি চেক করে দেখবে যত ভাল ভাল হোটেল কোলাবা এরিয়াতে বা মেরিণ-ড্রইভ এরিয়াতে আছে প্রত্যেক হোটেলে ভর্ত্তি অ্যারেবিয়ান। আমাদের বম্বে শহরে সব থেকে যেটা লাকসারি মার্কেট—মোথা মার্কেট, সেখানে গিয়ে দেখবে অ্যারেবিয়ান কাস্টমারে ভর্ত্তি। তারা অন্য সব কাস্টমার থেকে বেশী দাম দিয়ে সব জিনিস কিনছে। তাই সব দোকানের সেলস্‌ম্যানরা অন্য সব কাস্টমার থেকে অ্যারেবিয়ানদেরকেই বেশি অ্যাটেণ্ড করছে। সব হোটেলে অ্যারেবিয়ানে ভর্ত্তি কেন? এই অ্যারেবিয়ানরা হোটেলের রুমের চার্জ থেকে বেশী চড়া দাম দিয়ে রিজার্ভ করে নিচ্ছে। আর এত অ্যারেবিয়ানরা বম্বে শহরে আসছে কেন?

মিস্টার ভার্মা বলতে লাগলেন—জান, ডার্লিং আরব দেশ একটা মরুভূমির দেশ। বৃষ্টি হয়ই না বলতে গেলে! এখানকার থেকে ওই দেশে জিনিসের দাম অনেক বেশী। এই বম্বে ওরা অনেকে ওদের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে এসে হোটেলের রুম ভাড়া করে মাসের পর মাস থাকে। এই বম্বে শহরে বর্ষাকালে খুবই বর্ষা হয়। এই বর্ষা সীজনটা ওরা খুব এনজয় করে। আর কিছু খুব ধনী অ্যারেবিয়ানরা আসে এনজয় করতে। বম্বে শহরের মত এত ওয়েল বিহেভড্‌ কলগার্ল এত কমদামে এবং আর কোন দেশে পাওয়া, যায় না। অনেক অ্যারেবিয়ান আসে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে আমাদের বম্বের মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিয়ে ওদের দেশে চলে যায় এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করে। তুমিই তো দেখছ আমার হোটেল থেকে আমারই পরিচিতা দশটি মেয়েকে অ্যারেবিয়ানরা বিয়ে করে ওদের দেশে নিয়ে চলে গেল।

অ্যারেবিয়ানরা আমাদের বম্বে শহরকে ভালবেসে ফেলেছে। আরও একটা মজার ব্যাপার অ্যারেবিয়ানরা দেখেছে এবং বুঝেছে ওদের ব্যাপার নিয়ে বম্বে শহরের লোকেরা কোন সময় মাথা ঘামায় না। ওরা বেশ শান্তিতেই এই বম্বে শহরে আছে। আমার হোটেল সমুন্দর কা সুন্দরী হোটেলের ট্যারেসের শো অ্যারেবিয়ানদের খুব প্রিয়। সব হোটেলের আরেবিয়ান বাসিন্দারা রাত বারটার সময আমাদের ক্যাবারে ডানসার জুলার ড্যানস্ দেখতে চলে আসে আর শেষ রাত পর্যন্ত থাকে। কত যে ড্রিঙ্কস্ করে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

মিস্টার ভার্মা বলতে লাগলেন ডার্লিং এই আমাদের হোটেলের ক্যাবারে ডানস তোমারই তো প্ল্যান অনুসারে এবং তোমারই তো সুপারভিসনে হত। এবং ওই ক্যাবারে ডানসের শেষ নাচের দৃশ্যটা এমন অ্যাট্রিকটিভ করে রেখেছিলে যার জন্য ওই শেষ নাচের দৃশ্য না দেখে কেউ যেত না। আমিও কয়েকবার দেখেছি সারাহল অন্ধকার, খালি ফোকাসের আলো নর্ত্তকিদের উণ্মুক্ত শরীরে পড়ছে। সব থেকে শেষে একজন সুপুরুষ যুবক জুলার শরীরের শেষ আভরণ খুলে নিয়ে গেল। আর জুলা, ভয়ে আতঙ্কে আধ মিনিট তার নগ্ন শরীর নিয়ে নেচে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

মিসেস ভার্মা বললেন—জান, ডার্লিং ওই নাচের শেষ দৃশ্যের জন্য জুলাকে প্রত্যেক নাইটে কত দেওয়া হয়? মিস্টার ভার্মা বললেন—জানি ডার্লিং, ওই নাচের জন্য আমাদের যা লাভ হয় তার তুলনায় কিছুই দেওয়া হয় না। তবে হ্যাঁ, হ্যাণ্ড সামটাকাই দেওয়া হয় এবং জুলা তাতে খুশি।

মিস্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে বললেন তুমি কি ভুলে গেলে?—আজ আমাদের বিয়ের পর হানিমুণ নাইট। আমাদের ভাষায় যাকে বলে সোহাগরাত। বয়স হলেই বা কি। এ জিনিসটা তো ভুললে চলবে না। লেট আস এনজয় দিস নাইট টু আওয়ার হার্টস

কনটেন্ট। মিসেস ভার্মা বললেন সে তো হবে রাত্রে এখন থেকেই এত তোরজোর কেন? সবে তো আমরা ব্রেকফাস্ট খেলাম। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমরা রবার্ট ও ডেভিডের হোস্টেলে গিয়ে ওদেরকে সারপ্রাইজ দেব। আমরা হোটেলে ফিরে এসে লাঞ্চ খাব এই বেলা দেড়টা দুটো নাগাদ। মিস্টার ভার্মাও মিসেস ভার্মার কথায় রাজি হয়ে গেলেন এবং বললেন আমি আমার ড্রেস পাল্টিয়ে নেই। তুমিও তোমার ড্রেস পাল্টিয়ে নাও। দুজনেই ওদের রুমের চাবি হোটেলের রিসেপসন অফিসে জামা দিয়ে হোটেল থেকে বেড়িয়ে পরলেন।

রাস্তায় বেড়িয়ে মিস্টার এবং মিসেস দেখলেন—রাস্তায় খুব কম লোকই চলাফেরা করছে। আর প্রাইভেট গাড়িই বেশী যাচ্ছে। ট্যাক্সি খুবই কম চলছে। রাস্তা দিয়ে যারা চলাফেরা করছেন সব ইউরোপিয়ান। কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে দেখছেন না। আপন মনে চলে যাচ্ছেন। তখন মিষ্টার এবং মিসেস ঠিক করলেন হোটেলে ফিরে গিয়ে রিসেপসন কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করবেন—রবার্ট ও ডেভিডের মেডিকেল কলেজ কোথায়? এবং কতদূরে? সেই মত তারা হোটেলে ফিরে এলেন এবং রিসেপসন্ কাউন্টারে গিয়ে দেখলেন একজন ইউরোপিয়ান মহিলা বসে কাজ করছেন। তাকে মিস্টার ভার্মা বললে—আমরা এই হোটেলের সেভেনটি নাইন নম্বর রুমের বোর্ডার। আমরা আজই সকালে ইণ্ডিয়া থেকে এই লণ্ডন শহরে এসেছি। এই কথা বলাতে রিসেপ্সন মহিলা রেজোস্ট্র খুলে দেখে বললেন—হাঁ, আপনারই ছেলে বরার্ট এবং ডেভিড জেনারেল মেডিক্যাল কলেজের স্টুডেন্ট আপনাদের জন্য এই রুম রিজার্ভ করেছিল। আমি জানতাম আপনারা ওই রুমে রয়েছেন। আমাদের কাছে ইনস্ট্রাকশন আছে—আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া আপনারা যেন একা একা কোথায়ও না বেরোন। যদি কোথাও আপনাদের যাবার প্রয়োজন হয় তবে এই

রিসেপসন অফিসে এসে বলবেন। আমরা গাইডের বন্দোবস্ত করব।

মিস্টার ভার্মা ওই রিসেপ্সন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বলতে পারেন রবার্ট এবং ডেভিড যে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, এখান থেকে কত দূরে? সেই রিসেপসন মহিলা বললেন—তা এখান থেকে অনেক দূরে। গাড়ি করে যেতে হলে এই দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় তো লাগবেই। আপনাদের যদি তাদের সাথে দরকার থাকে তো বলুন আমি ফোনে কনটাক্ট করে তাদেরকে জানিয়ে দেব। মিস্টার ভার্মা বললেন—ঠিক আছে তাদের জানিয়ে দিন তারা যেন এই হোটেলে দিনের বেলায় এই বারটা একটার মধ্যে আসে। আমরা তাদের সাথে লাঞ্চ খাব।

রিসেপ্সন মহিলা বলবেন—ঠিক আছে আমি সব বন্দোবস্ত করছি—যাতে মিস্টার রবার্ট ও মিস্টার ডেভিড কাল দুপুরে আপনাদের সাথে লাঞ্চ খায়। এখন আপনারা আপনাদের রুমে গিয়ে রিলাক্স্ করুন। বিকালে আসবেন যদি বেড়াবার ইচ্ছে হয়। তখন আপনাদেরকে গাইড দেওয়া যাবে। থ্যাঙ্কস্ বলে সেই রিসেপসন মহিলা অন্য প্যাসেঞ্জারদের সাথে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই দেখে মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা লিফ্টে করে ওদের নিজেদের কামরায় চলে গেলেন। এইটুকু ওরা বুঝলেন যে এখানকার লোক বেশী কথা বলে না। খালি কাজের কথা বলে চুপ করে যায়।

এই দেড়টা নাগাদ মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা ডাইনিং রুমে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন সেই ডাইনিং রুমে যারা খেতে বসেছেন সবই ইউরোপিয়ান কাপ্ল। কোন ইণ্ডিয়ান দেখতে পেলেন না। লাঞ্চের মেনু দেখে বুঝলেন—এখানকার ফুড খালি ইউরোপিয়ানরা যা খায় এবং পছন্দ করে সেই মতই তৈরী হয়। খালি বিফ আর পোরকের প্রিপারেশন। মিস্টার এবং মিসেস

ভার্মার কোন অসুবিধা হল না—কারণ ওরা বিফ্ ও পোর্ক্ খেয়ে অভ্যস্ত।

মিস্টার এবং মিসেস লাঞ্চ খেয়ে এই বিকেল সাড়ে চারটের সময় ভাল সাজ পোষাক পরে নিচে রিসেপশন কাউন্টারে চলে এসে দেখলেন—বাইরে প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে। একেবারে বম্বে শহরে বর্ষাকালের মত।

রিসেপশন্ গার্ল বললেন—মিস্টার ভার্মা, আমি বুঝতে পেরেছি আপনারা নতুন আমাদের এই দেশে এসেছেন। এখন একটু বেড়িয়ে আসার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু দেখছেন কীভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কখন যে বৃষ্টি থামবে তার কোন ঠিক নেই। এই বৃষ্টিতে কোথাও কিছু দেখতে পাবেন না। ক্যাব থেকে আর দেখবার জন্য রাস্তাতে নামতেও পারবে না। এত তাড়া কিসের? কাল দুপুরে আপনার ছেলেরা আসছে এবং আপনাদের সাথে লান্চ খাবে। তারা তো এই দেশে তাদের জন্মের পর থেকেই আছে। তারা এই দেশের এবং এই লণ্ডন শহরের সব কিছুই জানে। কালই আপনাদেরকে নিয়ে তারা বেরুবে এবং যতটা পারে দেখাবে। আপনাদের বেড়ানোর জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করে রাখব। আজ রাতে আমাদের ক্যাবারে শো দেখুন। এই রাত আটটা থেকে ক্যাবারে শো আরম্ভ হবে এবং সেই ডানসে আপনারাও যোগ দিতে পারবেন।

মিস্টার ভার্মা বললেন—তাই ভাল, এই বলে মিসেস ভার্মা হাত ধরে বৃষ্টির দিকে কটাখ্যপাত করে রুমে চলে এলেন।

ঠিক রাত আটটার সময় মিস্টার, মিসেস ভার্মার হাত ধরে ক্যাবারে শোর হলে গিয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসলেন। মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা দেখতে লাগলেন—দলে দলে ইউরোপিয়ান কাপল এসে ওই হলে ঢুকছেন। নানান রকম পোষাকে। কোন কোন ইউরোপিয়ান মহিলার পোষাকের পেছন দিকের অন্ততঃ দুহাত ফ্লোরের সাথে লুটিয়ে যাচ্ছে। টেবিলে যারা বসেছিলেন সবাই

ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিলেন। এবং সকলের কাছেই ড্রিঙ্কস এসে গেল। মিস্টার এবং মিসেস ভার্মাও ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছিলেন। তারাও ড্রিঙ্কস্ পান করতে লাগলেন।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় ক্যাবারে ডানসার এসে তার স্টেজে মাইক মুখে করে দাড়ালেন। তখন অমনি গানের এবং বাজনার সুর মাইকে ভেসে উঠল। ক্যাবারে ডানসারকে দেখে মিস্টার ভার্মা বললেন—একেবারে ইউরোপিয়ান লেডি। আমাদের দেশে এইরকম ইউরোপিয়ান ক্যাবারে ডানসার নিতে হলে অনেক টাকার ব্যাপার। কয়েক লক্ষ্য টাকার ব্যাপার। তাই আমাদের দেশের হোটেলের মালিকরা এব্যাপারে আর চিন্তা করছেন না। আমাদের সমুন্দর কা সুন্দরী হোটেলের ক্যাবারে ডানসার একজন পারসিয়ান লেডি। সেই পারসিয়ান লেডি তার হাজব্যাণ্ডের সাথেই আমাদের হোটেলের একটা রুম নিয়ে থাকে। ওই যে আমাদের ট্যারেস শোতে শেষ সেই অ্যাট্রাকটিভ দৃশ্য একজন সুপুরুষ যুবক সেই ডানসারের শেষ শরীরের আবরণ খুলে নেয়—সে আর কেউ নয় সে ওই ডানসার মিসেস্ জুলার হাজব্যাণ্ড মিস্টার জেনিস্।

মিসেস্ ভার্মা বললেন—তাই নাকি? আমি তো এসব কিছুই জানতাম না। আমি ভাবতাম এই শেষ দৃশ্যের জন্যই সেই সুপুরুষ যুবক আসে এবং তার কাজ শেষ করে চলে যায়।

মিস্টার ভার্মা বললেন—দেখ ডার্লিং এটা আমার একটা বিজনেস্ সিক্রেট। একথা কেউ জানে না। খালি জানে আমার ডান হাত ম্যাক্। তাই ম্যাকের উপর আমার হোটেলের সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে লণ্ডনে এসেছি। দু-সপ্তাহ তোমাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে এবং আরামে থাকার জন্য। আজ তোমাকে সব সিক্রেট এক এক করে বলছি। এই জন্য যে তুমি আমার ম্যারেড ওয়াইফ। তোমাকে সবাই মিসেস ভার্মা বলে জানে। আমার অবর্ত্তমানে তোমাকেই সবকিছু দেখতে হবে এবং পরিচালনা করতে হবে।

তখন ক্যাবারে ডানসার বললেন—আমি এইবার নাচের গান গাইছি। আপনারা আস্থন আমার গানের তালে তালে নাচুন। এই বলে ক্যাবারে ডানসার তার নাচের গান শুরু করলেন আর সেই মত বাজনাও বেজে উঠল। সবাই জোড়া জোড়া নাচের জায়গায় চলে গিয়ে নাচতে লাগল।

মিস্টার এবং মিসেস ভার্মার ওই দেশীয় লোকেদের মুভ্‌মেণ্ট দেখে নিজেদের খুব ইনফিরিয়রিটি মনে হল। ওরা দুজনেই একমত হয়ে বললেন চল আমরা আমাদের রুমে গিয়ে সোহাগ রাত পালন করি। এই ঠিক করে ওরা দুজনে ওই হল ছেড়ে ওদের রুমে চলে গেলেন।

রুমে এসে মিস্টার ভার্মা কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে এক বোতল জনি ওয়াকার হুইসকি, দুটো গ্লাস ও জল দিয়ে যেতে বললেন। বেয়ারা অল্প কিছু সময়ের মধ্যে জনি ওয়াকার হুইসকির বোতল, গ্লাস ও জল ভর্ত্তি টব দিয়ে গেল। মিস্টার ভার্মা বেয়ারাকে বললেন এই এক দেড় ঘণ্টা পরে ডিনার দিয়ে যাবে। মিস্টার এবং মিসেস ভার্মা দুজনেই ইভিনিং ড্রেস পরে ক্যাবারে ডানস্ হলে গিয়েছিলেন। মিস্টার ভার্মার পরনে ছিল হোয়াইট ট্রাউজার, ব্ল্যাক বো আর মিসেস ভার্মার রেড জরি বর্ডার লঙ ড্রেস পরেছিলেন। দুজনারই পোষাকে অপূর্ব মানিয়েছিল। ওরা দুজনই ক্যাবারে হল থেকে দুই এক পেগ্ করে ড্রিঙ্ক করে এসেছিলেন। ওদের রুমে এসে মিস্টার ভার্মা বললেন—আমরা এখন আর আমাদের ইভিনিং ড্রেস বদলাব না। এই পোষাকে আমরা ড্রিঙ্কস্ এবং ডিনার খাব তারপর আমরা আমাদের স্লিপিং ড্রেস পরব। এই বলে ওরা ড্রিঙ্কস্ নিয়ে টেবিলে বসে গেলেন।

মিস্টার ভার্মার তিন পেগ খেয়ে চার পেগ তার গ্লাসে ঢেলেছেন তখন মিসেস ভার্মা এক পেগ খেয়ে দুপেগ তার গ্লাসে ঢেলেছেন। মিস্টার ভার্মার তখন একটু নেশা হয়ে গিয়ে অনর্গল কথা বলে

যাচ্ছেন। মিসেস ভার্মার তখন একটুকুও নেশা হয়নি। মিসেস ভার্মা চেষ্টা করেছিলেন মিস্টার ভার্মার প্রানের গোপন কথা শুনতে।

মিসেস্ ভার্মা বললেন—ডার্লিং আজ তুমি এত ড্রিঙ্কস্ করছ কেন? তোমাকে তো কোন দিন ড্রাঙ্ক দেখিনি। মিস্টার ভার্মা বললেন—ডার্লিং তুমি ঠিকই বলেছ। আমি একটা হোটেলের মালিক হয়ে মদ খেয়ে বেহুস হয়ে থাকতে পারি না। বা ওই হোটেলে বসে মেয়ে নিয়েও আমোদ আনন্দ করতে পারি না। তাহলে অত বড় হোটেলের অত কর্মচারি কেউ আমাকে মানবে না। কেউ আমাকে ভয় করবে না। আর সে দিকে আমার কোন নজর দেবার সময় ছিল না। খালি টাকা রোজগার করার চিন্তায় এবং কাজে মত্ত থাকতাম। তাতেই আমি আনন্দ পেতাম। আজ আমি যখন পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে গেলাম তখন দেখলাম আমি জীবনে কিছুই ভোগ করিনি। খালি টাকা রোজগার করেছি। তাই ভেবেছি এবং ঠিক করেছি বাকি জীবনটা ভোগ করেই কাটিয়ে দেব। তাই আজ অমাদের সব থেকে শুভ দিন। আজ প্রাণ ভরে ড্রিঙ্ক করব। প্রাণ ভরে এন্জয় করব। তুমিও ডার্লিং প্রাণ ভরে আমার সাথে এনজয় কর।

* * *

আরও দু পেগ্ খাবার পর মিসেস্ ভার্মা দেখলেন এখন ডিনার না খেলে মিস্টার ভার্মা আর ডিনার খেতে পারবেন না তাই কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে ডিনার দিতে বললেন।

একটু পরেই বেয়ারা এসে ওদের রুমের টেবিলে ডিনার সাজিয়ে দিয়ে গেল।

মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং এখন একটু ডিনার খেয়ে নাও। তারপর ইচ্ছে করলে আবার ড্রিঙ্কস্ করবে। ঠিক ডার্লিং তাই হবে। আজ রাতে তুমি কুইন তুমি যা বলবে তাই শুনব।

আর কোন কথা না বলে মিস্টার ভার্মা খাবার খেতে লাগলেন। সুপ্ মোটেই খেলেন না। খালি বিফ রোস্ট খেতে লাগলেন। আর অন্য সব খাবার আইটেম্ কিছুই ছুঁলেন না। মিস্টার ভার্মার খাবার খেতে খেতে চোখ বুজে আসছিল তখন আবার বললেন—ডার্লিং আরেক পেগ খাব। মিসেস ভার্মা বললেন—হ্যাঁ তোমাকে আর এক পেগ দিচ্ছি এই বলে তার গ্লাসে অল্প একটু হুইসকি ঢেলে বেশী জল দিয়ে মিস্টার ভার্মার হাতে দিলেন। তখন মিস্টার ভার্মার চোখ একেবারে বুজে এসেছে। ড্রিঙ্কসের গ্লাস হাতে পেয়ে বললেন—থ্যাঙ্কস্ ডার্লিং, খুব ঘুম পাচ্ছে ডার্লিং। লেট আস স্লিপ এই বলে বিছানায় গিয়ে সেই পোষাকে এবং জুতো পরেই শুয়ে পরলেন। মিসেস ভার্মা বললেন—এই ভাবে তুমি আজকের শুভরাত এনজয় করবে। মিসেস ভার্মা দেখলেন—মিস্টার ভার্মা নেশার ঘোরে একেবারে ঘুমে অচৈতন্য।

মিসেস ভার্মা কলিং বেল টিপে বেয়ারারকে ডেকে বললেন—দেখেছ, মিস্টার ভার্মা ড্রিঙ্ক করে একেবারে বেহুস হয়ে পড়েছেন। তবে হাঁ ভয়ের কিছু নেই। ওনার ইভিনিং ড্রেস পাল্টিয়ে স্লিপিং ড্রেস পড়িয়ে দিলে খুব ভাল হবে। তা না হলে সারারাত এই পোষাকেই শুয়ে থাকবে, ভাল ঘুম হবে না এই বলে বেয়ারাকে স্লিপিং ড্রেস দিয়ে মিসেস ভার্মা বাথরুমে চলে গেলেন। এই দশ পনের মিনিট বাদে এসে মিসেস ভার্মা দেখলেন—বেয়ারা মিস্টার ভার্মার পোষাক পাল্টিয়ে ডিনার টেবিল পরিস্কার করে চলে গিয়েছে। মিসেস ভার্মা তার স্লিপিং নাইটি পরে নিলেন। তারপর মিস্টার ভার্মার মুখের দিকে চেয়ে দেখে বললেন—এখন কী রকম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্চে। কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আর যখন ক্রুয়েল হত তখন ওর মুখখানি কত কদর্য্য কত হিংস্র দেখাত। তারপর আবার মনে মনে মিসেস ভার্মা বললেন না এসব কথা আর আমার ভাবা উচিত নয়। মিস্টার ভার্মা এখন আমার বিলাভেড

হাজব্যাণ্ড। আমাকে এখন এতটা ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে বলে আমার কাছে এই রকম অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে এই সব ভেবে মিসেস ভার্মা মিস্টার ভার্মার পাশে শুয়ে পড়লেন।

সকাল আটটায় মিসেস ভার্মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মিস্টার ভার্মার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এখনও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছে; তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলেন বাইরে খালি কুয়াসা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বেয়ারাকে ডেকে চা দিতে বললেন। বেয়ারা একপট চা, দুধ, চিনি, কাপ সব দিয়ে গেল। মিসেস ভার্মা এককাপ চা বানিয়ে খেতে লাগলেন—মিস্টার ভার্মার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। হাত, পা, নাড়াচাড়া করছেন। মিসেস ভার্মা বললেন—গুড মর্ণিং ডার্লিং চা দেব। মিস্টার ভার্মা বললেন—গুড মর্ণিং ডার্লিং চা খেতে তোমার কাছেই যাচ্ছি। এই বলে মিস্টার ভার্মা মিসেস ভার্মার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। চা খেতে খেতে বললেন—ডার্লিং কাল রাতের কথা আমার কিছুই মনে পড়ছে না। নিশ্চয়ই আমরা খুব এনজয় করেছি।

মিসেস ভার্মা বললেন—হ্যাঁ তুমি ড্রিঙ্কস্ খেয়ে খুব এনজয় করেছ। তুমি যে ড্রিঙ্কস্ খেতে এত ভালবাস তা তো কোনদিন দেখি নি। বেহুস না হওয়া পর্যন্ত খালি গ্লাসের পর গ্লাস খেয়েই চলেছ তো খেয়েই চলেছ। তুমি বেহুস হয়ে শুয়ে পড়লে তারপর বেয়ারাকে ডেকে তোমার ইভিনিং ড্রেস পাল্টিয়ে স্লিপিং ড্রেস পরিয়ে দেওয়া হল। ডিনার তো ধরতে গেলে কিছুই খেলে না। খালি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে থাকলে—ডার্লিং আমাকে বিয়ে করে তুমি হ্যাপি? আমি যতই বলি হা ডার্লিং আমি খুব হ্যাপি হয়েছি ততই তুমি বারবার জিজ্ঞাসা করেছ সত্যি বল তুমি হ্যাপি?

মিস্টার ভার্মা বললেন—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমাকে কাল রাতে খুব কষ্ট দিয়েছি। বিরক্ত করেছি। সত্যি আমি খুব দুঃখিত। প্রথম রাতেই ডার্লিং তোমাকে এত বিরক্ত করলাম আমার সত্যি

খুব লজ্জা করছে। আমার এতটা পারসোনালিটি, যার জন্য আমার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না আর তোমার সাথে প্রথম রাত্রে এই রকম বেহায়াপনা করলাম।

মিসেস ভার্মা বললেন—তুমি এটাকে বেহায়াপনা মনে করছ কেন? আমি তোমার ওয়াইফ আমার কাছে সব সময় ফ্রাঙ্ক থাকলেই তুমি শান্তি পাবে। আমার কাছে বসে তোমার যা প্রাণে চায় তাই করতে পার তাকে বেহায়াপনা বলে না। সেটাকে বলে সরলতা।

মিস্টার ভার্মা বললেন—থ্যাঙ্কস্ ডার্লিং তোমার মন এত বড়! আমি এটা আজ বুঝলাম এখন আমি বুঝেছি। তোমাকে পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং চল আমরা মুখ হাত ধুয়ে পোষাক পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রবার্ট ও ডেভিডের জন্য অপেক্ষা করি।

এই ঘণ্টাখানেক বাদে মিস্টার এবং মিসেস বাথরুমের কাজ সেরে, ভাল সাজ-পোষাক পরে ওদের হোটেলের রুমে রবার্ট ও ডেভিডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিস্টার ভার্মার মনে পড়ল সেই কতদিন আগেকার কথা। তার হোটেলের একজন ইউরোপিয়ান প্যাসেঞ্জার তার হোটেলে অনেকদিন ছিলেন এবং তার সাথে খুব ভাব হয়ে যায়। সেই ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের নাম মিস্টার ব্যাপটিস্ট। তখন রবার্ট ও ডেভিড খুব ছোট এই বছর দুই মত হবে। একটা আয়া তারই হোটেলের এক কামরায় কোন মতে দেখাশুনা করছিল। মিস্টার ভার্মা বুঝেছিল এখানে তার কাছে রেখে ছেলে দুটিকে বাচানো যাবে না তাই মিস্টার ব্যাপটিস্টকে তার দেশে নিয়ে গিয়ে মানুষ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক তার কথায় দয়া পরবশ হয়ে সেই শিশুপুত্রদ্বয়কে নিয়ে এসেছিলেন লণ্ডন শহরে এবং এক মিশনারি সোসাইটিতে রেখে দিয়েছিলেন। মিস্টার ব্যাপটিস্টের কথা মত

সেই মিশনারি সোসাইটিতে মাসে মাসে ডোনেসন পাঠাতেন। তারপর ওরা বড় হলে মিস্টার ব্যাপটিস্ট বড় স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। ব্যাপটিস্টই ওদের নাম রবার্ট ও ডেভিড রেখেছিলেন। মিস্টার ভার্মা শুনেছেন এই কয়েক বছর হল মিস্টার ব্যাপটিস্ট মারা গিয়েছেন। মিস্টার ভার্মা এই সব ভাবনা চিন্তা করছিলেন। এখন নিজে মনে মনে স্বীকার করছেন আমি ছেলেদের বাবা হয়ে কী কর্তব্য করেছি? খালি টাকা দিয়ে কর্তব্য শেষ। এরা বাবা মার স্নেহ ভালবাসা তো কোনদিন পায়নি? এখন সত্যি তিনি মনে মনে খুব অনুশোচনা করতে লাগলেন।

এই সাড়ে বারটা নাগাদ রিসেপশন অফিস থেকে ফোনে মিস্টার ভার্মাকে জানিয়ে দিল যে রবার্ট ও ডেভিড হোটেলে এসে পৌঁছে গিয়েছে এবং এখন তাদের সাথে দেখা করবার জন্য তাদের রুমে যাচ্ছে। এই ফোনের সংবাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রবার্ট ও ডেভিড মিস্টার ও মিসেস ভার্মার রুমে এসে নক করতে মিস্টার ভার্মা দরজা খুলে দিলেন। ওরা রুমে ঢুকে ড্যাডি ও মামি বলে মিস্টার ও মিসেস ভার্মার সাথে করমর্দন করল।

মিস্টার রবার্ট বলল—ড্যাড্, গতকাল রাত্রে তামাদের রিসেপশন গার্ল আমাকে ফোনে জানিয়েছে যে তোমরা আজ আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছ। আমাদের স্টুডেন্ট হোস্টেলে একঘেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গিয়েছে। তাই আজ তোমাদের সাথে লাঞ্চ খেতে খুব ভাল লাগবে। জান ড্যাড্, মামি—আমরা আমাদের ছোট বয়স থেকে এই বোর্ডিং হাউসে থেকে থেকে ফ্যামিলি লাইফ কি তাই জানি না। আমরা আমাদের বাবা মাকে কোন দিন দেখিনি। ড্যাড্ তুমিও কোনদিন একটা চিঠিও লেখনি আর কোনদিন ইণ্ডিয়াতেও নিয়ে যাওনি। আমরা যখন আমাদের বন্ধুদের সাথে ওদের বাড়ি যাই তখন দেখি ওদের বাবা, মা কত

রকম খেতে দেন আর কত রকম ভাল ভাল কথা বলেন। বন্ধুদের বার্থ ডে পার্টিগুলো আরও খুব ভাল লাগত। সেই বার্থ ডে পার্টিতে ওদের বাবা, মা কত ভাল ভাল জিনিষ প্রেজেন্ট করত। কতরকম ভাল ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করত। তবে ড্যাড, এখন আমরা বড় হয়ে গিয়েছি সব বুঝতে শিখেছি, এখন আমরা এদেশের নাগরিকদের যত সব অভ্যাস করে নিয়েছি। এটা বুঝেছি এটাই আমাদের দেশ, এদেশেরই আমরা নাগরিক। আমরা আর ইণ্ডিয়াতে কোন দিন ফিরে যাব না।

ডেভিড রবার্টকে বলল—ড্যাডিকে আঘাত দিয়ে কথা বলছ কেন? ড্যাডি তো আমাদের জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করেছেন। যার জন্য আমরা নবল প্রফেসনে শিক্ষিত হবার চান্স পেয়েছি। মিস্টার ব্যাপটিস্ট যিনি আমাদের সব সময় দেখাশুনা করতেন, তিনি ত ড্যাডির বন্ধু। তিনি তো আমাদের ভালভাবে, ভাল লাইনে লেখা পড়া শেখার জন্য অনেক সাহায্য করেছেন। আজ যদি ইণ্ডিয়াতে থাকতাম তবে এইভাবে এদেশের ছেলেদের মত শিক্ষিত হতে পারতাম না। এখান থেকে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরুলে পৃথিবীর সবখানেতেই ভাল আসন পাব।

ওদের কথা বলতে বলতে প্রায় দেড়টা বেজে গেল। মিস্টার ভার্মা বেয়ারাকে ডেকে লাঞ্চ দিতে বললেন।

একটু বাদেই বেয়ারা পুসিং টেবিলে করে লাঞ্চ নিয়ে এসে টেবিলে সাজিয়ে দিতে লাগল।

ওরা চারজনেই লাঞ্চ খেতে বসে গেল। মিসেস ভার্মা রবার্ট ও ডেভিডকে বললেন—আমরা তো বড় জোর এখানে দুসপ্তাহ থাকব। তোমরাও দুই এক সপ্তাহের জন্য ছুটি নিয়ে চল আমাদের সাথে ইণ্ডিয়াতে।

ডেভিড বলল—মামি, এখন তো হোতে পারে না। সামনেই আমাদের একজাম। তোমারা এই দু-সপ্তাহ এখানে থেকে বেড়িয়ে

সব জায়গা দেখে যাও। আমাদের সাথে তো এখন চেনা জানা হয়ে গেল। পরে আমরা দুভাই একসাথে যাব তোমাদের নিমন্ত্রণ আমরা নিলাম।

লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেলে রবার্ট ও ডেভিড বলল—ড্যাড, মাম, এখন আমরা যাচ্ছি পরে আবার দেখা করব। তোমাদের কোন দরকার হলে ফোন করবে চলে আসব। এই বলে ওরা ওঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিস্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে বললেন—দেখলে রবার্ট কি রকম মুড নিয়ে কথা বলল। সেইজন্য ওদেরকে আর বললাম না—সময় করে বিকালের দিকে আসিস তোদের সাথে লণ্ডন শহরের সব জায়গা ঘুরে দেখব।

মিসেস ভার্মা বললেন—রবার্ট অভিমানে এত সব কথা বলে গেল ওসব কিছু মনে কোর না। এখন ওরা এ্যাডালট হয়েছে। যা ভাল মনে করবে তাই ওরা করুক। আমাদের আর এই নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চল ডার্লিং এখন একটু রিলাক্স করে বিকেলে রিসেপসনের গাইড নিয়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে।

*　　　　*　　　　*

বিপিন ভাই ও সুষমা দেবীর কেয়ারে থেকে টিঙ্কু এখন প্রায় নরমাল হয়ে এসেছে। মিস্টার ভার্মার নির্দেশ অনুসারে ওনারা টিঙ্কুকে একটু স্পেশাল ভাবে দেখছেন। তার রোজ চিকেনের ঠ্যাং চাই। আর ক্যাডবারি চকলেট। এখন টিঙ্কু একটু বড় হয়েছে। ওখানে প্রায় এক বছর হতে চলল। এখন বেশ কথা শিখেছে।

বিপিনভাই ও সুষমা দেবী ওদের হোমে একটা খুব ভাল জিনিষ চালু করেছেন। একটা রেজেস্ট্রি বুক রেখেছেন। তাতে প্রত্যেক মেয়ের নাম, বাবার নাম, জন্ম তারিখ ও মেয়েদের বাবার ঠিকানা লেখা আছে। ওই জন্মদিন দেখে প্রত্যেক মেয়ের জন্মদিন পালন

করা হয়। সেই প্রত্যেক মেয়ের জন্মদিনে মিস্টার ভার্মা নিমন্ত্রিত হন, আর প্রধান অতিথীর আসন অলঙ্কৃত করেন। সেদিন মিষ্টার ভার্মা সব মেয়েদের জন্য ভাল ভাল পোষাক এবং মিষ্টি নিয়ে আসেন। যার জন্মদিন সেই ওই সব জিনিষ 'সব মেয়েদেরকে বিতরণ করে। যারা গান যানে তারা গান গেয়ে শোনায়। যারা নাচ শিখেছে, তারা নাচ দেখায়। খুব হৈ চৈ হয়।

এর মধ্যে একদিন বিপিনভাই ও সুষমা দেবী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন—মিঠুনের (টিঙ্কুর নতুন নাম) তো দুমাস বাদে এক বছর পূর্ণ হবে। এই তো প্রথম বছর। এই প্রথম বছর মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা করে পালন করতে হবে। মিস্টার ও মিসেস ভার্মাকে নিমন্ত্রণ করা হবে। বিপিন ভাই বললেন—মিস্টার ভার্মাকে মিঠুনের জন্মদিনে একটা বড় টয়গান প্রেজেন্ট করতে বলব।

এর কয়েক দিন বাদে মিঠুন দাদাজি ও দিদাজির কাছে বসে চক্‌লেট খাচ্চিল। সুষমা দেবী মিঠুনকে বললেন আর দুমাস বাদেই তোমার জন্মদিন। সেদিন খুব ধুম ধাম করে আমরা তোমার জন্মদিন পালন কোরব।

মিঠুন বলল—ও রোজ রাজা দাদাজী হামারা লিয়ে বহুৎ খানা লেয়ায়গা।

ওখানকার সব মেয়েরা মিষ্টার ভারমাকে রাজা দাদাজী—বলে।

বিপিন ভাই বললেন—ও রোজ তোমারা লিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা মিঠাই লেয়ায়গা, টয় লে আয়গা তোম্ একদম খুস হো যায়গা।

সেই সময়—বিপিন ভাইর ছোট ভাই তাদের দেশ গুজরাট থেকে এসে ওই ঘরে ঢুকলেন। তিনি হাতে করে বড় একটা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সেই মিষ্টির প্যাকেট সুষমা দেবীর হাতে দিয়ে তাদেরকে প্রণাম করলেন।

মিঠুন—সুষমা দেবীকে বলল দিদাজী, এ কোন হ্যায়? সুষমা

দেবী বললেন—এ তোমারা ছোট দাদাজী। এই বলে মিষ্টির প্যাকেটটা কাছেই টেবিলের উপর রাখলেন।

ওই মিষ্টির প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে ওই ঘরের বাইরে চলে গিয়ে সব মেয়েদেরকে বলল—এক ছোটা দাদাজী আয়া হ্যায়। হাম্ লোক কা লিয়ে মিঠাই লে আয়া। চল হাম লোক ও ঘরমে যাকে ছোটা দাদাজী—আ গিয়া বলকে বহুৎ জোরসে চিল্লায়গা। এই বলে মিঠুন আর সব মেয়েদেরকে ওই ঘরে নিয়ে এল। ওই সব মেয়েরা ওই ঘরে ঢুকেই খুব জোরে জোরে চেচাতে লাগল—ছোটা দাদাজী আ গিয়া। ছোটা দাদাজী আ গিয়া। তাদের চেচান শুনে সুষমা দেবী বললেন—তোমাদের চেচান অনেক হয়েছে। এখন তোমরা একটু থাম, তখন সকলেই চুপ্ করে গেল।

মিঠুন—টেবিলের উপর রাখা মিষ্টির প্যাকেটের দিকে তাকাতে লাগল তাই দেখে সুষমা দেবী বললেন—মিঠুন তোম্ মিঠাই খায়গা? তোম ওই প্যাকেট সে একঠো মিঠাই লে লও। সেই কথা শুনে মিঠুন বলল—দিদাজী হাম মিঠাই বাটে গা? এই কথা বলে, দিদাজীর কথার অপেক্ষা না করে মিঠাই প্যাকেট ধরে খুলে ফেলে, একটা মিষ্টি দিদাজীকে দিল, একটা মিষ্টি ছোটা দাদাজীকে দিল। তারপর একটা একটা মিষ্টি সব মেয়েদেরকে দিল। সবাইকে দেওয়া হয়ে গেলে, মিঠুন নিজে একটা মিষ্টির অর্দ্ধেকটা মুখে পুরে দিল। আর অর্দ্ধেকটা বাঁ হাতে রেখে, ডান হাত দিয়ে মিষ্টির প্যাকেটটা টেবিলের উপর রাখল। তারপর সেই প্যাকেট থেকে আরেকটা মিষ্টি তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড়। অন্যান্য মেয়েরাও মিঠুনের দেখা দেখি মিঠুনের পিছু পিছু দৌড়ে ও ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল।

বিপিন ভাই বললেন—দেখেছ, মিঠুন, কী চালাক মেয়ে হয়েছে এরই মধ্যে। দেখলে? কেমন বুদ্ধি করে। আগে আমাদেরকে মিষ্টি দিল। তারপর সব মেয়েদেরকে দিল। তারপর নিজে দুটো

মিষ্টি নিয়ে পালাল। যাতে ওর দুটো মিষ্টি খাওয়ার জন্য আমরা কিছু না বলি। সবাই হেসে উঠল।

এই ভাবে মিঠুন বিপিন ভাই ও সুষমা দেবীর কাছে—নতুন দাদাজী ও দিদাজীর স্নেহে ও আদরে বড় হতে লাগল। মিঠুনের খাওয়া, দাওয়ার কোন কিছুর অভাব নেই সেখানে। মিঠুন যখনই যা চাচ্ছে ওর দাদাজীর কাছে। পরক্ষণেই সেই জিনিষ পেয়ে যাচ্ছে।

এদিকে দেখতে দেখতে ফেবরুয়ারি মাস এসে গেল। বিপিন ভাই ও সুষমা দেবী ঠীক করলেন—বিষে ফেবরুয়ারি মিঠুনের জন্ম দিন করা হবে। তবে মিষ্টার ভার্মার সম্মতি পেলেই বিপিন ভাই মিঠুনের কাছে এবং সব মেয়েদের কাছে মিঠুনের জন্মদিনের উৎসবের তারিখ ঘোষণা করবেন।

* * *

মিষ্টার ভার্মা মিসেস্ ভার্মাকে নিয়ে লণ্ডন থেকে দিন দশেক বাদেই তাঁর বম্বের "সমুন্দর কা সুন্দরী" হোটেলে ফিরে এলেন। লণ্ডনে থাকা কাপিন রবার্ট ও ডেভিডের সাথে ওদের কয়েকবার—দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। ওদেরকে দেখে এবং ওদের সাথে এই কয়েকদিন কথা বার্ত্তা বলে মিষ্টার এবং মিসেস্ ভার্মা বুঝতে পেরেছেন যে তার ছেলেদের সাথে কোন দিনই মিশ খাবে না। ওরা তো বৃটিস সিটিজেন হয়ে গিয়েছে, আর কোন দিনই ইণ্ডিয়াতে ফিরে আসবে না। ওরা ইচ্ছে করেই আসবে না। ওরা বুঝতে পেরেছে যে ওদের বাবা 'মা' মানে আমরা, ওদেরকে কোন দিনই সেই মমতা দেখাই নি। ওরা তো স্পষ্টই বলেছে—আর বড়জোর বছর দুই পড়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত টাকার দরকার হতে পারে। তারপর আর টাকা লাগবে না। আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেবেও না।

এক রাত্রে ওদের বিলাসবহুল রুমে মিস্টার ও মিসেস্ ভার্মা ড্রিঙ্ক করতে করতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। মিস্টার

ভার্মা মিসেস্ ভারমাকে বললেন—দেখলে। আমাদের এত বড় দুটো ছেলে থাকতেও আমার আপন বলতে কেউ নেই! ওরা তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে। ইণ্ডিয়াতে কোন দিনই যাবে না।

মিসেস্ ভারমা বললেন—দেখ, ডার্লিং রবার্ট ও ডেভিড ওরা তো একেবারেই পুরো ইউরোপিয়ান হয়ে গিয়েছে। ওরা ওদেশে। ও দেশের প্রথা অনুযায়ী ছোট থেকে বড় হয়েছে। সারা জীবন ওদেশের প্রথা অনুযায়ী থাকবে। ওই দেশে তো এই নিয়ম, এ্যাডাল্ট হলে আর বাবা, মার সাথে থাকবে না। আর বিয়ে করলে তো কথাই নেই। কদাচ বাবা মার সাথে দেখা হবে। কাজেই ও নিয়ে মাথা খাটিয়ে আমাদের কোন লাভ হবে না; খালি মনই খারাপ হবে। আমাদের নিজেদের চোখে দেখে এলাম—ছেলে দুটি মানুষ হয়েছে, ভাল ভাবেই মানুষ হয়েছে। এতেই আমাদের সুখ, এতেই আমাদের শান্তি। তখন রাত এই এগারটা হবে। যখন মিস্টার ও মিসেস্ ভারমা ড্রিঙ্ক করছিলেন ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় ক্রিং ক্রিং করে মিস্টার ও মিসেস্ ভারমার রুমে ফোন বেজে উঠল। মিস্টার ভারমা ফোন ধরে বললেন—আমি মিস্টার ভারমা বলছি। ওদিক থেকে বলল—আমি বিপিন ভাই বলছি। মিস্টার ভারমা বললেন কী ব্যাপার এত রাত্রে আপনি ফোন করছেন? কিছু অঘটন ঘটেছে কি? বিপিন ভাই বললেন—না, কিছুই অঘটন ঘটেনি। আমি এই রাত এগারটায় আপনাকে ফোন করছি—আমি তো জানি। এই রাত এগারটা আপনার সন্ধ্যা রাত। আপনি তো রাত দুটো, তিনটে পর্য্যন্ত হোটেলে কাজ করেন। এর আগে ফোন করিনি এই জন্য যে এর আগে ফোন করলে আপনাকে পাব না। সেই জন্যই আপনাকে এই সময় পাওয়া যাবে বলে, এখন ফোন করছি।

মিস্টার ভার্মা বললেন—বিপিন ভাই, ভাবিজি ভাল আছেন তো? আপনাদের ওখানকার সব খবর ভাল তো? আমরা লণ্ডন

থেকে ফিরে এসে আপনাদের কোন খবরই নিতে পারিনি। আমাদের বিয়ে হবার পর। আমি সব বিষয়ে—একটু ইনডিফারেণ্ট হয়ে গিয়েছি। এখন বলুন বিপিন ভাই, আপনি আমাকে কেন ফোন করলেন ?

বিপিন ভাই বললেন—ভারমা সাহেব আপনার মনে আছে ? এক বছর হতে চলল্ রাত বারটার সময়—আপনি একটি তিন বছরের ফুট ফুটে মেয়ে আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন—তার স্টেপ্ মাদার এই রাত্রে মেয়েটাকে বাড়ি থেকে রাস্তায় বের করে দিয়েছিল এবং সেই মেয়েটার বাবা মিস্টার কাপুর আপনার বন্ধু। সেই রাতে, সেই মেয়েটিকে তার বাবা দিয়ে গিয়েছিল পেলে পুষে মানুষ করার জন্য। আর আপনি কোন উপায় না দেখে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মিস্টার ভার্মা বললেন—বিপিন ভাই আমার সব মনে আছে। কেন ? সেই মেয়েটির কী কিছু হয়েছে ? তার লেখা পড়া ঠিক মত হচ্চে তো ?

বিপিন ভাই বললেন—ভারমা সাহেব, সেই মেয়েটি যার নাম আপনি মিঠুন-কাপুর রেখেছেন, সে তো ৯ই ফেবরুয়ারি মাসে তিন বছর থেকে চার বছরে পড়েছে। এই আর কয়েক মাস বাদেই ওর লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করব। এরই মধ্যে ওই মেয়েটি বেশ চালাক চতুর হয়ে উঠেছে। আমি আপনাকে ফোন করেছি, এই জন্য যে আপনি যদি সম্মতি দেন তাহলে মিঠুনের—জন্মদিনের উৎসব উদ্‌যাপনের তারিখ সামনের বিশে ফেব্রুয়ারি ধার্য্য করব। মিস্টার ভার্মা বললেন—আজ কত তারিখ ? ভার্মা সাহেব আজকের তারিখ জিজ্ঞেস করাতে বিপিন ভাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবলেন কী ব্যাপার ভারমাসাহেবের আজকের তারিখ মনে নেই ? তারপর ভার্মা সাহেবকে বললেন—আজ ফেবরুয়ারি মাসের পনর তারিখ মঙ্গলবার। ফেবরুয়ারী মাসের বিশ তারিখ হবে সামনের রবিবার।

মিস্টার ভারমা বললেন—ঠিক আছে। বিপিন ভাই ওই বিশ তারিখই মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব ধার্য্য করুণ। তারপর বললেন আচ্ছা বিপিন ভাই ওর জন্মদিনে মিঠুনের জন্য স্পেশাল কিছু প্রেজেণ্ট করা দরকার ?

বিপিন ভাই বললেন—ভার্মা সাহেব, আমি তো আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি মনে করে দিলেন বলে, আমার মনে পড়ে গেল। মিঠুন খালি ওর হাত মেয়েদের দিকে বাগিয়ে ডুম্ম্ ডুম্ম্ করে আর বলে হাট যাও গুলি লাগ যায়গা। আর মাঝে মাঝে মেয়েদেরকে বলে—হাম্ একঠো সের লে আয়গা। তোম্ লোক্‌কো কাটেগা। এক কাজ করুণ—ওর জন্ম দিনে ওর জন্য একটা বড় টয় গান্, ও একটা বেশ বড় দেখে টয় টাইগার নিয়ে আসুন। আপনি মিঠুনকে টয় গান প্রেজেণ্ট করুণ আর মিসেস্ ভারমা টয় টাইগারটা প্রেজেণ্ট করুক। দেখবেন মিঠুনের সাথে আপনাদের খুব ভাব হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, বিপিন ভাই। আমার ডাইরিতে আমি লিখে রাখছি বিশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছটায় মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব। তারপর গুড্ নাইট বলে মিস্টার ভার্মা ফোন রেখে দিলেন।

মিসেস ভার্মা বললেন—ডার্লিং, বিপিন ভাইয়ের সাথে এত কী সব কথা বলছিলে ? ও কোন ভি, আই, পি যার বার্থ ডে নিয়ে এত আলোচনা ?

মিস্টার ভারমা বললেন—ডার্লিং এটাই আমার লাস্ট গেম। আমি একটি সুন্দরী ফুট ফুটে মেয়েকে রাস্তায়—কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার ম্যানেজার ম্যাককে তুমি ভাল করেই চেন। এই এক বছর হতে চলল। ম্যাক ওই মেয়েটিকে রেল লাইনে পেয়েছে। ম্যাক ওর জীবন বিপন্ন করে। মেয়েটিকে বাঁচিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আমি বিপিন ভাইর কাছে সেই মেয়েটিকে রেখেছি। লালন পালন করে মানুষ করতে। বড় করতে। সব রকম শিক্ষা

দিয়ে শিক্ষিত করতে। নাচ, গান যেন কিছুই বাকি না থাকে। তুমি আমার ওয়াইফ। তুমি আমার খুবই আপনজন। তাই আমি অকপটে তোমাকে বলছি এটাই আমার লাস্ট গেম্। এই মেয়েটি একটু বড় হলে, যে কোন ফরেনার, যে নাকি খুউব অর্থশালী। তার সাথে বিয়ে দিয়ে, তার দেশে পাঠিয়ে দেব। তাতে আমার ও অনেক অনেক ধন দোলত হবে। এই জন্য মিঠুনের শিক্ষার বাবাদ, অনেক টাকা খরচ করে মিঠুনকে সব দিক দিয়ে শিক্ষিত করার ইচ্ছে আছে। এই ফেবরুয়ারি মাসের বিশ তারিখে মিঠুনের জন্মদিনের উৎসবে তুমিও আমার সাথে যাবে। সেই দিন সেই মেয়েটিকে দেখবে। তখন কিন্তু বলতে পারবে না, এই মেয়েটিকে আমাকে দাও। আমি আমার মেয়ের মত মানুষ করব। আমার তো কোন সন্তান নেই। আমার কাছে সারা জীবন থাকবে। তুমি যদি অন্যের সন্তান নিয়ে মানুষ করতে চাও। তুমি অনেক পাবে। সে আলাদা কথা। কিন্তু তোমাকে আগে থেকে বলে রাখছি। মিঠুনকে দেখে, কোন সময় মনে স্থান দেবে না, যে মিঠুনকে তুমি নিয়ে তোমার নিজের মেয়ের মত বড় করবে। মানুষ করবে। আজীবন তোমার কাছে রাখবে।

মিসেস্ ভারমা বললেন—ঠিক আছে ডার্লিং। আই ডু এ্যাগ্রি। তোমার নিজের ছেলেই পর হয়ে গেল। আর অন্যের ছেলে মেয়ে? অন্যের ছেলে মেয়ে ছোট সময়েই ভাল লাগবে। বড় হয়েই মুখোস খুলবে। আমি তোমাকে নিয়ে বেশ ভালই আছি। ভগবান যদি কৃপা করেন। আর আমাদের যদি কোন সন্তান হয়। তাহলে আমাদের আর কোন আপ্‌সোস থাকবে না।

এই সময় আবার তাদের রুমে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল।

মিস্টার ভার্মা বললেন—দেখেছ, ডার্লিং আমাদেরকে এরা সব কিছুতেই রিলাক্স করতে দেবে না। খুব বিরক্ত সহকারে মিস্টার

ভারমা টেলিফোন ধরেই বললেন এত রাত্রে কে? কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করছ? ফোনের অপর দিক থেকে বলল—স্যার। আমি ম্যাক বলছি—এই মাত্র একজন এ্যারবেয়ান একটি ইণ্ডিয়ান যুবতি মেয়ে নিয়ে এসেছে। তারা আমাদের এই হটেলে একটা ঘর ভাড়া চাচ্ছে। দশ দিন থাকবে। তারা যে কোন এ্যামাউন্ট দিতে রাজী আছে।

মিস্টার ভারমা বললেন—দেখ ম্যাক। তুমি আমার অবর্ত্তমানে এই হোটেল চালিয়েছ। এখন দেখছি। তোমার আসল বুদ্ধি কিছুই হয় নি। জেণ্টস্ ভদ্রলোক কে দেখছ—এ্যারাবিয়ান। আর তার সাথের মেয়েটিকে দেখছ ইণ্ডিয়ান। কোথা থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে। তার কোন ঠিক নেই। প্রচুর পয়সা দিলেই তো হল না। এই রকম ক্ষেত্রে কথনই কাউকে রুম্ দেবে না। হাঁ। ম্যাক আরেকটা কথা মনে রাখবে—রাত এগারটার পর আর কথনো আমাকে বিরক্ত করবে না। আর সন্দেহজনক কাউকে আমার অবর্ত্তমানে রুম দেবে না। আমি কোন দিন কোন এ্যারাবিয়ানকে ইণ্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করার পর এ হোটেলে থাকতে অনুমতি দেই নাই। বিয়ে দিয়ে। সেদিনই তাদেরকে তাদের নিউলি ম্যারেড ওয়াইফ নিয়ে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিস্টার ভার্মা ম্যাককে আরও বললেন—আমার অবর্ত্তমানে এবং রাত দশটার পর তুমিই সব কিছু ডিসিশান নেবে। তাতে যদি কিছু খারাপ হয় তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে না। তোমাকে ফুল পাওয়ার দিলাম। তারপর গুড্ নাইট বলে লাইন কেটে দিলেন।

*　　*　　*　　*

বিপিন ভাই ভার্মা সাহেবের সাথে কথা বলে তার সম্মতি পেয়ে সুষমা দেবীকে বললেন মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব উদ্‌যাপনের তারিখ এই ফেবরুয়ারি মাসের বিশ তারিখই ধার্য করা হল। মিস্টার এবং মিসেস্ ভারমা দুজনেই সন্ধ্যা ছটায় আসবেন।

সুষমা দেবী বললেন—কাল সকাল সাতটায়—আমার রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে পূজো হয়ে যাওয়ার পর। সব মেয়েরা রোজকায় মত স্তোত্র পাঠ করবে। তার পর সবাই ব্রেকফাস্ট খেতে টেবিলে যাবে। তখন আমি মিঠুনকে এবং অন্য সব মেয়েদেরকে। মিঠুনের জন্ম দিনের উৎসব উদযাপনের তারিখ ঘোষণা করব।

বিপিন ভাইর এই হোমের নিয়ম হল সকলেই ঘুম থেকে ভোর ছটায়—উঠবে। মিঠুনের আয়া এবং অন্য সব আয়ারা ও সব মেয়েদেরকে ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠিয়ে দেয়।

এই দিন ও অন্য সব দিনের মত সব মেয়েদেরকে ভোর ছটায়—আয়ারা ঘুম থেকে উঠিয়ে দিল মিঠুনের আয়া ও মিঠুনকে ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠিয়ে বাথরুম করিয়ে। মুখ, হাত, ধুইয়ে, ভাল জামা পড়িয়ে, সুষমা দেবীর শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে নিয়ে গেল। মিঠুনের সাথে সাথে আরও সব অন্য মেয়েরা ওই মন্দিরে এল। তখন সাতটা বেজে গিয়েছে। মিঠুন ও সব মেয়েরা এসে দেখল তাদের দিদাজী মন্দিরে এসে, এখন পুজো করছেন।

মিঠুন হঠাৎ ওই দেবতার দিকে তাকিয়ে বলল—আংকেল। হামকো মামিজি কা পাছ লে চল। মিঠুনের মুখ থেকে ওই কথা শুনে, সুষমা দেবী পুজো বন্ধ করে, কেমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে মিঠুনের দিকে তাকিয়ে থাকল। মিঠুন ওর দিদাজির ওই রকম তাকানো দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে অন্য মেয়েদের পাশে এসে বসে পড়ল। তাই দেখে সুষমা দেবী আবার পূজোয় মন দিলেন। পুজো হয়ে গেলে। সব মেয়েরা দাড়িয়ে গানের সুরে স্তোত্র পাঠ করল। মিঠুন এখনও স্তোত্র পাঠ করা শেখেনি তাই চুপ করে মেয়েদের সাথে দাড়িয়ে থাকল।

মেয়েদের স্তোত্র পাঠ হয়ে গেলে। সুষমা দেবী সবাইমে প্রসাদ বিতরণ করলেন। তারপর সব মেয়েদেরকে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন। সব মেয়েদের সাথে মিঠুন ও ব্রেকফাস্ট টেবিলে

গিয়ে বসল। আর একটু পরে বিপিন ভাই ও সুষমা দেবী সেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে চলে এলেন।

বিপিন ভাই রোজই মিঠুনকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দেন। দাদাজীর হাতে না খেলে মিঠুনের পেট ভরে না। রোজ সকালে দাদাজীর হাতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে মিঠুন খুব দাদাজীর ভক্ত হয়ে উঠেছে। সেদিন দাদজী ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসতেই মিঠুন দাদাজীর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল। মিঠুনকে দাদাজী একটু আদর করলেন—পরে সকালের ব্রেকফাস্ট খাওয়া আরম্ভ হওয়ার আগে, দাদাজী বললেন—তোমাদের সকলের কাছে একটা সুখবর আছে। সব মেয়েরা চুপ হয়ে গেল।

দাদাজী বললেন—তোমরা সবাই জান, প্রত্যেক বছর তোমাদের প্রত্যেক মেয়ের জন্মদিনের উৎসব পালন করা হয়। এবার মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব পালন করা হবে। এই ফেবরুয়ারি মাসের বিশ তারিখ মিঠুনের জন্মদিনের উৎসবের দিন ধার্য করা হয়েছে। সবাই হেসে হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। মিঠুন ঠিক বুঝতে পারল না। দাদাজী সেটা বুঝতে পেরে, মিঠুনকে বলল—তোমারা বার্থ ডে পার্টি হোগা।

মিঠুন তাই শুনে বলল—হামারা বার্থ ডে পার্টিমে পাপাজী এইসা বড়া কেক লেয়াতাথা। টয়স লেয়াতাথা। হামারা পাপাজি মামিজি আয়গা? দাদাজী? এই বলে দাদাজীর দিকে মিঠুন করুন দৃষ্টিতে তাকাল।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, দাদাজী বললেন—তোমারা রাজা দাদাজী আয়গা—তোমার দিদুস আয়গা। তোমারা লিয়ে এইসা ববড়া টয় গান, আউ বহুৎ বড়া একঠো সের লেয়ায়গা।

দাদাজীর এই কথা শুনে মিঠুন ওর পাপাজী মামিজীর কথা ভুলে গিয়ে বলল—হামারা দাদাজী—বহুৎ গুড হ্যায়।

দাদাজী ওই প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে টিঙ্কুকে আলু পরটা

অমলেট দিয়ে—খাইয়ে দিতে লাগলেন। দাদাজী মিঠুনের মনের অবস্থা বুঝে একটা ক্যাডবারি চকলেট এনে মিঠুনের হাতে দিলেন। মিঠুন চকলেট পেয়ে সব ভুলে মহা আনন্দে, দাদাজীর হাত থেকে খাবার খেতে লাগল।

*　　　　*　　　　*

দেখতে দেখতে এসে গেল ফেবরুয়ারী মাসের বিশ তারিখ। বিপিন ভাইয়ের হোমেতে এই প্রথম দিন মিঠুনের জন্মদিন পালন করা হতে যাচ্ছে।

সুষমা দেবী ও বিপিন ভাইয়ের সন্তান হয়েও আজ তারা সন্তান হারা। তাই এই সব অন্য মেয়েদেরকে লালন-পালন করে মানুষ করতে ভালই লাগছে। মিঠুনকে তো একেবারে নিজেদের মেয়ের মতই স্নেহে, আদরে মানুষ করছেন। নিজেদের তো এত টাকা নেই, ভার্মা সাহেবের টাকায় তার এই হোম চলছে। মিঠুনের দু'-একটা কথায়—সুষমাদেবী ও বিপিন ভাই বুঝে নিয়েছিলেন—মিঠুন খুব বড় ঘরের মেয়ে। বাবা, মায়ের খুব আদরের ধন ছিল। প্রতি বছর ওর বাবা মা খুব ভাল করে ওর জন্মদিন পালন করতেন। যার জন্যে এত আদর যত্নে থাকা সত্বেও। সে সব কথা মিঠুন ভুলতে পারে নি। কিন্তু বিপিন ভাই সুষমা দেবী সব বুঝেও কিছু করার উপায় নেই। তারা এখন ভার্মা সাহেবের হাতের মুঠোতে। ভার্মা সাহেবের নির্দেশেই তাদের চলতে হয়। তাদের এই বয়সে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়—নিজেদের স্বাধীন ভাবে কোন কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও কোন উপায় নেই। তবে এই ভেবে তাঁরা শান্তি পান যে তাঁরা সব মেয়েদেরকে শিক্ষা-দিক্ষা দিয়ে ভালভাবে মানুষ করছেন।

মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব, মিঠুনের ভাবি ট্রেনাররাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তারাও আসবেন। তাদের সাথে বিপিন ভাই মিঠুনের পরিচয় করিয়ে দেবেন। এবং মিস্টার ভার্মাও তাদেরকে দেখবেন।

আজ ফেবরুয়ারি মাসের বিশ তারিখ। সকাল থেকেই বিপিন ভাইর হোমে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে? মিঠুনের জন্মদিন উপলক্ষে তোড়জোড় লেগে গিয়েছে, আজ মিঠুনের জন্মদিন বিপুল সমারোহের সঙ্গে পালন করা হবে। এক সপ্তাহ আগে সারা বাড়িতে নতুন করে কলি ফেরান হয়েছে। কয়েকদিন আগে দর্জি এসে মিঠুনের গায়ের মাপ নিয়ে গিয়েছিল। নতুন, নতুন ডিজাইনের ড্রেস বানাবার জন্য। আজ দর্জি এসে সেই সব ড্রেসগুলি দিয়ে গেল। এই সব নতুন পোষাকগুলি দিয়ে গেল। এই সব নতুন পোষাকগুলি আলাদা একটা টেবিলে সাজিয়ে রাখা হবে। সন্ধ্যে ছটার সময় সমুন্দর কা সুন্দরী হোটেল থেকে, ইয়া বড়া কেক্ আসবে।

আজ সব মেয়েদের ছুটি। আজ আর কারুর লেখাপড়া করতে হবে না। খালি খেলা, খাওয়া আর ঘুম।

বেলা একটার সময় সব মেয়েরা লাঞ্চের টেবিলে চলে এল মিঠুনকে তার আয়া নিয়ে এল। সকালে মিঠুন ব্রেকফাস্ট খায় দাদাজীর সাথে আর দুপুরে লাঞ্চে ও রাত্রে ডিনার খায় দিদাজীর সাথে। বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে, আয়া মিঠুনকে দুধ খাইয়ে অন্য সব মেয়েদের সাথে খেলা করার জন্য খেলার জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে দোলনা রয়েছে, সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে নেমে যায় —সেরকম খেলার বন্দবস্ত আছে। মিঠুন তো এসব খেলতে পারে না। আরও দু তিন বছর না গেলে এসব একা একা খেলতে পারবে না। অন্য সব মেয়েরা যারা ওর থেকে বড়, তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে হুস্ করে নেমে আসে। তাই দেখে মিঠুনের খুব মজা লাগে আর হাসে ও নেচে নেচে হাততালি দেয়। তবে রোজ একবার করে আয়ার কোলে বসে দোলনা খায়। তাতেই মিঠুনের খুব আনন্দ।

সেদিন লাঞ্চের টেবিলে দিদাজির পাশে বসে মিঠুন দেখতে পেল —আজ খালি চিকেনের ঠ্যাঙ নয়, আরও অনেক রকম খাবার।

দিদাজি মিঠুনকে আদর করে বললেন—আজ তো তোমার বার্থ-ডে। ইসকালিয়ে বহুৎ খানা পাকায়া।

মিঠুন বলল—দিদাজি, কেক্ কাঁহা? হামারা টয়স কীধার?

দিদাজি পোলাউর সাথে মাংস মেখে মিঠুনের মুখে দিয়ে বললেন—আজ রাতমে দেখেগা কেতনা বড়া কেক্ আয়া। কেতনা তোমারা লিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা টয়েস আয়া। কেতনা সুন্দর সুন্দর তোমারা লিয়ে ড্রেস আয়া।

মিঠুন এইসব কথা শুনে দিদাজির কাছে বসে চুপ করে খেতে লাগল। ওর দিদাজি খুব অদেরের সাথে খাইয়ে দিতে লাগলেন।

মিঠুনের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেলে, আয়া তাকে নিয়ে হাত-মুখ ধুইয়ে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল। মিঠুন না ঘুমনো পর্যন্ত আয়া ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অল্প একটু সময়ের মধ্যে মিঠুন ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেল চারটের সময়—মিঠুন ঘুম থেকে উঠে ওর বিছানায় বসল। আয়া জানে মিঠুন এই সময় ঘুম থেকে ওঠে। তাই আয়া মিঠুনের কামরায় এসে দেখল, মিঠুন ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছে। মিঠুনকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে, হাত-মুখ ধুইয়ে—ভাল পোষাক পরিয়ে, কোলে করে—আয়া কিচেনে গেল মিঠুনের দুধ আনার জন্য। তখন ওই কিচেনে বসে সহকারী কুক কৈ মাছ কাটছিল। মিঠুন দেখল মাছগুলো, খুব লাফাচ্ছিল ও কান দিয়ে হেটে চলে যাচ্ছিল, সেই কুক যে মাছগুলো চলে যাচ্ছিল, সেগুলোকে ধরে এনে কাটছিল। মিঠুন আয়ার কোলে বসে তাই দেখে, তাড়াতাড়ি আয়ার কোল থেকে নেমে মাছগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে লাগল আর বলল—দেখা! ফিস চল্‌তা হ্যায়—। হাম এই চলতা হায় ফিস খায়গা।

আয়া বলল—কৈ মাছের মালাইকারি হবে, তাই রাত্রে খাবে। এখন চল, দুধ খেয়ে খেলার মাঠে যাই। এই বলে আয়া মিঠুনকে

কোলে তুলে নিল ও এক গ্লাস দুধ নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল।

আয়ার কোলে উঠেই মিঠুনের মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। আর মনে পড়ে গেল—ওই ছবি—তার আংকেল নিউ মারকেট নিয়ে গিয়ে—এরকম অনেক মাছ দেখিয়েছিল। তারপর খেলার মাঠে এসে অন্য সব মেয়েদেরকে খেলতে দেখে, সেই আংকেলের কথা ভুলে গেল। মিঠুনও আয়ার কোল থেকে নেমে তাদের সাথে খেলায় মেতে গেল।

ওই খেলার মাঠেও একজন খেলার ট্রেনার থাকে। তাকে সবাই রুবি দিদাভাই ডাকে। সে দিন বিকেল পাঁচটায় রুবি দিদাভাই সব মেয়েদের খেলা বন্ধ করে দিয়ে বললেন—আজ এখন খেলা বন্ধ করে, তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে ভাল পোষাক পরে, এ সন্ধ্যা সাতটার সময় হল ঘরে চলে আসবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান। আজ মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব পালন করা হবে। মিঠুনের রাজা দাদাজিও আসবেন। এই কথা শুনে সব মেয়েরা হৈ-হৈ করতে করতে যে যার ঘরের দিকে চলে গেল। মিঠুনের আয়াও মিঠুনকে কোলে করে ওর ঘরে চলে গেল। আর একটু পরে মিঠুনের দিদাজি মিঠুনের ঘরে এসে আয়াকে বললেন—দেখ, আজ মিঠুনকে খুব ভাল করে সাজাও—ওর রাজা দাদাজি ও দিদুন মিঠুনকে দেখে যেন খুব খুশী হন। আমার অনেক কাজ আছে। আমি আর মিঠুনকে সাজান দেখতে পারছি না। এই বলে মিঠুনের দিদাজি ওঘর থেকে চলে গেলেন।

বিপিন ভাই ও সুষমা দেবী হল ঘরটা সাজানো নিয়ে—আজ সকাল থেকেই ব্যাস্ত আছেন, হল ঘরের সাজান দেখে যাতে মিস্টার ও মিসেস ভারমা খুশী হন। তাই সুষমা দেবীর পরামর্শে একজন ভাল ইনটিরিয়ার ডেকরেটার এনগেজ করা হয়েছিল। এই সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত ইনটিরিয়ার ডেকরেটারের

লোকজন কাজ করে সুন্দর করে হল ঘরটা সাজিয়ে দিয়ে গেল। বিপিন ভাই এবং সুষমা দেবী ওদের সাজান দেখে খুবই খুশী।

এই সাতটা দশে সুমুন্দর কা সুন্দরী হোটেল থেকে ভ্যানে করে স্পেসাল খাবার চলে এল। ওই হোটেল থেকে পরিবেশন করার জন্য দুজন ওয়েটারও এসেছে। ওই হোটেলের লোকজনেরা ভ্যান থেকে সব খাবার তুলে এনে খাবার রাখবার টেবিলে ঢেকে রেখে দিল। আর একটা ইয়া বড় কেক্, যে টেবিলে কেক্ রেখে কাটা হবে, সেই টেবিলে এনে একটা প্লেটের উপর ঢেকে রাখল।

এই সাড়ে সাতটা নাগাদ সব মেয়েরা ভাল ভাল পোষাক পরে হল ঘরে চলে এল। সেই হল ঘরের মাঝখানে অন্যান্য চেয়ার থেকে একটু উঁচু হবে এরকম একটা খুব সুন্দর দেখতে চেয়ার পাতা আছে। সেই চেয়ারের দুপাশে চেয়ার সাজানো আছে। তার সামনে কেক্ কাটার টেবিল। সেই টেবিলে একটা বড় প্লেটে, একটা বড় কেক্ সাজানো আছে। সেই কেকের প্লেটের চারদিকে ঘেরাও করে মোমবাতি জ্বলছে। সেই কেকের টেবিলের ও ধারে, কাছেই দুটো সুসজ্জিত সোফা পাশাপাশি পাতা রয়েছে। একটু দূরে, আরেকটা বড় টেবিলে সব খাবার ঢাকা রয়েছে। সুমধুর আগরবাতির গন্ধে হল ঘর একেবারে তাজা ফুলের গন্ধে ভরে গিয়েছে।

আয়া মিঠুনকে নিয়ে এলে, দিদাজি মিঠুনকে সেই উঁচু চেয়ারে বসিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর অন্যসব মেয়েদেরকে এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদগকে ওই উঁচু চেয়ারের দুপাশে সাজান চেয়ারগুলিতে বসতে বললেন। সবাই সুষমা দেবীর কথা মত সেই উঁচু চেয়ারের দুপাশে সাজানো চেয়ারে বসে পড়ল।

এই যখন আটটা বাজে, তখন বিপিন ভাই এই হোমে ঢুকবার দরজার সামনে চলে গেলেন, তখনই মিস্টার ভারমার মারসিডিস গাড়ি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিপিন ভাই গাড়ির দরজা

খুলে মিস্টার এবং মিসেস ভারমাকে অভ্যর্থনা করে হল ঘরে নিয়ে এলেন।

মিষ্টার এবং মিসেস ভারমা যেই হল ঘরে প্রবেশ করলেন, অমনি মেয়েরা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে সকলে মিলে একটা অভ্যর্থনার গান সুরু করল।

বিপিন ভাই মিষ্টার ও মিসেস ভারমাকে নিয়ে এসে সেই সুসজ্জিত সোফা দুটিতে বসতে বললেন। কিন্তু মিস্টার ও মিসেস ভারমা তখনই সোফায় না বসে, দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের কচি গলার সুমধুর গান শুনতে লাগলেন। গান থেমে গেলে তারা করতালি দিয়ে সেই মেয়েদের গানের প্রশংসা করলেন। তারপর তাঁরা সেই সুসজ্জিত সোফায় বসলেন এবং সব মেয়েরাও তাদের চেয়ারে বসে পড়ল।

মিস্টার ভারমা দেখলেন—একটা একটু উঁচু চেয়ার, দুই সারি চেয়ারের মাঝখানে সেই উঁচু চেয়ারখানা পাতা। তাতে বসে রয়েছে, সেই মেয়েটি যার নাম টিঙ্কু, তাঁর মনে পড়ল, কিন্তু তিনি নিজে নাম রেখেছেন মিঠুন। তিনি নিজের মনে মনে বললেন—সত্যি এই এক বছরের মধ্যে মেয়েটি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে?

মিসেস ভারমাকে মিস্টার ভারমা বললেন—দেখছ? ওই উঁচু চেয়ারে বসা মেয়েটিকে? যার পাশে সুষমা দেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মিসেস ভারমা বললেন—সত্যি মেয়েটি দেখতে অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে।

মিস্টার ভারমা তারপর উঠে গিয়ে মিঠুনকে একটা মুকুট পরিয়ে দিলেন। সব মেয়রা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

মিসেস ভারমা ও মিস্টার ভারমার পিছু পিছু গেলেন দুই বেয়ারাকে সাথে নিয়ে, একজন বেয়ারার হাতে ইয়া বড় একটা টয়গান। আরেকজন বেয়ারার হাতে ইয়া বড় একটা সের (বাঘ)।

মিঠুনের দিদাজি, সুষমা দেবী, মিস্টার ভারমাকে দেখিয়ে

বললেন—এ তোমারা রাজা দাদাজি দেখ, তোমারা লিয়ে কেয়া লেয়ায়া।

মিস্টার ভারমা তখন বেয়ারার হাত থেকে টয়গান নিয়ে মিঠুনের হাতে দিলেন। মিঠুন অতবড় টয়গান পেয়ে মহা আনন্দে চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে বলল—হামারা রাজা দাদাজি—হামারা লিয়ে এতনা বড়া টয়গান লেয়ায়া দেখা? এই বলে সব মেয়েদেরকে দেখাতে লাগল।

'মিঠুনের দিদাজি তারপর মিঠুনকে মিসেস্ ভারমাকে দেখিয়ে বললেন—এ তোমারা দিহুস্। দেখা? তোমারা লিয়ে তোমারা দিহুস্ কেয়া লেয়ায়া? তখন মিসেস্ ভারমা অন্য বেয়ারার হাত থেকে বাঘটাকে নিয়ে, বাঘটার পেট টিপে দিলেন। অমনি সেই বাঘের চোখ দুটো আগুণের মত জ্বল জ্বল করে উঠল এবং মুখ থেকে বাঘের ডাক বেরুল। তাই দেখে এবং বাঘের ডাক শুনে মিঠুন মোটেই ভয় পেল না। বেয়ারা সেই বাঘটাকে মিঠুনের পাশে দাঁড়-করিয়ে দিল।

মিঠুন সেই বাঘ ও টয়গান পেয়ে খুবই খুশী। একবার মিস্টার ভারমাকে দেখ্ছে, আবার মিসেস্ ভারমার দিকে তাকাচ্ছে। তারপর মিসেস্ ভারমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে—মিঠুন বলল—হাম্ দিহুস কা পাছ যায়গা। অমনি মিসেস্ ভারমা মিঠুনকে কোলে তুলে নিয়ে, মিস্টার ভারমাকে নিয়ে তাদের সোফায় ফিরে এলেন।

মিস্টার এবং মিসেস্ ভারমা, দু' জনেই মিঠুনকে আদর করতে লাগলেন।

এইবার কেক কাটার পালা—

সুষমা দেবী মিসেস্ ভারমার কোল থেকে মিঠুনকে নিয়ে এসে সেই কেকের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অন্য সব মেয়েদেরকে ডাকলেন। সব মেয়েরা সুষমা দেবীর কথা মত তাদের

চেয়ার থেকে উঠে এসে টেবিল ঘিরে দাঁড়াল। মিস্টার এবং মিসেস্ ভারমাও ওই টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সব মেয়েরা—হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ—মিঠুন এই বলে গোল হয়ে নাচতে লাগল—তারপর যে মোমবাতিগুলি কেকের চারিদিকে জ্বলছিল মেয়েরা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে লাগল। সবাই আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল। মিস্টার এবং মিসেস্ ভারমাও হাততালি দিলেন।

সুষমা দেবী টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে নিজের হাত মিঠুনের হাতের সাথে ধরে ছুরি দিয়ে কেক্‌টার মাঝখান দিয়ে কাটলেন, তারপর সুষমা দেবী সব কেক্‌টা টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে মিঠুনের হাতে দিয়ে—প্রথম এক টুকরো কেক মিস্টার ভারমার হাতে দিয়ে, মিঠুনকে বোলতে বললেন—হামারা রাজা দাদাজী, হামারা বার্থ-ডে কা কেক খা লিজিয়ে।

মিস্টার ভারমা মিঠুনের হাত থেকে কেক্ টুকরো হাতে নিয়ে মুখ দিয়ে বললেন—হাম্ খা লিয়া।

মিঠুন মিসেস্ ভারমাকেও এক টুকরো কেক্ দিয়ে বলল—দিদুস্, তোমা খা লও। মিসেস্ ভারমাও মিঠুনের হাত থেকে কেক্ টুকরো হাতে নিয়ে মুখে দিলেন।

মিঠুন তারপর অন্য সব মেয়েদেরকে কেক্ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সব মেয়েরা হৈ-চৈ করে কেক্ খেতে লাগল।

মিস্টার এবং মিসেস্ ভারমা তাদের সোফায় এসে বসলেন, তারপর মিস্টার ভারমা বিপিন ভাইকে বললেন—মিঠুনকে তো দেখছি একেবারে ভাবিজীর ভক্ত হয়ে পড়েছে। খুব ভাল—আমি দেখে আপনাদের উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এতটুকু মেয়েকে আপনারা একেবারে নিজেদের মেয়ের মতন লালন-পালন করছেন। আজকে মিঠুনের বার্থডের সব আইটেমগুলো আমার খুব ভাল লেগেছে। হল ঘরটা দেখছি খুবই সুন্দর করে সাজিয়েছেন। এই

বলে মিস্টার ভারমা হল ঘরটার চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

মিস্টার ভারমা বললেন—জানেন বিপিন ভাই, এতদিন সবার কাজ আমার দেখবার ফুরসৎ হত না, এখন দেখছি, অনেকেই এত ভাল কাজ করছে; তাতে মনে হচ্ছে তারা এ্যাবাভ কোয়ালিফিকেসন। তারপর বললেন—এখন তো মিঠুনের চার সাড়ে চার বছর হতে চলল্। এখনি তো ওর সব শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার।

বিপিন ভাই বললেন—আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। যাঁরা মিঠুনকে ট্রেণিং দেবেন, সে সব ট্রেনাররা উপস্থিত আছেন। আপনি যদি তাদের সাথে কথা বলতে চান, তবে তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।

মিস্টার ভারমা বললেন—লেখাপড়া যারা শেখাবেন, তাদের সাথে কথা বলে আর কী হবে। তার থেকে যারা গান ও নাচ শেখাবে, তাদেরকে দু' একটা গান শোনাতে বলুন, আর দু একটা নাচ দেখাতে বলুন।

বিপিন ভাই বললেন—আমি এখনি ট্রেনারদের গান ও নাচ দেখাবার বন্দবস্ত করছি। এই বলে ওখান থেকে চলে গিয়ে দুজন মহিলা অতিথী যারা চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। সেই মহিলাদের সাথে কথা বলে মিস্টার ভারমার কাছে আসার সময় বিপিন ভাই সুষমা দেবীর সাথেও কথা বলে এলেন।

তখন সুষমা দেবী সবাইকে বললেন—এখন তোমাদের বেলাদি গান গেয়ে শোনাবেন এবং সেই গানের তালে তালে নাচবেন রত্না বাই।

বিপিন ভাই মিস্টার ভারমাকে বললে—এই রত্না বাই মিঠুনের নাচের ট্রেনার; ইনি সব চিত্র জগতে নর্ত্তকীদের ট্রেনিং দেন। আর

এই যে বেলাদির চিত্র জগতের ব্যাকগ্রাউণ্ড ভয়েসের গানের জন্য প্রচুর সুনাম আছে।

সুষমা দেবী সব মেয়েদেরকে বললেন তোমরা এখন একটু চুপ্ করে থাক, গান নাচ হয়ে গেলে আবার তোমরা খাবার টেবিলে হৈ-চৈ করে মিঠুনের সাথে বসে খাবে। তোমাদের জন্যে হোটেল থেকে প্রচুর ভাল ভাল খাবার এসেছে।

বেলাদি—হারমনিয়াম নিয়ে গান শুরু করতেই, রত্না দেবী পায়ে ঘুঁঘুঁর বেঁধে নাচ শুরু করলেন।

বিপিন ভাই বললেন—ভার্মা সাহেব। খালি বাজনার তালে তালে নাচা সহজ, কিন্তু গানের সুরের তালে তালে নৃত্য্‌করা কষ্টকর। খুব ভাল নর্তকী ছাড়া গানের সুরের তালে নাচতে পারবে না।

বেলাদির সুরেলা গান আর তার সাথে রত্না বাঈর নৃত্য দেখে, নাচের সাথে সাথে দেহ-ভঙ্গিমা দেখে মিস্টার এবং মিসেস ভারমা বিমহিত হয়ে ওদের গান এবং নাচের খুব তারিফ করলেন এবং বিপিন ভাইকে বললেন—খুব ভাল সিলেকসন করেছেন।

মিস্টার ভারমা বিপিন ভাইকে বললেন—ভাবিজীকে (সুষমা দেবীকে) আমাদের নমস্কার জানাবেন। এবং আপনি আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আরেকটা কথা, বিপিন ভাই আমি ভাল করে বুঝতে পেরেছি, আপনারা প্রাণ দিয়ে ভালবেসে মিঠুনকে মানুষ করছেন। আমি সে দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমার একটা অনুরোধ আমাদেরকে আর মিঠুনের জন্মদিনে অথবা অন্য কোন মেয়েদের কোন ফাংশনে ডাকবেন না। আমরা এইসব মেয়েদের কাছ থেকে এ্যালুফ থাকতে চাই। তা না হলে, এরা যখন বড় হয়ে চলে যাবে, তখন কষ্ট হবে। আজ এখন আমরা যাচ্ছি এই বলে মিস্টার এবং মিসেস ভারমা তাদের গাড়ি করে ওখান থেকে চলে গেলেন।

ভারমা সাহেব তার ওয়াইফকে নিয়ে ওই হলঘর থেকে চলে গেলে, সুষমা দেবী সব মেয়েদেরকে বললেন—এইবার তোমরা

ডাইনিং টেবিলে গিয়ে গোল হয়ে বস। মিঠুনের চেয়ার আলাদা রয়েছে। এই কথা শুনে সব মেয়েরা ডাইনিং টেবিলে গিয়ে গোল হয়ে বসল। সুষমা দেবী মিঠুনকে নিয়ে ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে মিঠুনের জন্য স্পেসাল চেয়ারে বসালেন এবং তার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে—নিজে বসলেন, মিঠুনকে খাইয়ে দেবার জন্য।

মিঠুন সুষমা দেবীকে বলল—দিদাজী, হাম্ একেলা খায়গা। সুষমা দেবী বললেন—হাঁ, তোম্ একেলা খাও।

বেয়ারা প্রথম মিঠুনকে খাবার পরিবেশন করে, তারপর আর সব মেয়েদেরকে খাবার পরিবেশন করতে লাগল।

খাওয়া আরম্ভ করার আগে সুষমা দেবী সব মেয়েদেরকে বললেন—দেখ, তোমরা খাওয়া আরম্ভ করার আগে, আমি যা বলব—তোমরাও সেই কথা বলবে। তারপর যখন বলব—এখন খাওয়া সুরু কর, তখন তোমরা খাওয়া সুরু করবে। এই কথা বলে সুষমা দেবী—বলল—তোমরাও বল—থ্রী চিয়ারস ফর মিঠুন। সব মেয়েরাও সাথে সাথে বলল—থ্রি চিয়ারস ফর মিঠুন। তারপর সুষমা দেবী বললেন—বল লঙ লিভ মিঠুন, সব মেয়েরা তার স্বরে বলল—লঙ লিভ মিঠুন। সব শেষে সুষমা দেবী বললেন—মে গড ব্লেস মিঠুন। সবাই ও ওই কথা বলল। সুষমা দেবী হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাই দেখে সব মেয়েরাও হাততালি দিল। সুষমা দেবী বললেন—এইবার তোমরা খাওয়া সুরু কর, তোমরা যে যত পার খাবে।

মিঠুন তো ওর দিদাজীকে বলেছে ও একলা খাবে, তার মানে ওকে তো ওর দিদাজী রোজ খাইয়ে দেয়। আজ এত খাবার দেখে নিজের হাত দিয়ে খেতে চাইছে। মিঠুন দিদাজীর দিকে তাকাল। দিদাজী মিনঠুকে বললেন—আজ তোম একেলা খাও।

মিঠুন তার দু'হাত দিয়ে খাওয়া সুরু করল, প্রথম প্রথম নিজের হাত দিয়ে খেতে মিঠুনের খুব অসুবিধা হচ্ছিল, তাহলেও অন্য

মেয়েদের মত নিজে খেয়ে আনন্দ পাচ্ছিল। ওর দিদাজী ওকে খেতে সাহায্য করছিলেন।

মিঠুনের খাওয়া হয়ে গেলে আয়া এসে গরম জল দিয়ে মিঠুনের হাত-মুখ ধুয়ে-মুছে দিল।

সব মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেলে, একে একে সব মেয়েরা মিঠুনের সাথে করমর্দন করে যে যার ঘরে ঘুমুতে চলে গেল। মিঠুনকেও ওর আয়া ওর ঘরে নিয়ে পোষাক ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

মিঠুন আয়াকে বলল—হামারা ডুম্নুম কাঁহা? হামারা সের কিধার? আয়া দেখিয়ে দিল, টেবিলের উপর অন্যান্য জিনিষের সাথে টয় গান ও বাঘ রয়েছে। তাই দেখে মিঠুন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল। আয়া ওর গায় মাথায় হাত বুলোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে মিঠুন ঘুমিয়ে পরল।

বিপিন ভাই ও সুষমা দেবী সব ট্রেনার নিয়ে এক টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। সবাই সুষমা দেবীকে বললেন—এবার আপনার পরিচালনায়—এই মিঠুনের জন্মদিনের উৎসব বিপুল সমারোহের সাথে উদযাপিত হয়েছে। ভারমা সাহেব ও তাঁর ওয়াইফ খুবই খুসী হয়ে গিয়েছেন।

সুষমা দেবী মিঠুনের চার ট্রেনারকে বললেন—একজন ইংরাজী শেখাবার ট্রেনার, একজন হিন্দী ও বাংলা শেখানোর ট্রেনার, একজন গান ও একজন নাচ শেখাবার ট্রেনার—এই চারজন ট্রেনারকে বললেন—মিঠুনকে কাল থেকেই অল্প অল্প শেখাবার ক্লাস সুরু করুন। ইংলিস ট্রেনারকে বললেন আপনার তো নার্সারী ট্রেনিং রয়েছে। আপনি ভাল করেই জানেন এই শিশুকে কী শেখানো আরম্ভ করতে হবে। বাংলা ও হিন্দী শেখানোর ট্রেনারদেরকেও তাই বললেন। গান ও নাচের ট্রেনারদেরকে বললেন—আপনারা আপাততঃ সপ্তাহে দুদিন বিকেলে এসে ওকে গান শুনান ও নাচ

দেখান। যাতে করে গান ও নাচের উপর ওর ইনটারেস্ট জন্মে। সবাই সুষমা দেবীর কথায় সায় দিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে একে একে সবাই উঠে পড়লেন এবং নিজেদের বাড়িতে চলে গেলেন।

হোটেলের বেয়ারারা খাবার টেবিল পরিষ্কার করে, বাদ বাকি খাবার—এবং প্লেট, ডিস ও অন্যান্য খাবার সরঞ্জাম ভ্যানে করে হোটেলে নিয়ে চলে গেল।

বিপিন ভাই সুষমা দেবীকে বললেন—এতক্ষণ খুব হৈ-চৈ এর মধ্যে কাটল। এখন একেবারে নিস্তব্ধ হয়েছে। সারাদিন আমাদের খুব খাটুনি গিয়েছে। চল আমরাও বিছানয় শুয়ে বিশ্রাম নেই।

সুষমা দেবী বললেন—আমাদের খাটুনি সার্থক হয়েছে। এতেই আমাদের শান্তি এই বলে বিপিন ভাই ও সুষমা দেবী নিজেদের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সারাদিনের খাটা-খাটুনিতে অচিরেই দুজন ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে মিঠুনের চারজন ট্রেনার এসে মিঠুনের রুটিন ঠিক করে ফেললেন। কে কখন আসবেন—কতক্ষণ থাকবেন, সুষমা দেবী তাদের কাছ থেকে সব শুনে বললেন—প্রথম প্রথম কয়েক মাস তো আমার মিঠুনের সাথে সাথে থাকতে হবে। তা না হলে আপনাদের কাছে যাবেই না। আপনারা মিঠুনের সাথে ভাল ভাবে মিশুন। বন্ধুর মত মিশুন, দরদ দিয়ে মিশুন। ও এখন একেবারে শিশু। যে ওকে দরদ দিয়ে ভালবাসবে, তার কাছেই মিঠুন যাবে এবং তার কথা শুনবে।

সুষমা দেবী বলতে লাগলেন—মিঠুনের রুটিন হল—ঘুম থেকে ভোরে ছটায় উঠে, শুয়ে শুয়ে মিট্ মিট্ করে তাকায়। ওর ঘরে আরেকটা খাটে ওর আয়া থাকে। ওর দুটো আঙ্গুল চোষার অভ্যেস আছে, ঘুম্ থেকে উঠে, মিট মিট্ করে আয়ার দিকে তাকায় আর আঙ্গুল চোষে। আয়া ওর আঙ্গুল চোষার শব্দে ঘুম

থেকে উঠে যায়। তারপর আয়া ওকে নিয়ে বাথরুম করায়, হাত মুখ ধোয়ায়, পোশাক পড়িয়ে এই সাতটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট টেবিলে নিয়ে আসে। সেখানে অন্য মেয়েদের সাথে ব্রেকফাস্ট খেয়ে দাদাজী ও আয়ার সাথে খেলার মাঠে যায়, এই সকাল আটটা নাগাদ মিঠুনের ইংলিশের ট্রেনার মিসেস হল এবং বাংলা ও হিন্দী শেখানোর ট্রেনার মিস সোনাইকে সুষমা দেবী বললেন—আপনারাও এক্ এক্ দিন এক্ এক্ জন সেই সকাল আটটার সময় আসুন। মিঠুনের সাথে খেলার মাঠে খেলার ছলে ভাব জমান। তারপর আসল ট্রেনিং সুরু করবেন। আর গানের ও নাচের ট্রেনারদেরকে বললেন—আপনারা সপ্তাহে দু' দিন সন্ধ্যার পর এসে আপনাদের গান ও নাচ দেখিয়ে—ওর গান ও নাচের প্রতি ইণ্টারেস্ট তৈরি করান। সকলেই সুষমা দেবীর কথা মেনে নিয়ে চলে গেলেন।

এইভাবে মিঠুনের সব বিষয়ে ট্রেনিং চলতে লাগল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, দেখতে দেখতে মিঠুনের বিপিন ভাইর হোমে দশ বছর কেটে গেল। মিঠুনের এই তের, চৌদ্দ বছর বয়সে এত সুন্দর চেহারর গড়ন হয়েছে। তাই দেখে সুষমা দেবী সবাইকে বলতেন আমি এত মেয়ে এই হোমে লালন-পালন করে মানুষ করেছি, ছোট থেকে বড় করেছি, কিন্তু এত সুন্দর কেউ আগে এই হোমে আসেনি।

মিঠুনের গান শুনে, একদিন ওর গানের ট্রেনার বেলাদিকে সুষমা দেবী বললেন—শুনেছেন? মিঠুনের গলার গান? বম্বের লতা ও কলকাতার সন্ধ্যার থেকে অনেক ভাল গাইছে, আমার মনে হচ্ছে।

গানের ট্রেনার বেলাদিকে বললেন গানের সব রকম আর্ট, মিঠুন এর মধ্যে শিখে নিয়েছে। আর দু' চার বছরের মধ্যে ও টপ গায়িকা হয়ে যাবে। আর রত্নাবাই যে রকম নাচ শেখাচ্ছেন, সুষমা দেবী বললেন এরই মধ্যে এত নাচ শিখে নিয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে,

মিঠুন আর দু-এক বছরের মধ্যে নৃত্যে বৈজয়ন্তির সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

বেলাদি সুষমা দেবীকে বললেন—আপনি যদি বলেন তো এখনি মিঠুনকে সিনেমা লাইনে ঢুকিয়ে দিতে পারি।

সুষমা দেবী বললেন—না। কখনই না এসব কথা, সিনেমা লাইনের কথা মিঠুনের মাথায় ঢোকাবেন না।

দেখতে দেখতে মিঠুন তের বছর পেরিয়ে পনর, ষোল বছর পড়ল। মিঠুন প্রাইভেটে জুনিয়ার ক্যামব্রিজ পরীক্ষা দিল। ওর পরীক্ষার সিট পড়েছিল বম্বের সেণ্ট যোসেফ স্কুলে। সুষমা দেবী ও আয়া রোজ গাড়ি করে মিঠুনকে সেণ্ট যোসেফ স্কুলে নিয়ে যেত। পরীক্ষা যতক্ষণ চলত ততক্ষণ সুষমা দেবী ও আয়া বাইরে গাড়িতে বসে থাকতেন। টিফিনের সময় মিঠুন গাড়িতে এসে টিফিন খেত।

মিঠুন লক্ষ করত অন্য সব মেয়েরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে। তারা কে কী রকম লিখেছে তাই নিয়ে অন্য চেনা জানা মেয়েদের সাথে আলোচনা করছে। মিঠুন মনে মনে ভাবত সে তো কোন স্কুলে রেগুলার স্টুডেণ্ট হিসাবে পড়ে নি, যার জন্য তার কোন ক্লাসফ্রেণ্ড নেই। এইসব ভেবে তার মনে দুঃখ হত।

একদিন মিঠুন দাদাজীকে বলেছিল হামকো স্কুলমে কাঁহে নেই পড়ায়া। হামরা কৈ ক্লাসফ্রেণ্ড নেহি হায়। সুষমা দেবী সেই কথার কোন জবাব দিতে পারেন নি।

যেদিন মিঠুনের জুনিয়ার ক্যামব্রিজ পরীক্ষা শেষ হল, সে দিন বাড়ি ফিরে এসে মিঠুন বিপিনভাই ও সুষমা দেবীকে বলল—দাদাজি দিদাজি হামারা এই জুনিয়র ক্যামব্রিজ একজামকা রেজাণ্ট আউট হনে কা বাদ, হাম লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজমে ভর্তী হোগা। হাম সাইনস লেকে ইনটারমিডিয়েট পড়েঙ্গা। হাম আউর প্রাইভেট একজাম নেই দেগা।

দাদাজি ও দিদাজি বললেন—ঠিক হ্যায় মিঠুন। আভি তোম বড়া হো গিয়া। তোমারা দিলমে যো চাহে, ওই করেগা।

বিপিন ভাই ও সুষমা দেবীর মুখ থেকে এই কথা শোনার পর, মিঠুনের মুখের চেহারা আনন্দে ফেটে পড়তে লাগল।

*　　　*　　　*

এই বইয়ের প্রথম পর্ব যারা পড়েছেন তারা জানেন—সুজিত চ্যাটার্জি কে? উদয় চ্যাটার্জি কে? সুজিত চ্যাটার্জি হচ্চে উদয় চ্যাটার্জির ড্যাড। আবার সুজিত চ্যাটার্জি হচ্চে টিঙ্কু ওরফে মিঠুনের ক্রুয়েল আংকেল। যে লোক তার বন্ধু-পত্নী মিলির উপর তার ঘৃণিত লালসা চরিতার্থ করতে না পেরে আক্রোশের বসে, টিঙ্কুকে পার্ক থেকে লুকিয়ে নিয়ে রেললাইনে সন্ধ্যার সময়—ফেলে রেখে আমেরিকাতে চলে যায়।

সুজিত চ্যাটার্জির জীবনের প্রথম ঘটনায় দেখা যায়—তার আমেরিকান স্ত্রী লুসীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর, তার দু বছরের ছেলে উদয় চ্যাটার্জিকে আমেরিকা থেকে নিয়ে এসে ব্যাঙালোরে মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানকার ফাদার সুজিত চ্যাটার্জির কাছ থেকে সব শুনে তার ছেলে উদয় চ্যাটার্জিকে মানুষ করার ভার নিয়েছিলেন। ওই মিশনারি স্কুলের ফাদার উদয়ের ওই মিশনারি স্কুল এবং হোস্টেলের খরচ বাবদ যখনই যা চেয়েছেন সুজিত চ্যাটার্জির কাছ থেকে তখনই তাই পেয়েছেন।

সেই মিশনারি স্কুলের ফাদাররা দুবছরের শিশু উদয়কে আদর যত্ন করে লালন পালন করতে লাগলেন।

উদয় যখন একটু বড় হল। সেই মিশনারি স্কুলের ফাদাররা বুঝতে পারলেন—পই ছেলেটির ভিতর একটা অসাধারণ মেধা রয়েছে। একটা যে কোন কঠিন জিনিষ, অঙ্কই বল আর ফিজিকসই বল চট্ করে সলভ করতে পারে। তখন ফাদাররা উদয়কে জিনিয়াস তৈরী করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে উদয় স্কুল ফাইনালে স্কলার্শিপ পেল। ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাল। এইবার বি-এস-সি পরীক্ষায় ব্যাংলোর ইউনিভার্সিটিতে উদয় চ্যাটার্জি ঈশান স্কলারশিপ পেল।

ব্যাংলোরের ওই মিশনারি স্কুলের ফাদার উদয় চ্যাটার্জির এই কৃতিত্বের জন্য গর্ব বোধ করে উদয়ের পিতা সুজিত চ্যাটার্জিকে তার আমেরিকার ঠিকানায় এই বলে চিঠি লিখলেন—

প্রিয় মিস্টার চ্যাটার্জি—

আপনার সুপুত্র উদয়ের অসাধারণ মেধা এবং তার পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে আমরা গর্বিত। আপনি আমেরিকা সিটিজেন। কিন্তু পুত্রকে ভারতীয় পদ্ধতিতে মানুষ করার নির্দেশে, আমরা ওকে ভারতীয় তৈরি করেছি। সুপুরুষ চেহারা এবং তার অসাধরণ মেধা এই দুই গর্ব করার জিনিষ। আগামি জুন মাসে ব্যাংলোর ইউনিভার্সিটি উদয়কে মহামূল্য পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করবে। এখানকার সবাই উদয় চ্যাটার্জির পিতা সুজিত চ্যাটার্জির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত। তাই আমার একান্ত অনুরোধ —আপনি অবশ্য আগামি জুনমাসে উদয়কে পুরস্কৃত করার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি—

রেভারেণ্ড ফ্রানসিস্

বাংলোর মিশনারি স্কুলের চিফ ফাদার রেভারেণ্ড ফ্রানসিসের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে সুজিত চ্যাটার্জি আমেরিকাতে বসে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। এখন আর তার সেই নব্য যৌবন নেই। তিনি এখন প্রৌঢ়, বৃদ্ধ হতে চলেছেন। এখন খালি অনুশোচনার চিন্তায় মগ্ন। কেন এত ঘৃণিত অপরাধ করলাম। যার জন্যে ইণ্ডিয়াতে

যাবার সব রকম পথ বন্ধ—যার ছেলে উদয় এত ভাল হয়েছে—একথা শুনলে তার বাবার বুক আনন্দে ফুলে উঠবে। কিন্তু আমি? আমার তো ব্যাংলোরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। গেলেই তো আমার অপরাধের জন্য আমাকে পুলিশ ধরবে। আর সাজা ভোগ করতে হবে।

সুজিত চ্যাটার্জি মনে মনে বলল—ফুলের মত শিশু টিঙ্কুকে আমার এই যৌবনের বর্বর লালসার জন্য মেরে ফেলে দিলাম? আমায় মানুষ হয়ে জন্মান উচিত হয় নি। এইসব ভেবে সুজিত চ্যাটার্জি ব্যাংলোর মিশনারি স্কুলের ফাদার রেভারেণ্ড ফ্রানসিসকে লিখলেন—

প্রিয় রেভারেণ্ড ফ্রানসিস

আপনার চিঠিতে উদয়ের মেধার কথা, কৃতিত্বের কথা জানতে পারলাম। আপনারা এই উদয়কে তার দু বছর বয়স থেকে পিতা-মাতার মত আদর স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছেন। আমি তার পিতা হয়ে কোন কর্তব্যই পালন করতে পারিনি।

আমি মনে করি সব কৃতিত্ব আপনাদের। আপনারা প্রাণ দিয়ে ভালবেসে উদয়কে মানুষ করেছেন। উদয়ের কৃতিত্ব তারই লক্ষণ বহন করছে। আমার অনুরোধ জুনমাসের সেই শুভদিনে আপনারা ব্যাংলোর ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত থেকে উদয়কে আরও শিক্ষিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আমার আর ইণ্ডিয়াতে কোন দিন যাওয়ার সুযোগ হবে কি না, তা এখন জানাতে পারলাম না। আমি এদেশের থেকে আমেরিকান সিটিজেন হয়েছি। তার জন্য আগে গর্ব বোধ করতাম। কিন্তু এখন মোটেই গর্ববোধ করছি না। উদয় বাই বার্থ আমেরিকান হয়েও, আপনাদের কাছে থেকে ভারতীয় প্রথায় মানুষ হয়েছে। আপনাদের শিক্ষার গুণে উদয় মনুষ্যত্বের আসল গুণগুলি পেয়েছে যেনে খুব শান্তি পাচ্ছি। আপনারা মানুষের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। উদয়কে

আপনাদের কাছে দু বছর বয়স থেকে এই বাইশ বছরে পড়ল। আপনারা উদয়ের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে উঠতে পারে। সেই দিকটা বিবেচনা করে উদয়ের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করলে মনে শান্তি পাব। তবে সব কিছু আপনার উপর ছেড়ে দিলাম—উদয়ের ভবিষ্যৎ।

নমস্কার—

ভবদীয়—

সুজিত চ্যাটার্জি

সুজিত চ্যাটার্জির কাছ থেকে এই রকম চিঠি পেয়ে ফাদার রেভারেণ্ড ফ্রানসিস মহা সমস্যায় পড়লেন। একদিন উদয়কে ডেকে ফাদার ফ্রানসিস বললেন—আমি জানি, তুমি তোমার নিজের পিতা সুজিত চ্যাটার্জীকে দেখনি। এখন তুমি বড় হয়েছ। তোমার বাবাকে তোমার চেনা উচিৎ, জানা উচিত। তিনি একজন ভারতীয় হয়েও আমেরিকান সিটিজেন। আমেরিকাতেই পারমানেণ্টলি বাস করছেন। জুন মাসের তো এখনও দু মাস দেরী আছে। তুমি আমেরিকাতে গিয়ে তোমার পিতার সাথে দেখা করে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে এস।

উদয় বলল—রেভারেণ্ড ফাদার। আমার শিশু বয়স থেকে আপনার কাছে আছি। আপনিই আমাকে মা, বাবার স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছেন। আমি আপনাকে আমার নিজের ফাদার বলে মনে করি। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, আমি তাই করব।

রেভারেণ্ড ফ্রানসিস বললেন—উদয় তোমার কথায় আমি খুব খুসী হয়েছি। তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে এস।

রেভারেণ্ড ফ্রানসিস্ সুজিত চ্যাটার্জিকে তার ডেটরয়েটের

ঠিকানায় চিঠিতে লিখলেন। আপনার চিঠিতে বুঝতে পারলাম আপনার এখন ভারতে আসার অসুবিধা আছে, কাজেই আমি উদয়কে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি উদয়কে আশীর্বাদ করবেন যেন উদয় ভবিষ্যতে অনেক বড় হতে পারে। যেন আপনার নাম রাখতে পারে।

এক সপ্তাহ পরেই উদয় তার পিতা সুজিত চ্যাটার্জির আমেরিকার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। কলিং বেল টিপতে, সুজিত চ্যাটার্জি দরজা খুলে দেখল একজন সুপুরুষ বাইস তেইশ বয়সের যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, দু-জনই দু-জনকে দেখে অভিভূত। কারোর মুখে কথা নেই। উদয় প্রথম সুজিত চ্যাটার্জিকে জড়িয়ে ধরে বলল—ড্যাডি, তুমি আমার ড্যাডি হয়ে আমাকে এভাবে ভুলে থাকলে কী করে?

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—উদয়, তুই এসেছিস? আয় বাড়ির ভিতরে আয়। তোকে দেখার জন্য আমার মন সব সময় ছটফট করে। রাত্রে ঘুম হয় না। আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। যার জন্য আমার ভারতে যাওয়ার পথ বন্ধ। তা না হলে প্রত্যেক বছর ভারতে গিয়ে তোমাকে দেখে আসতাম।

উদয় বলল—ড্যাড্। তোমার কী এমন দুর্ঘটনা হল? যার জন্য তোমার ভারতে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাকে বল ড্যাড্, আমি তোমার উপযুক্ত ছেলে। আমি নিশ্চয়ই সেই বন্ধ পথ খুলে দিতে পারব।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—সে সব কথা একদিন তোমাকে বলব। তবে এখনো সে সময় হয় নি।

উদয় বলল—ড্যাড্, আমার মাম্-এর ফটো কোথায়? আমি ফাদার ফ্রানসিসের কাছে শুনেছি। আমার মা আমাকে শিশু অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে তার ঘরে নিয়ে লুসির ফটো দেখাল।

সেই ফটো দেখে, উদয় প্রণাম করে বলল—মাই মাম্‌ আমার মামিকে আমি আমার জীবনে দেখতে পেলাম না—এই বলে একটা বড় দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়ল।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—উদয়, এখন তুমি তোমার ঘরে গিয়ে রেষ্ট নাও। তুমি অতদূর থেকে এসেছে, তুমি ক্লান্ত। এই বলে সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে আরেকটা ঘরে গেলেন। সেই ঘর দেখিয়ে তিনি বললেন—এই বাড়ি তৈরী করবার সময় তোমার জন্য এই ঘরটা তৈরী করেছি এবং সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি। তোমার ইণ্ডিয়াতে লেখা পড়া শেষ হলে এখানে এসে আমার কাছে থাকবে। এটাই আমার শেষ ইচ্ছে।

উদয় তার ঘর দেখে খুব খুসীই হল।

উদয় দেখল তার ঘরে ইলেক্‌ট্রিকাল গুডস্‌। মিউজিকাল ইনসট্রুমেণ্ট ভারতীয় এবং বিদেশী সব সাজান রয়েছে। ভারতীয় মিউজিক্যাল ইনসট্রুমেণ্টের মধ্যে দেখল—হারম'নয়াম। এস্রাজ, বায়া তব্‌লা। আর ওয়েস্টার্ণ মিউজিকাল এত যে সব চিনতেই পারল না।

উদয় ভাবল—ড্যাড্‌ নিশ্চয়ই সব রকম মিউজিকে একস্‌পার্ট। উদয় ঠিকই করে ফেলল—ড্যাডের কাছ থেকে মিউজিকের সব কিছু শিখে যাবে। যদি দরকার হয় দু-চার মাস বেশি থেকে যাবে।

একটু বাদে একজন আধা বয়সি লোক উদয়ের ঘরে ঢুকে উদয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—ছোট বাবু আমার নাম নবাব। আমার অল্প বয়স থেকে এই সাহেবের কাছে আছি। সাহেব প্রায় সময়ই বাইরে থাকেন। সাহেবকে রান্না করে খাওয়াই। আর সাহেবের বাড়ি দেখা শোনা করি। সাহেব আপনার কথা আমাকে প্রায়ই বলতেন। আজ আপনাকে দেখলাম। এখন আপনি বাথরুম থেকে স্নান সেরে আসুন। সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি স্নান করে এলেই আপনাদেরকে লাঞ্চে পরিবেশন করব। লাঞ্চের

টেবিলে আপনি সাহেবের সাথে সব কথা বলবেন। আমি এখন যাচ্ছি এই বলে নবাব ও ঘর থেকে চলে গেল।

উদয় ওর প্লেনে আসার পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে বাথরুম গিয়ে স্নান সেরে, পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসল। একটু পরে সুজিত চ্যাটার্জিও এসে বসলেন।

নবাব এসে খাবার প্লেট সাজিয়ে দিতে লাগল। সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—জান, উদয়। এই নবাব আছে বলেই আমি বেঁচে আছি। এ আমাকে ছায়ার মত আগ্‌লে রয়েছে। এর রান্না এত সুস্বাদু, খেলেই বুঝতে পারবে।

নবাব খাবার নিয়ে এসে পরিবেশন করতে লাগল। সে দিনকার মেনু ছিল পোলাউ, ফিস্ কারি ও মাংসের কালিয়া। খেতে খেতে উদয় বলল ড্যাড্, সত্যি নবাবের রান্না করা খাবার খুবই সুস্বাদু হয়েছে

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি খাওয়ার ব্যাপারে কোন রেস্‌ট্রিকসন আছে?

উদয় বলল—আমি তো একদম ছোট বয়স থেকে মিশনারিদের সাথে আছি। ওখানে বিফ্, মটন, চিকেন, পোরক, ফিস সবই খাওয়া হত এবং আমি এই সব খেয়ে অভ্যস্ত। আমার খাদ্যের উপর কোন বাদ বিচার নেই। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ড্যাড্? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

এই কথা শুনে সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—বল উদয়, বল আমি যা জানি সবই তোমাকে বলব।

উদয় বলল—ড্যাড্—আমি আমার ঘরে গিয়ে এত মিউজিকাল ইনস্‌ট্রুমেন্ট দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। তুমি আমার জন্য এসব যোগাড় করে রেখেছ কেন? আমি তো গান-বাজনা কিছুই শিখিনি এবং জানি না।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—উদয়, এক সময় আমি খুব ভাল

গান গাইতাম। ইণ্ডিয়ান সঙ্গীত বল আর ওয়েস্টার্ণ সঙ্গীত বল—এ গান গাওয়া আমার জন্মগত গুণ ছিল। কেউ আমাকে গান শেখায় নি। উদয়—তুমি আমার ছেলে আমার বিশ্বাস তোমার ভিতরেও এই গুণ আছে। তবে এখন সুপ্ত। কোনদিন তুমি চেষ্টা করনি। এখানে কয়েক মাস থাক। তোমাকে আমি শেখাব। তুমি ভাল গায়ক হয়ে ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাবে। তখন সবাই তোমার গান শুনে অবাক হয়ে যাবে।

উদয় বলল—ড্যাড্, আমারও গান-বাজনা শেখার খুব ইচ্ছে আছে। কিন্তু ওখানে মিশনারিদের পরিবেশে গান বাজনা শেখার কোন উপায় নেই। তবে এখান থেকে যদি আমি গান শিখে যেতে পারি, তবে ওখানে আমার ঘরে বসে রেওয়াজ করতে পারব। কেউ কিছু মনে করবে না।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—তোমার যখন এত ইচ্ছে, আজই সন্ধ্যা থেকে তোমাকে গান শেখাতে আরম্ভ করব।

ওদের খাওয়া শেষ হলো। যে যার ঘরে চলে গেল।

উদয় যখন আমেরিকাতে গিয়েছে তখন এপ্রিল মাসের শেষ। ওই দেশে সামার সুরু হয়ে গিয়েছে। সামার মানে ওদেশের লোকেদের এনজয় করবার সিজন্। বিকেলে উদয় পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে ওর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। উদয় দেখল দলে দলে ছেলেরা ও মেয়েরা যাচ্ছে—যে সব পোষাক পরে ও ছেলের দল ও মেয়েদের দল যাচ্ছিল—উদয় তাদের দিকে তাকাতে পারছিল না। মেয়েদের পোষাকে নিচের এবং উপরের যায়গা কোন রকমে ঢাকা। আর ছেলেরা একেবারে খালি গায়ে, মিনি হট্ প্যাণ্ট পরা। আর ওই ছেলেদের দল ও মেয়েদের দল উদয়ের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে চেঁচিয়ে চেচিয়ে বলছিল হায়ই—

উদয়ের এই সব দেখে খুব আশ্চর্য লাগল আর ঠিক করল—আমি ড্যাড্‌কে জিজ্ঞেস্ করব, আমাকে এখানকার এই ছেলে এবং

মেয়েদের দল ওই রকম উদ্ভট পোষাক পরে কেন হায়ই, হায়ই বলে যাচ্ছিল। আমি তো ওদের দিকে ফিরেও তাকাই নি। আমাদের ইণ্ডিয়াতে তো এই রকম কোন দিন দেখিনি আর শুনিও নি।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ নবাব এসে উদয়কে চা দিয়ে গেল। আর বলল সাহেব বলেছেন এই ছটার সময় সাহেব এই ঘরে গান শেখাতে আসবেন।

উদয় বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে গান শেখার জন্ত রেডি হয়ে গেল। ঠিক ছটা বাজতে সুজিত চ্যাটার্জি উদয়ের ঘরে এসে ঢুকলেন। উদয় তার ড্যাড্‌কে দেখে উঠে দাঁড়াল। সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—বস উদয় নিচে কার্পেটের উপর বস। নিচে বসে গান শেখাতেও সুবিধে, গান শিখতেও সুবিধে।

ওরা দুজনে কার্পেটের উপর বসে, সুজিত চ্যাটার্জি প্রথম হারমনিয়াম নিয়ে বাংলা গান শুরু করলেন। গান শুনে উদয় বলল—ড্যাড্‌ তোমার গান এবং গানের সুর একেবারে মাম্মাদের মত।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—তোমার যখন গান শেখার এত আগ্রহ, তখন তুমি চেষ্টা করলে মাম্মাদের মত গাইতে পারবে।

এইবার সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বললেন—আমি গাইব আর আমার সাথে সাথে তুমিও গেয়ে যাও। লজ্জা, ভয় একেবারে ত্যাগ কর। এখানে আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

উদয় বলল—তোমার সাথে সাথে আমিও গাইব। তোমাকে আমার গানের গুরু পেয়েছি। আমার কী ভাগ্য। এই বলে উদয় ওর ড্যাডের সাথে গান গাওয়া সুরু করল।

সুজিত চ্যাটার্জি মাঝখানে তার গান থামিয়ে উদয়কে বলেন—এই লাইনটা আবার গাও। আবার বলেন—আবার গাও। তবে তো তোমার একা একা গান গাওয়ার শক্তি আসবে।

একদিনে উদয় একটা গান শিখে ফেলল।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—উদয়, একদিনেই তুমি একটা গান

শিখে ফেললে। সত্যি তোমার অদ্ভুত মেধা। তুমি তিনচার মাসের মধ্যে পাকা গায়ক হয়ে যাবে। আমি তোমার এই একদিনে এত গান সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে দেখে খুব খুসী হয়েছি। আজ আর থাক —এই বলে সুজিত চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন। তখন উদয়ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল ড্যাড্, এখানকার ছেলে মেয়েরা কি অসভ্য। কী রকম অসভ্যের মত পোষাক পরে এখান দিয়ে যাচ্ছিল, আর আমাকে বারান্দায় দেখে, আমার দিকে তাকিয়ে—হায়ই, হায়ই বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল।

এই কথা শুনে সুজিত চ্যাটার্জি হেসে বললেন—আমিও যখন এ দেশে প্রথম এসেছিলাম। আমারও তখন—এ সব দেখে খুব খারাপ লাগত। জান, উদয় এখন আমেরিকাতে সামার। এই সময় আমেরিকাতে সব থেকে ভাল সময়। এই সময় এখানকার সব ছেলে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরয়। সুইমিং পুলে যায়। ট্যান হতে সি বিচে যায় এই রকম পোষাকে। আর তোমাকে দেখে যে হায়ই বলেছে, এদের এই কথা বলা অভ্যেস। লোক দেখলেও বলে হায়ই, না দেখলেও বলে হায়ই।

উদয় বলল—আমি ভাবলাম, আমাকে ইণ্ডিয়ান মনে করে—আমার এই পাজামা পাঞ্জাবী পোষাক দেখে হায়ই বলে ঠাট্টা, তামাসা করেছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বলল—আরে না, না—ওদের ওই সব কথা। আর ওদের ওই সব সাজ পোষাক দেখে কিছু মনে কর না। এসব এদেশের রেওয়াজ। তুমি আজ বিশ্রাম কর। টেলিভিসন দেখ। এখানে দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একঘণ্টা টেলিভিসন বন্ধ থাকে। তুমি তোমার ঘরে শুয়ে বসে টেলিভিসন দেখ। কাল থেকে প্রোগ্রাম তৈরী করে তোমাকে নিয়ে বেরুব।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে সুজিত চ্যাটার্জির সাথে উদয়ের কথা হচ্ছিল। দুজনের কথা আর ফুরোয় না। উদয়

ব্যাঙালোরের কথা, মিশিনারি ফাদারদের কথা, তার স্কুল, কলেজের ফ্রেণ্ডদের কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বলতে লাগল ড্যাড্ তুমি কবে আমাকে মিশনারিদের কাছে রেখে চলে এলে এই আমেরিকাতে—তারপর আর আমাকে দেখতে গেলে না। ওখানকার ফাদাররা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে কত রকম কথা জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু আমি তো তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সে সব তাদের কথার জবাব, আমি কী করে দেব? আমি যখন বড় হয়েছি, তখন আমার সম বয়সের বন্ধুরা বলত—আমেরিকাতে গিয়ে দেখবি, তোর ড্যাড্ এমন এক তোর স্টেপ মাদার পেয়েছে, যার জন্য তোকে একেবারে ভুলে রয়েছে। আমিও এখানে এসে আমার স্টেপ মাদারকে দেখব, আর ছোট ভাই বোনও দেখতে পাব। কিন্তু এখানে এসে তোমাকে এভাবে থাকতে দেখে নিরাশ হয়েছি। তুমি এভাবে কী করে, একা একা থাক? আমার মা ডির্ভোস করে চলে যাবার পর, তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ড্যাড্?

সুজিত চ্যাটার্জি সব শুনে বললেন—উদয়, আমি এখনি তোমার এসব কথার জবাব দিতে পারব না। এমন একদিন আসবে, যেদিন সব কথা তোমাকে অকপটে বলে যাব। তুমি এখন আর এসব বিষয় নিয়ে ভেব না। এসব ভেবে মন খারাপ কর না। এই টুকু খালি জেনে রেখ—তোমাকে দেখতে যেতে সব সময় আমার প্রাণ চাইত। কিন্তু ওদেশে ইণ্ডিয়াতে যাবার কোন উপায় ছিল না। আমি জানতাম তুমি সাইনস্সে গ্রাজুয়েট হয়ে নিশ্চয়ই আমার সাথে দেখা করতে আসবে। তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছ তাতে আমি খুব খুসী হয়েছি।

সুজিত চ্যাটার্জি তারপর উদয়কে বললেন—আচ্ছা। এরপর তুমি কোন সাবজেক্ট নিয়ে হায়ার স্টাডি করতে চাও।

উদয় বলল—ড্যাড, আমার মিশনারিদের সাথে ছোট বয়স থেকে

ওদের সাথে থেকে, আমার বেশি টাকা রোজগারের দিকে সেরকম আগ্রহ নেই। আমি ভেবেছি জেনারেল এডুকেসন লাইনে হায়ার স্টাডি করব। তাতে আমি এডুকেসন লাইনে কাজ করার সুযোগ পাব এবং ছেলে মেয়েদেরকে ভাল ভাবে শিক্ষা দিতে পারব।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—মাই সন্, তোমার কথায় খুবই আনন্দ পেলাম। সত্যি তুমি মনুষ্যত্বের আসল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ। তোমার জীবন সার্থক হবে। তবে উদয়, তোমাকে আমি একটা সাজেসন দিতে পারি। তুমি আমার কথা শুনে চিন্তা করে দেখতে পার। তোমার ফাদারদের সাথেও আলোচনা করে দেখতে পার। তারপর যে বিষয় নিয়ে পড়লে তোমার আরও মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে, সেই বিষয় নিয়ে হায়ার স্টাডি করবে।

উদয় বলল—বল ড্যাড, তুমি আমাকে গাইড কর। তোমার কথা মতই আমি হায়ার স্টাডি করব।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—উদয়, আমার ডাক্তারি পড়বার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি ডাক্তারি পড়বার সুযোগ পাইনি। আমার ইচ্ছে তুমি খুব বড় ডাক্তার হও। বড় ডাক্তার হলে গরীব, রোগক্লিস্ট মানুষদের চিকিৎসা করে ওদের বাঁচাতে পারবে। আবার টাকা রোজগারের ইচ্ছে থাকলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। এই আমেরিকাতে আমি দেখেছি—, ইণ্ডিয়া থেকে সে সব ইণ্ডিয়ান, ডাক্তারি পাশ করে এসেছেন। তাদের কী কদর, তাঁরা কত ভালভাবে আছেন। আমি একদিন এখানকার ইণ্ডিয়ান ডাক্তারদের পার্টিতে নিয়ে যাব—দেখবে তাদের বাড়ি, কীভাবে সাজানো আছে। তারপর যদি তোমার মন চায়, তাহলে এখান থেকে ডাক্তারিতে হায়ার ডিগ্রি নিয়ে ইণ্ডিয়াতে গিয়ে আর্তের সেবা করতে পারবে। কাজেই তোমাকে আমি সাজেসন দিচ্ছি—তুমি ইণ্ডিয়াতে গিয়ে, কলকাতার কোন ভাল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যাও। সেখান থেকে এম, বি, ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকাতে চলে

এস। এখানে থেকেও তু, একটা হায়ার ডিগ্রি নিয়ে, তারপর তুমি ঠিক করবে। এখানেই সেটলড হবে না ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাবে।

উদয় বলল—তোমার সাজেশন খুবই ভাল। ডাক্তার হতে পারলে মানুষের সেবা করবার সুযোগ পাব। ড্যাড্, তোমার কথা ইণ্ডিয়াতে ফিরে গিয়ে ফাদার ফ্রানসিসকে বলব। তিনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। এর মধ্যে ফাদার ফ্রানসিসকে চিঠি লিখব যেন কলকাতায় কোন ভাল মেডিকেল কলেজে আমার ভর্ত্তির ব্যবস্থা করে রাখেন।

সুজিত চ্যাটার্জি ও উদয় এই দুজনে কখন যে সময় পেরিয়ে একটা বেজে গিয়েছে—তাই ওরা টের পায় নি। নবার ওদের ঘরে ঢুকে ওদেরকে বলল—সাব্। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। এখন তো একটা বেজেছে। লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছে। এখনও আপনারা বসে গল্প করছেন। নবাবের কথায় দুজনের হুস হল। উদয় বলল সত্যি ড্যাড্ আমার ও খেয়াল হয়নি, এত বেলা হয়ে গেল। তুমি যাও স্নান করে এস। আমিও স্নান করে আসছি। তারপর আবার লাঞ্চের টেবিলে গল্প করা যাবে। এই বলে দুজনে ও ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের নিজেদের ঘরে চলে গেল।

একটু পরে—ওরা দুজনেই স্নান সেরে পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে লাঞ্চের টেবিলে এসে বসল। দুজনের মন খুব প্রফুল্ল।

উদয় বসেই বলল—ড্যাড্, আমি ফাদার ফ্রানসিসের কাছে শুনেছি—ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, ভারতবর্ষ ধর্মক্ষেত্র। প্রাচীন ধর্ম পুস্তক থেকে জানা যায় একদা ভারতবর্ষ দেবগণের বাসস্থান ছিল। যেমন বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি ছিল। রাম, লক্ষ্মণ সীতার প্রাসাদ ছিল অযোধ্যায়। শ্রীচৈতন্যদেব জন্মেছিলেন নদীয়াতে। স্বয়ং মহাদেব থাকতেন হিমালয়ের গুহায়। এই তো সে দিনের কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেলুড়ে মা কালীর দেখা পেয়েছিলেন। তুমি ড্যাড পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ছেড়ে এই দেশে পড়ে আছ টাকার মোহে?

সুজিত চ্যাটার্জি আর উদয় চ্যাটার্জি ছেলে আর ড্যাড্ এরই মধ্যে খুব ফ্রি হয়ে গিয়েছে। কারোর কোন কথা বলতে আর বাধা ঠেকছে না। যার মনে যা আসছে তাই বলছে।

তখনই নবাব খাবার নিয়ে এল। নবাবকে দেখে উদয় বলল—আজ তোমার কি মেনু হয়েছে? আমি কিন্তু ড্যাডের মত নয়। আমি খুব খেতে পারি। যে কদিন আমি এখানে আছি খুব ভাল ভাল মেনু করে খাওয়াবে।

নবাব বলল—ছোট সাহেব, আপনি মেনু করে দেবেন। তাই রান্না করে খাওয়াব। আজ হয়েছে মটন বিরিয়ানি, চিকেন লেগ মসালা আর ফিস কাবাব এতে হবে তো? এই বলে নবাব পরিবেশন করতে লাগল। ফিস কাবাব. চিকেন লেগ মাসালা আর মটন বিরিয়ানি এই তিনটে আইটেমি উদয়ের খুব সুস্বাদু লাগল। উদয় খেতে খেতে বলল ড্যাড্ তুমি তো বেশি খাচ্ছনা এত ভাল রান্না হয়েছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বলল—আমার তোর থেকে একটু বেশি বয়স থেকেই এই নবাবের রান্না খাচ্ছি। এর রান্নার একটা স্পেসালিটি আছে যে কোন সময় এক ঘেয়ে লাগে না। রোজই রান্নায় একটা কিছু তফাৎ, থাকবেই। জানি ড্যাড্ উদয় বলল—আমার ওই মিশনারিদের সাথে থেকে থেকে খালি মটন, বিফ আর পোরক খেয়ে—একদম অরুচি ধরে গিয়েছে। আমাদের বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে শুনেছি অল্প মসলা দিয়ে মাছের ঝোল ভাত খুব উপাদেয়।

সুজিত চ্যাটর্জি বলল—তুমি, ঠিকই শুনেছ আমাদের দেশের মাছ এখানে পাবে না। এবার যখন তুমি কলকাতায় গিয়ে মেডিকেল কলেজে পড়বে, তখন তো তোমাকে মেডিকেল স্টুডেণ্ট হস্টেলে থাকতে হবে। তখন তুমি ওই হস্টেলে তুমি যা বললে, সেই রকম মাছের ঝোল ভাত খেতে পাবে।

এই কথা শুনে উদয়ের মনে খুব আনন্দ হল। আর মনে মনে

ভাবল আমি বাঙ্গালী হয়ে এতদিন বঙ্গদেশে থাকবার :সুযোগ পাইনি। এবার গিয়ে খাস কলকাতায় থাকব এবং বাঙ্গালীদের সব রকম চাল-চলন শিখব।

উদয় এই সব ভেবে বলল—ড্যাড, খুব ভাল হবে। তোমার সাজেসনই ঠিক। আমি ইণ্ডিয়াতে গিয়েই কলকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যাব। কালই আমি ফাদার ফ্রানসিস্‌কে লিখব। আমার পরীক্ষার ভাল রেজাণ্টের জন্ম, আশা করি ফাদারের আমাকে মেডিকেলে ভর্ত্তি করতে কোন অসুবিধা হবে না।

উদয়ের কথা শুনে সুজিত চ্যাটার্জি মনে মনে আশ্বস্ত হল এবং মনে মনে বলল ছেলে তো একদম সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় থেকে, ওখানকার ছেলেদের সাথে মিশে যদি আবার অন্য রকম হয়।

খাওয়া হয়ে গেলে দু'জনেই উঠে পড়ল। সুজিত চ্যাটার্জি বলল—উদয়, এখন যাও। একটু শুয়ে বিশ্রাম কর। বিকেল ছটায় আমি তোমার ঘরে যাব। তখন তোমার গান শেখার সময়।

উদয় বলল—ও, কে ড্যাড্ তুমিও গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। এই বলে ওরা দুজন দুজনের ঘরে চলে গেল।

ঠিক বিকেল সারে পাঁচটার সময় নবাব এসে উদয়কে চা দিয়ে বলল—ছোট সাহেব, তুমি চা খেয়ে রেডি হয়ে নাও। বড় সাহেব ঠিক ছটার সময় তোমার ঘরে আসবেন। এই বলে নবাব চলে গেল।

ঠিক ছটার সময় সুজিত চ্যাটার্জি উদয়ের ঘরে ঢুকে দেখলেন—উদয় কার্পেটের উপর হারমনিয়ম নিয়ে বসে গত কালের গানটা বাজাচ্ছে আর গুণ গুণ করে গাইছে। সুজিত চ্যাটার্জি বললেন জোরে গাও উদয়। তুমি তো দেখছি একদিনে অনেক শিখে নিয়েছ। এই তো চাই। এত দেখছি একদম গড্ গিফ্‌টেড্ টিউন। সকালে ও তোমার কাজ নেই, বিকেলেও তোমার কাজ নেই। রোজ

সকালে এবং বিকেলে গানের চর্চা করলে দেখবে, এক মাসের মধ্যে অনেক শিখে ফেলবে।

উদয় বলল—আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি যেভাবে আমাকে গান শেখাচ্ছ, তাতে আমার মনে হচ্ছে আমি এক মাসের মধ্যে ভাল গান গাইতে শিখে যাব। আর আমি যখন ব্যাংলোরে ফিরে গিয়ে গান গাইব তখন সবাই আমার গান শুনে ভাববে, কী হল? উদয় আমেরিকা থেকে গায়ক হয়ে ফিরে এল?

উদয় একাগ্রচিত্তে তিন মাস ধরে গান শিখে নিজেই বুঝতে পারল যে সে এখন যে কোন পাবলিক ফাংশনে টপ্ আর্টিস্টদের সাথে বসে গাইতে পারবে, একটুকুও নার্ভাস হবে না।

তাই একদিন লাঞ্চ খেতে খেতে উদয় বলল—ড্যাড্, আমার মনে হচ্ছে আমি গান গাওয়া খুব ভাল করে শিখে গিয়েছি। আমি নিজেই বুজছি আধুনিক, ভজন, ঠুংরি, রবিন্দ্র সঙ্গিত সব গানই ভাল গাইতে পারি। তুমি তো সবই শিখিয়ে দিয়েছ কি বাংলায়, কি হিন্দিতে। এখানে তো অনেক দিন থাকলাম প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। ফাদার ফ্রানসিস্ আমাকে লিখেছেন আমি যেন তাড়াতাড়ি ফিরে যাই। আমাকে কলকাতার সব থেকে ভাল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন। কোন অসুবিধে হয় নি। আগামি মাস থেকে সেসন্ সুরু হবে। তাই ড্যাড্, তুমি অনুমতি দিলে আর এক সপ্তাহ বাদেই ব্যাংলোরে রওনা হয়ে যাতে চাই। তুমি কী বল, ড্যাড্?

উদয়ের এই কথা শুনে, সুজিত চ্যাটার্জির আনন্দে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে দুঃখের ছায়া নেমে এল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—উদয়, তোমাকে তো উচ্চ শিক্ষার জন্য ইণ্ডিয়াতে ফিরে যেতেই হবে। তোমাকে আর না বলি কী করে। আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্য বলতে পারব না—উদয় তুমি এখানেই থেকে যাও। এদেশেই তোমার হায়ার এডুকেসনের সব বন্দবস্ত করে দিচ্ছি। তুমি

তুমি সাত দিন বাদেই চলে যেও। আমি কালই তোমার এয়ার প্যাসেঞ্জের টিকিট কেটে রাখব। হ্যাঁ, আরেকটা কথা উদয়—তুমি তো এদেশে এসে, এদেশের কোন দর্শনীয় স্থান দেখলে না। এই সাত দিনের মধ্যে কিছু কিছু দর্শনীয় স্থান দেখে যাও। তুমি কোন যায়গায় যেতে চাও বল।

উদয় বলল—আমি রেভারেণ্ড ফাদাদের কাছে শুনেছি এই দেশের চিকাগো শহরে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন। এই চিকাগো শহরে পৃথিবীর ধর্মীয় সম্মেলনে, তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার সেই বক্তৃতা শুনে সব আমেরিকান বাসিরা শ্রদ্ধায় তাঁর কাছে মাথা নত করেছিলেন। এবং অনেকে তাঁর শিশ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমার সেই চিকাগো শহর দেখার ইচ্ছা আছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—তোমাকে আরেকটা জিনিষ দেখাতে নিয়ে যাব। সেটা হচ্চে এ্যাটলান্টিক ওসেনের মধ্যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি। বেশ বড় মটর লাঞ্চ করে সেখানে যেতে হয়। সেই বিরাট স্ট্যাচুর ভেতর অনেকগুলি ফ্লোর আছে। কাল আমরা চিকাগো যাব! সেখানে হোটেলে দু-তিন দিন থেকে, চিকাগা শহরের সব কিছু দেখব। তারপর যাব নিউইওর্ক শহরে। সেখানে দিন দুই থেকে আমরা আবার আমাদের বাড়িতে ফিরে আসব। বাড়িতে দু দিন থেকে অন্ দ্যা থার্ড ডে তুমি ডেটরয়েট এয়ারপোট থেকে ইণ্ডিয়াতে চলে যাবে।

উদয় ওর ড্যাডের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, ড্যাডের অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়ন। আর ড্যাড অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন।

ওদের দুজনের লাঞ্চ খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। উদয় ড্যাডের কাছে গিয়ে বলল—আজ হারমানিয়াম ও বায়া তবলা নিয়ে তোমার ঘরে যাব। আজ খালি তোমার গান শুনব। তুমি হারমানিয়াম বাজিয়ে পছন্দমত গান গেয়ে যাবে, আমি তবলায় সঙ্গত

করব। তুমি কিন্তু প্রাণ খুলে গাইবে। ঠিক আছে উদয়, তাই হবে। এই বলে সুজিত চ্যাটার্জি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজের কামরায় চলে গেলেন। উদয়ও ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে নিজের রুমে চলে গেল।

উদয় মনে মনে ভাবতে লাগল— যা দেখলাম বা যা বুঝলাম আমার তো ড্যাড্ ছাড়া আর নিজের বলতে কেউ নেই, এবং আমি ছাড়াও ড্যাডের আপন বলতে কেউ নেই। ড্যাডকে কলকাতায় কী করে নিয়ে যাব, সেই পথ আমার খুঁজে বের করতে হবে। এই কয়মাস আমেরিকাতে থেকে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। এই দেশে খালি টাকার লোভে আমাদের ইণ্ডিয়ার ভাল ভাল ছেলেরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এদেশে পড়ে আছে। আমি তো ভাবতেও পারি না।

উদয়—নিজের ঘরে বসে ওর ড্যাডের পুরানো গানের বই ও স্বরলিপি দেখাতে লাগল। এই পাঁচটা নাগাদ নবাব এসে উদয়কে চা দিয়ে বলল—সাহেব বলেছেন, আপনার সাহেবের ঘরে যেতে হবে না। সাহেবই আপনার ঘরে, এই ছটা নাগাদ আসবেন।

উদয় চা খেয়ে কার্পেটের উপর বসে হারমনিয়াম নিয়ে ড্যাডের গানের বই থেকে, গানের স্বরলিপি দেখে একটা গান তুলছিল। সেই সময় সুজিত চ্যাটার্জি উদয়ের ঘরে ঢুকে কার্পেটের উপর বসলেন। উদয় তার ড্যাডের দিকে হারমনিয়ম এগিয়ে দিল। সুজিত চ্যাটার্জি হারমনিয়াম বাজাতে বাজাতে বললেন—জান উদয়, আমার গানের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কোন গান একবার শুনলেই, আমি হুবহু কপি করে—তৎক্ষণাৎ সেই গান গেয়ে শুনিয়ে দিতে পারতাম। আমি দেখতে চাই উদয়, তোমার মধ্যে সেই গুণ আছে কি না। আমি একটা ভজন গাইছি, তুমি মন দিয়ে শোন। তারপর তুমি হারমনিয়াম বাজিয়ে সেই গান গাইবে। এটা পারলে বুঝব, তোমাকে আমার গান শেখাবার আর কিছু নেই।

এই কথা বলে সুজিত চ্যাটার্জি হারমনিয়াম বাজিয়ে একটা

ভজন গান গাইতে লাগলেন। এত দরদ দিয়ে গাইলেন, গান শেষ হয়ে যাবার পরও, গানের রেস কিছুক্ষণ থাকল। তারপর উদয়ের দিকে হারমনিয়ম সরিয়ে দিলেন।

উদয় তার ড্যাডের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হারমানিয়াম বাজিয়ে সেই ভজন গানটি সুরু করল—এত দরদ দিয়ে হুবহু নকল করে গানটি উদয় গাইল। তাই শুনে সুজিত চ্যাটার্জি অবাক হয়ে গেলেন। উদয়ের গান শেষ হলে, সুজিত চ্যাটার্জি তার হাত বাড়িয়ে উদয়ের হাতের সাথে করমর্দন করে বললেন—সত্যি উদয় তুমি জিনিয়াস, তোমার জন্য আমি গর্ববোধ করছি।

সেদিন অনেক রাত অবধি উদয় ও তার ড্যাড দুজনে প্রাণ খুলে গান গাইল। তারপর নবাবের বার বার তাগিদে ডিনার খেতে বসল।

ডিনার খেতে খেতে সুজিত চ্যাটার্জি বলল—কাল সকাল আটটায়—আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে—গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। প্রথমে যাব চিকাগো, তারপর ফেরার পথে নিউইয়র্ক হয়ে সেখানকার দর্শনীয় স্থান দেখে ফিরে আসব।

উদয় চিকাগোতে গাড়ি করে যেতে হবে শুনে বলল—চিকগো কী খুব কাছে নাকি ? যে বলছ গাড়ি করে যাব।

সুজিত চ্যাটার্জি বলল—এখানে, সবাই বাইরে কোথাও যেতে হলে, যে যার গাড়ি করেই যায়। এখানকার হাইওয়ে রাস্তা গুলো খুব চওড়া এবং ভাল। গাড়ি করে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। রাস্তার ম্যাপ সকলের কাজেই থাকে। সেই ম্যাপ দেখে সব যায়গায় যাওয়া যায়। এদেশে ট্রেনে খুব কম লোক যাতায়াত করে। অনেকে প্লেনেও যাতায়াত করে। তবে বাই রোডই সব থেকে ভাল।

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটাই সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে ওর আমেরিকান কন্টিনেন্টাল গাড়ি করে রওনা দিলেন।

ডেটরয়েট শহর পেরিয়ে ওদের গাড়ি হাইওয়েতে পড়ে ছুটে চলল। উদয় তার ড্যাডের পাশে বসেছিল। তার ড্যাড্ এত স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল দেখে উদয় বলল—ড্যাড্, তোমার কী খুব স্পিডে গাড়ি চালান অভ্যেস?

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এখানকার নিয়ম, এইসব হাইওয়েতে শহরের বাইরে আশি কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাতে হয়। দেখবে সব গাড়িই এই রকম স্পিডে যাচ্ছে। এখানকার গাড়িগুলোর মেশিনারি পার্টসও অন্যরকম। সব অটোমেটিক, আমাকে গিয়ার বা ক্লাচ পা-দিয়ে চেপে টেনে দিতে হবে না। সব অটোমেটিক সুইচে হবে। গাড়ি চালিয়ে কোন সময় পরিশ্রান্ত মনে হয় না। তাই এখানকার সত্তর-আশী বছর বয়সের লোকেরাও গাড়ি চালায়।

সুজিত চ্যাটার্জি গাড়ি ড্রাইভ করছিল আশী কি.মি. স্পিডে আর উদয় ম্যাপ খুলে পাশে বসেছিল। সুজিত চ্যাটার্জি রাস্তার ম্যাপ দেখছিল আর গাড়ি চালাচ্ছিলেন। উদয় দেখছিল রাস্তার দুপাশে খালি মাঠ। দুপাশে মাঠ, মাঝখান দিয়ে বেশ বড় রাস্তা চলে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে সুজিত চ্যাটার্জি রাস্তার ধারের একটা পেট্রল-পাম্পে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন—চল, উদয় এখান থেকে কিছু খেয়ে নেই। ওরা পেট্রল পাম্পের ভেতরে একটা রেঁস্তরাতে গিয়ে কিছু স্ন্যাক্স ও কফি খেল, তারপর তারা গাড়িতে ফিরে এল। সুজিত চ্যাটার্জি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পেট্রল-পাম্প থেকে বেরিয়ে হাই ওয়েতে পড়ে তীব্রবেগে ছুটতে লাগল।

বেশ খানিক বাদে ওদের গাড়ি শিখাগো শহরে পৌছে গেল। ওরা একটা ভাল হোটেলে উঠল, উদয় দেখল ওই হোটেলে ওদের ডবল বেড্রুমে সবরকম আসবাবপত্র রয়েছে। টেলিভিসন, টেলিফোন, কোন কিছুরই অভাব নেই।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বললেন—উদয় আমরা বাথরুম থেকে ক্লিন হয়ে, কিছু খেয়ে চল শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ি।

ওরা এই আধঘণ্টার মধ্যে ফ্রেস্ হয়ে, ওদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শহরের মধ্যে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে উদয় বলল—ড্যাড্, আমরা কোন দেশে এসেছি? এই শহর কী আমেরিকার মধ্যে? না, কোন নিগ্রোদের দেশ? উদয় আবার বলল—ড্যাড্, দেখছ? এখানকার যত লোক দেখছি, তার দশ জনের মধ্যে আট জন লোকই কালো নিগ্রো। তারা কি রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে? বা কি গাড়ি করে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমেরিকা মানে সব সাদা আমেরিকানদের বাস। কারণ আমাদের দেশে, ইণ্ডিয়াতে যত আমেরিকান দেখেছি সবই তো সাদা আমেরিকান। কোন কালো আমেরিকান আমাদের দেশে দেখি নি।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এখন এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমরা শিকাগো শহর দেখতে এসেছি, এই শহরের কী কী দর্শনীয় স্থান আছে তাই আগে দেখে নি। পরে তোমার ওই প্রশ্নের উত্তর দেব। চল আমরা প্রথমে সিয়ারস বিল্ডিং দেখতে যাই। এই বিল্ডিং পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উচু বিল্ডিং। অল্প সময়ের মধ্যে সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে—সিয়ারস্ বিল্ডিএ পৌছে গেল। দু-জনেই গাড়ি থেকে নামল, উদয় ওর ঘাড় একেবারে পিছনের দিকে কাত করে সিয়ারস বিল্ডিং-এর উচ্চতা দেখতে লাগল।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বললেন—এই সিয়ারস বিল্ডিং-এ একশ-বার তলা আছে, এর উপর থেকে শিকাগো শহরের দৃশ্য অতি মনোরম। চল উদয়, আমরা এই সিয়ারস বিল্ডিংএর উপরে উঠে সেই মনোরম দৃশ্য দেখি।

ওরা দুজনে টিকেট কেটে অটোমেটিক লিফ্‌টে করে একেবারে উপর তলায় উঠল, ওদের সাথে সাথে অনেক লোকও উঠল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে রাত সুরু হয়েছে। উদয় সেই একশ পাচ তলার উপর থেকে শিকাগো শহরের আলোর দৃশ্যমালা দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আজ আমার জীবন সার্থক হল, এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বললেন—নীচে যে সমুদ্রের মত দেখা যাচ্ছে—ওটা সমুদ্র নয় ওটার নাম মিসিগান লেক, ওই লেকের এপারে শিকাগো শহর। আর অপর পারে মিসিগান। তুমি যে এখান থেকে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখলে, এই রকম এর থেকেও ভাল অনেক দর্শনীয় স্থান আমেরিকাতে আছে। সেই সব দর্শনীয় স্থান দেখার তোমার আর এত সময় নেই। আবার যখন আসবে, তখন তোমাকে সব দেখাব। আজ চল আমরা হোটেলে ফিরে যাই। সারাদিন গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছি, একটু টায়ার্ড অনুভব করছি। কাল সকালেই আমরা অবার শিকাগো শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ব।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে সিয়ারস বিল্ডিং থেকে নেমে এসে গাড়ি নিয়ে ওদের মোটেলে ফিরে এল।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট খেয়ে—সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে মোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

উদয় ওদের গাড়িতে যেতে যেতে বলল—ড্যাড্, আমি ব্যাংলোরে এতদিন আছি কিন্তু তোমার মত এত সুন্দর গাড়ি খুব কম দেখেছি। কিন্তু তোমাদের এই দেশে দেখছি অনেকেই এত সুন্দর এবং এক্সপেনসিভ গাড়ি চড়ে যাচ্ছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এদেশের প্রায় সবাই নতুন গাড়ি চড়ে, কেউ বড় জোর—দু, তিন বছরের বেশি এক গাড়িতে চড়ে না। তারপর স্ক্র্যাপ আয়রণ হিসাবে বিক্রি করে দেয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি খুব কম লোকে ব্যবহার করে, কাজেই তুমি ঝকঝকে গাড়ি ছাড়া পুরানো গাড়ি খুব কমই দেখতে পাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুজিত চ্যাটার্জি এক বিরাট কমপাউণ্ড ঘেরা একটা চার্চের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে বললেন—উদয় এটাই শিকাগোর মধ্যে সব থেকে বড় চার্চ। এখানে মাঝে মাঝে পৃথিবীর ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর সুনাম, যশ পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছিল।

উদয় সেই চার্চের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে প্রণাম করল, উদয় তার ড্যাডিকে নিয়ে সেই চার্চের ভিতরে দেখতে গেল। সেখানে দেখল খালি যিশুর ছবিতে ভর্ত্তি। উদয় দেখল—একটা বিরাট ছবি তাতে যিশুর দুপায়ে ও দুহাতে মোটা লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। কতগুলো গাট্টা, গোট্টা চেহারার লোক যিশুকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, আরেকটা ছবিতে দেখল—যিশুখৃষ্টকে কতকগুলো লোক জোর করে ধরে ক্রুশে লোহা দিয়ে বিদ্ধ করছে। এইরকম ছবিগুলো দেখে উদয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। উদয় বলল—ড্যাড্, এখন এখান থেকে চল, অন্য কোথায় যাই।

সুজিত চ্যাটার্জি ও উদয়—সেই চার্চ থেকে বেরিয়ে ওদের গাড়িতে এসে আবার চলতে লাগল খুব স্পিডে। উদয় আবার ড্যাডকে বলল—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এদেশে এত কালো লোক আসল কোথা থেকে।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এসব পরে বুঝবে, তুমি যখন কলকাতা থেকে ডাক্তারি পড়া শেষ করে এদেশে এসে হায়ার এডুকেশন নেবে, তখন তোমার কলেজে গেলেই বুঝতে পারবে, সব জানতে পারবে। চল এখন আমরা হোটেলে ফিরে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি। আমরা এবার যাব নিউইয়র্কে।

ওরা ওদের হোটেলে ফিরে এসে, বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে ডাইনিং হলে গিয়ে লাঞ্চ খেতে বসল। ওরা লাঞ্চ খেয়ে, হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে, ওদের লাগেজ নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল।

শিকাগো শহর ছাড়িয়ে ওদের গাড়ি একটা টানেলে ঢুকল, সুজিত চ্যাটার্জি বললেন জানি উদয়, আমরা এখন একটা টানেল দিয়ে যাচ্ছি। টানেল মানে তোমরা জান পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুরঙ্গ পথ। কিন্তু এই টানেল—তা নয়। এই টানেলের রাস্তা, বিরাট গভীর নদীর তলার মাটির নিচ থেকে তৈরি হয়েছে, কিন্তু এখন যে যাচ্ছি মোটেই মনে হচ্ছে না যে আমাদের মাথার ওপরে এক সুগভীর নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কত বড় চওড়া রাস্তা। আলোতে ঝল্‌মল্‌ করছে। সত্যি এসব দেখে আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে এত ডেভলপ কাণ্ট্রি আর নেই।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—তুমি যদি মিচিগানের লেকগুলি দেখ দেখবে এপার-ওপার দেখা যায় না। আর কী ঢেউ! কিন্তু তার নাম লেক মিসিগান। সেখানে দেখবে—কত ছেলে-মেয়েরা সোঁ, সোঁ করে স্পিড বোট চালিয়ে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত দেশ। ভয় বলতে এদের কিছুই নেই। যে-কোন সাহসিকতায় খেলায় এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাত নটার সময় সুজিত চ্যাটার্জি ওর গাড়ি নিয়ে—নিউইয়র্ক শহরের এরিয়াতে পৌঁছে গেল। ওদের গাড়ি এই বড় একটা খোলা মাঠের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। উদয় বলল—ড্যাড্‌ একটু কম স্পিডে গাড়ি চালাও আমি দেখতে দেখতে যাব। উদয় লক্ষ করল যে ওই খোলা মাঠের মধ্যে কতগুলি বড় গাড়ি সারি বেধে রয়েছে। ওইসব গাড়িতে আলো জ্বলছে এবং লোকজনও দেখা যাচ্ছে।

উদয় ওইসব বড় গাড়িগুলি দেখে ওর ড্যাড্‌কে জিজ্ঞাসা করল ওই বড় বড় গাড়িগুলি দেখতে পাচ্ছ? ওই গাড়িগুলোতে বেশ লোকজন রয়েছে। ওই গাড়িগুলি কিসের? কারা থাকে?

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—ওই সব বড় বড় গাড়িগুলোকে টেণ্ট বলে, যারা এই রকম বড় বড় শহরে এসে হোটেল বা মোটেল থেকে অনেক পয়সা খরচ করতে চায় না। তারা এই সব বড় বড়

গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসে। এইসব গাড়িতে কিচেন্, বাথরুম, বেডরুম সব থাকে। নিজেদের বাড়ির মতই পরিবেশ। প্রত্যেক শহরে এইসব বড় গাড়ি যেগুলোকে এদেশের লোক টেণ্ট বলে। পার্ক করার নির্দিষ্ট খোলা মাঠ আছে। সেইসব নির্দিষ্ট যায়গায়—এদেশের লোকেরা এই রকম বড় গাড়ির মধ্যে থাকে। সস্তা দামে খাবার কিনে নিয়ে এসে খায়। কম খরচে হয়ে যায়। এদেশে হোটেলে অথবা মোটেলে থাকা খুব একস্‌পেনসিভ।

উদয় এইসব কথা শুনে বলল—রিয়ালি ড্যাড্ এদেশের সব বিষয়েই নতুনত্ব আছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—আজ রাত হয়ে গিয়েছে, চল, উদয় কোন মোটেলে গিয়ে উঠি।

উদয় শুনে বলল—তুমি যদি টেণ্ট (বড় গাড়ি) ভাড়া করে আনতে, তাহলে আমরাও সেই টেণ্টে থাকতে পারতাম এবং তোমার অনেক টাকা বেঁচে যেত।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়ের কথা শুনে বললেন—আমার এই ভাবে থেকে টাকা বাচাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমার এত টাকা জমেছে যে আমার জীবন তো বাদ দাও, তোমার জীবনেও খরচ করতে পারবে না।

এইসব কথা বলতে বলতে সুজিত চ্যাটার্জি তার গাড়ি ব্লু হেভেন মোটেলের কমপাউণ্ডের মধ্যে এসে পার্কিং জোনে পার্ক করে, লাগেজ নিয়ে—রিসেপসন কাউণ্টারে গিয়ে একটা ডবল বেডরুম চাইলেন। রিসেপসন গার্ল হোটেল ওয়েটারকে ডেকে একটা চাবি দিয়ে বলল—এই বোরডাবদেরকে পাঁচশ-এক নম্বর রুমে নিয়ে গিয়ে তালা খুলে দাও।

সুজিত চ্যাটার্জিও উদয়কে নিয়ে মোটেল ওয়েটার অটোমেটিক লিফ্‌টে করে উপর দিকে উঠতে লাগল। উদয় গুণতে লাগল ক'তলাতে তাদের পাঁচশ-এক নম্বর রুম। উদয় দেখল তাদের

লিফ্‌ট তিরিশ তলা পেরিয়ে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগল, অবশেষে পঁয়ত্রিশ তলাতে লিফট গিয়ে থামল। হোটেল ওয়েটার তাদেরকে পাঁচশ-এক নম্বর রুমে নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলল— আপনাদের যখন যা দরকার হবে, খালি টেলিফোন তুলে বললেই হবে। ওই যে দুটো টেলিফোন দেখছেন—ওর মধ্যে লাল ফোনটা ডাইরেক্ট রিসেপসন কাউন্টারের সাথে যোগাযোগের জন্য রয়েছে। আর সাদা টেলিফোনটা বাইরের ফোনের সাথে যোগাযোগের জন্য রয়েছে। এই বলে হোটেল ওয়েটার বাই বাই বলে চলে গেল।

উদয় ওদের পাঁচশ-এক নম্বর রুমে ঢুকে দেখল দুটো জানালা রয়েছে, জানালার কাচ সরিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বলল— ড্যাড্, নিউইয়রক শহর রাত্রিতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। আলোতে আলোময়। কত রঙের আলো! আর উপর দিকে তাকিয়ে দেখ নক্ষত্ররাশির মেলা। জানালা খোলার সাথে সাথে এত বেগে বাতাস ওদের রুমে ঢুকল তাতে শিতল হাওয়াতে ঘর ভরে গেল। তাড়াতাড়ি উদয় জানালা বন্ধ করে দিল।

উদয়ের কথা শুনে সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—আমার এই আমেরিকা দেশের কোনকিছু ভাল জিনিষ দেখা বাকি নেই। আমার সব দেখে দেখে আর কিছুই বিস্ময়কর মনে হয় না! এখন তোমাদের দেখবার পালা। এই মহান দেশে অনেক কিছু দেখবার আছে। এবার তো তোমার কিছুই দেখা হল না, এর পরে যখন ইণ্ডিয়া থেকে ডাক্তারি পাশ করে এদেশে হায়ার ডিগ্রি নেবার জন্য পড়তে আসবে তখন তুমি নিজেই ঘুরে ঘুরে সব দেখবে—আর ভাববে—এত সাইনটিফিক্যালি ডেভালপ কানট্রি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। চল উদয় আমরা খেয়ে শুয়ে পড়ি, এই বলে লাল টেলিফোন তুলে রিসেপসন গার্লকে বললেন—আমাদের ডিনার পাঁচশ এক নম্বর রুমে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব, তারপর থ্যাঙ্কস্ বলে সুজিত চ্যাটার্জি ফোন ছেড়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে হোটেল ওয়েটার মুভিং টেবিলে করে পাঁচশ এক নম্বর রুমে ওদের ডিনার নিয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে ডিনার প্লেট সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ওরা খাবার দেখে বলল—এই হোটেলের খাবার শিকাগো হোটেলের খাবারের থেকে অনেক ভাল। ওদের দুজনের জন্য দু-প্লেট আলাদা করে ছোট এক-একটা গোটা চিকেন বেক্ করা—আর ব্রেড বাটার, সুফ আর বিফ কারি। ওরা দুজনে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ল। মাঝখানে হোটেল ওয়েটার এসে খাবারের প্লেটগুলি নিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে উদয় ঘুম থেকে উঠে—কাঁচের জানালা খুলে দিলে ঘরময় সুর্য্যের সোনালী আলোতে ভরে গেল। উদয় দেখল—তাদের হোটেলের মত উঁচু বিল্ডিং প্রচুর রয়েছে। রাত্রে নানান রঙের আলোতে যে রকম ঝলমল সুন্দর দেখাচ্ছিল, এখন আর সে রকম সুন্দর মনে হল না। উদয় দেখল—খালি বড় বড় বিল্ডিং আর স্রোতের মত গাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছে। গাড়ির গতির কোন বিরাম নেই। উদয়ের এসব দেখতে ভালো লাগল না, তাই জানালা বন্ধ করে দিল।

সুজিত চ্যাটার্জি ও উদয়—বাথরুম থেকে ক্লিন হয়ে ড্রেস করে বেরবার জন্য রেডি হয়ে গেল, তখন হোটেল ওয়েটার ওদের ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে উদয় বলল—ড্যাড্, আমি সকালে জানালা দিয়ে এই শহরের যতদূর দেখেছি, তাতে মনে হল এই শহর গাড়ি আর বাড়িতে ভরা। কাজেই এই শহরে এমন কিছু দর্শনীয় আছে বলে তো মনে হয় না।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—তুমি কী বলছ উদয়? এই শহর দেখবার জন্য পৃথিবীর কত দূর দূর দেশ থেকে কত লোক আসছে, তারা অনেক টাকা খরচ করে হোটেলে থাকে। এই শহরে দেখার

মত অনেক জিনিষ আছে। তোমার যখন বয়স আরও বাড়বে তখন তোমারও ভাল লাগবে। তোমাকে আমি বেশি জায়গায় নিয়ে যাব না, খালি একটা জিনিষ দেখাব স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। এই স্ট্যাচু রয়েছে অ্যাটলান্টিক ওসেনের মধ্যে। আমরা স্টিমারে করে (এদেশের লোক ওই স্টিমারকে বলে ফেরি) ওই স্ট্যাচু দেখতে যাব। তোমাকে ওই স্ট্যাচু সম্বন্ধে আর বলব না, ওখানে গিয়ে দেখতে পাবে, আরেকটা জিনিষ দেখাব—তার নাম টুইন বিল্ডিং।
ওরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুজনে ওদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমেই গেল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে, গাড়ি পার্কিং জোনে পার্ক করে ওরা হেঁটে চলল স্টিমার ঘাটে যেখান থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখার জন্য সবাই ফেরিতে ওঠে। ওরা প্রায় আধ মাইল পথ হেঁটে ওই স্টিমার ঘাটে গিয়ে পৌছল। আরও অনেক লোক ওদের সাথে হেঁটেও ফেরি ঘাটের দিকে হেঁটে চলেছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—দেখেছ উদয়, কত লোক আমাদের মত হেঁটে চলেছে—ওই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে। এরা নিশ্চয় এখানকার লোকাল লোক নয়, এরা সবাই ফরেনারস। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে এই শহরে আসে এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে।

ওরা ফেরি ঘাটে পৌছে ফেরিতে যাবার জন্য দুটো টিকিট কাটল, উদয় দূর থেকে দেখল—ওই স্টিমারের গায়ে বড় বড় হরফে ইংরাজীতে লেখা রয়েছে—স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ফেরি।

ওরা সেই ফেরিতে উঠে চেয়ারে বসল। কেউ একতলায়—সুন্দর করে চেয়ার সাজানো রয়েছে তাতে বসল, আবার কেউ কেউ দোতলায় সাজান চেয়ারে বসল। প্যাসেঞ্জারে ফেরিটা একেবারে ভরে গেল। কয়েকবার ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে ফেরি ছেড়ে দিল।

উদয় দোতলায় ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে লাগল। সমুদ্র বলে সেরকম খুব বড় বড় ঢেউ দেখতে পেল না আর গর্জনও শুনতে পেল না। তবে খুব বাতাস এবং অল্প ঢেউ দেখতে পেল।

কিছুক্ষণ বাদেই ওই ফেরি স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ঘাটে গিয়ে পৌছুল। সবাই এক এক করে ফেরি থেকে নেমে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখার জন্য এগিয়ে চলল। সুজিত চ্যাটার্জি ও উদয় ফেরি থেকে নেমে পড়ল।

উদয় দেখল সেই স্ট্যাচু প্রায় ছয়-সাত তলা উঁচু বেদির উপর স্থাপিত। সেই বেদি বেশ কিছু জায়গা নিয়ে গোল করে বাঁধান রয়েছে। তার উপর স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে রয়েছে এক হাত আকাশের দিকে তুলে। এই স্ট্যাচুর চারিদিক ঘিরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাঁধান। উদয় অনেকক্ষণ ওই স্ট্যাচুর দিকে তাকিয়ে দেখল, কী ভাবে সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করে—বাঁধান জায়গায় আছড়ে পড়ছে।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বলল—চল, এই স্ট্যাচুর ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠি, ওই সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে ওঠা যায়।

উদয় তাকিয়ে দেখল সত্যি অনেক লোক ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে।

সুজিত চ্যাটার্জি ও উদয় ওই স্ট্যাচুর ভিতরে গিয়ে দেখল উপরে যাবার অটোমেটিক লিফট রয়েছে। ওরা ওই লিফট করে উপরে উঠে গেল। লিফট গিয়ে স্ট্যাচুর পায়ের কাছে থামল, ওখান থেকে আরও উপরে উঠতে গেলে সিড়ি দিয়ে উঠতে হবে।

উদয় বলল ড্যাড্ আর সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে কাজ নেই, চল আমরা ফিরে যাই।

ওরা লিফটে করে নেমে ফেরিতে উঠে আবার এপারে ফিরে এল, আবার হাঁটার পালা। হেঁটে ওরা ওদের গাড়িতে এসে বসল, সুজিত চ্যাটার্জি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে হাই ওয়েতে পড়লেন।

উদয় বলল—ড্যাড্, এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি একটা খুব ভাল দর্শনীয় জিনিষ দেখালে। এই স্ট্যাচু যিনি তৈরী করেছেন, তিনি

যে কত বড় শিল্পী ছিলেন, আমি তো ভাবতেই পারি না, সেই শিল্পীর কাজ কী নিখুঁত ?

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—দেখ উদয়, যিনি ওই স্ট্যাচু তৈরী করেছেন। তিনি কোন দেশের শিল্পী আমি তা বলতে পারব না। আমি এ বিষয়ে আর খোঁজ খবর নেইনি। আমার জানবার, তোমার মত আগ্রহ হয়নি। তুমি দেখেই গোড়ার কথা জানবার তোমার আগ্রহ হয়েছে। তুমি তো আবার কয়েক বছর বাদেই আসছ, তখন তুমি নিজেই সব জেনে নিতে পারবে। এখন চল এই শহরের টুইন বিল্ডিং দেখে আসি। এই বলে সুজিত চ্যাটার্জি তার গাড়ি আর একটা হাইওয়ে দিয়ে চালাতে লাগলেন। এই কিছু সময়ের মধ্যে সুজিত চ্যাটার্জি একটা জায়গায় নিয়ে এসে গাড়ি থামালেন।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে দুটো বিল্ডিং দেখিয়ে বললেন—এই দুটো বিল্ডিং। উদয়—সেই পাশাপাশি দুটো বিল্ডিং-এর দিকে নিচ থেকে উপরে আরও উপরে তাকিয়ে দেখল—বিল্ডিং দুটো একরকম দেখতে এবং সোজা আকাশের দিকে উঠেছে। কত তলা হবে উদয় দেখে বুঝতে পারল না। উদয়ের মনে হল একশত তলার উপর আরও অনেক তলা আছে। উদয় মনে মনে বলল—দুটি বিল্ডিং একই রকম দেখতে—তাই বোধহয় এই বিল্ডিং দুটির নাম হয়েছে টুইন বিল্ডিং।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বললেন—এবার চল তোমাকে এই সুবিখ্যাত নিউইয়র্ক শহর ঘুরিয়ে দেখাব। এই বলে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায়।

উদয় বলল—এই দেশের অন্য সব শহর থেকে এই শহরে দেখছি অনেক লোক পায় হেঁটে চলেছে। আবার অনেক বাড়ি দেখে বলল—এ যেসব পুরানো রঙ চটা, দেওয়াল ফাটা বাড়ি।

উদয় সব জিনিষ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। একটা

-রাস্তা দেখিয়ে উদয় বলল দেখছ ড্যাড্, কীরকম অপরিষ্কার রাস্তা। অন্য শহরের মত চক্‌চকে নয়। এই শহরের এত নাম ?

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এই শহরের এত নামের নিশ্চয় অন্য কারণ আছে। এই শহরের কেনেডি এয়ারপোর্ট পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় এয়ারপোর্ট। পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্লেন এই এয়ার-পোর্টে আসে, এই এয়ারপোর্ট এত বিজি যে প্রত্যেক মিনিটে প্লেন ওঠা-নামা করছে।

যেতে যেতে এক এরিয়াতে উদয় দেখল খালি চিনাদের বসতি। আর সেখানকার রাস্তা কী অপরিষ্কার। উদয় জিজ্ঞাস করবার আগেই সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এই যায়গাকে বলে চিনা টাউন। এই বিরাট এরিয়াতে চিনা ছাড়া আর কেউ থাকে না, এটা রাজনৈতিক কারণেই সম্ভব হয়েছে।

ওরা শহর ঘুরে এই দুটো নাগাদ হোটেলে ফিরে এল। বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে, সুজিত চ্যাটার্জি রিসেপসন অফিসে লাঞ্চ দেবার জন্য ফোন করলেন। খানিক বাদে হোটেল ওয়েটার মুভিং টেবিলে লাঞ্চের খাবার নিয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

লাঞ্চ খেতে খেতে উদয় বলল—ড্যাড্, তোমাদের নিউইয়রক শহর দেখলাম, দেখে আমি হতাস হয়েছি। আজ না হয় কাল সকালে চল আমরা আমাদের ডেট্রয়েট শহরের বাড়িতে ফিরে যাই, সেখানে দিন-দুই থেকে, আমি ব্যাঙালোর রওনা হব।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—উদয়, তোমাকে আমি দুটো জিনিস দেখাতে পারলাম না। এদেশে যারা বেড়াতে আসে বা কিছু কাজে আসে, তারা প্রত্যেকেই এই দুটো জিনিষ দেখে তবে যায়। আমাদের ডেটরয়েট শহর থেকে কানাডা বেশি দূর নয়। চার ঘণ্টা ড্রাইভ করলেই কানাডাতে পৌছান যায়। সেই কানাডার—উঁচু টাওয়ার, পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উঁচু টাওয়ার, তার নাম সি এন

টাওয়ার। আর কানাডায় রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত নায়গারা ফলস্। এতবড় ফল্‌স্ পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও নেই। আরেকটা আমেরিকাতে বিশেষ দেখবার জিনিষ আছে। সেটা হচ্ছে ডিজ্‌নি ওয়ারল্ড, সেখানে এমন এমন মজার জিনিষ আছে, সব বয়সের লোকদেরই দেখলে আনন্দে মন ভরে উঠবে। এখন এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে ওইসব যায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি আবার যখন আসবে, তখন নিজেই সবকিছু দেখবে, দেখে আনন্দ পাবে।

উদয় বলল—ড্যাড্, তোমার কাছ থেকে শুনেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। এখন ব্যাংলোরে ফিরে যাবার জন্য আমার মন টানছে। তুমি ঠিকই বলেছ আমি আবার যখন এই দেশে ফিরে আসব, তখন প্রাণভরে সব দেখব।

ওদের লাঞ্চ খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছিল। হাত, মুখ মুছে ডাইনিং টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

ওরা এবার দুজনে ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে একটু রিলাক্স্ করবার জন্য শুয়ে টি ভি দেখতে লাগল।

উদয় টি ভি দেখতে দেখতে বলল—এতো খালি দেখছি বিজনেস অ্যাডভারটাইজমেন্ট।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এই দেশে দিন রাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইস ঘণ্টা টি ভি দেখায়। কাজেই বিজনেস অ্যাডভার-টাইজমেন্ট থাকে অনেক।

উদয় বলল—আমি ডেট্রয়েটের বাড়িতে টি ভি-তে দেখেছি যারা গান গায় বা নাচে, তার বেশীর ভাগ কালো আমেরিকান। তাই দেখে আমার মনে হচ্ছে এই দেশে গানের এবং নাচের শিল্পীরা কালো আমেরিকানরা বেশী।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—খালি গান বা নাচ কেন—খেলা-ধুলায়, বকসিংএ এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কালো দেখে মনে করবে না এদের সব জিনিষই কালো। এদের গুণাবলি অনেক।

উদয় বলল—সত্যি ড্যাড্, এদের প্রথম দেখে, আমার এদের সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা হয়েছিল না, কিন্তু এখন এই কালো আমেরিকানদের উপর আমি খুব ভাল ধারণা নিয়ে যাচ্ছি।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছে। এদেশের আসল গুণি লোক কিন্তু এই কালো আমেরিকানরা।

ওদের কথা বলতে বলতে বিকেল হয়ে গেল। উদয় বলল—ড্যাড্, আমার আর এই নিউইয়রক শহরে থাকাতে ভাল লাগছে না। চল ড্যাড, এখনি আমরা এখান থেকে আমাদের ডেটরয়েটের বাড়িতে ফিরে যাই। তুমি যে আমাকে এই দুমাস ধরে গান শিখিয়েছ এবং যে সব ভাল ভাল মেউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এনে রেখেছ, এই সব জিনিষ এখন আমার প্রধান আকর্ষণ। চল এখনি হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে আমাদের বাড়ি যাবার পথে বেরিয়ে পড়ি।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়ের কথা শুনে একবার উদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল—উদয়ের মুখের ভাবও বলছে—উদয় আর এই নিউইয়রক শহরে থাকতে রাজি নয়।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—ঠিক আছে উদয়, এই শহর তো প্রায় সব দেখা হয়ে গেল, লাগেজ সব ঠিক করে নাও। এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ব।

উদয় ওর ড্যাডের কথা শুনে আনন্দে বলে উঠল—মাই গুড ড্যাড্, এই বলে উদয় আনন্দের সাথে ওদের জিনিষ গুছতে লাগল। আধ ঘন্টার মধ্যে ওরা লাগেজ রেডি করে রিসেপসন কাউন্টারে এসে সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—আমরা এখনই এই হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এই বলে হোটেলের সব বিল মিটিয়ে দিয়ে ওরা ওদের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল।

সুজিত চ্যাটার্জি গাড়ি ড্রাইভ করতে লাগল—আর উদয় ওর ড্যাডের পাশে রাস্তার ম্যাপ নিয়ে বসে থাকল। নিউইয়রক

শহরে ওরা চিকাগ শহর থেকে এসেছিল। এখন ওরা নিউইয়র্ক থেকে যাচ্ছে ডেট্রয়েট শহরে। এ একেবারে অন্য রাস্তা। তাই রাস্তার ম্যাপ দেখে দেখে সুজিত চ্যাটার্জি গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

দু-ঘণ্টা গাড়ি চালাবার পর রাস্তায় অন্ধকার নেমে এল। তবে ওদেশের রাস্তা তো প্রায় সবই হাইওয়ে। উদয় দেখল অজস্র গাড়ি যাচ্ছে, রাস্তায় কোন আলো দেখা যাচ্ছিল না। তবে কিছু দূরে দূরে রাস্তার পোস্টের সাথে এমন একটা জিনিষ লাগান আছে, গাড়ির লাইট ওই জিনিষের উপর পড়লে, ওই জায়গা একেবারে আলোয় আলোময় হয়ে যায়।

কিছুদূর যাবার পর উদয় দেখল—রাস্তার পাশে বড় একটা মাঠে অনেক গাড়ি দাড়িয়ে আছে, আর গাড়ির মধ্যের লোকেরা ছেলে এবং মেয়েরা খুব আগ্রহ সহকারে কিছু দেখছে আর হৈ-হুল্লোড় করছে, তাই দেখে উদয় বলল ড্যাড্, এইখানে গাড়ি একটু থামাও।

সুজিত চ্যাটার্জি গাড়ি থামাল। উদয় ওই সব গাড়ি দেখিয়ে বলল—দেখ ড্যাড্ কত গাড়ি ওখানে দাড়িয়ে আছে। আর ওই সব গাড়ির মধ্যে বসে ছেলে এবং মেয়েরা এত আগ্রহ সহকারে কী দেখছে? আর হৈ-হুল্লোড় করছে।

সুজিত চ্যাটার্জি বললেন—এই দেশে এই রকম অনেক যায়গা আছে যেখানে গাড়িতে বসে টিন্ এজারস এবং ইয়ং কাপল মুভি দেখে। এখানে এমন সব অশ্লীল মুভি দেখায় যা নাকি কোন বাবা মা তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে বসে দেখতে পারে না।

এখন চল উদয়, এই বলে সুজিত গাড়ি স্টার্ট দিল। সুজিত চ্যাটার্জি বলতে লাগলেন—আবার যখন আসবে, তখন প্রাণে যা চায় তাই দেখবে, প্রাণে যা চায় তাই করবে। এ দেশে কোন বাবা মা ছেলে-মেয়েরা এ্যাডাল্ট হলে, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বাধা দেয় না। এটাই হল এদেশের বিশেষত্ব।

ওরা ভোর চারটের সময় এসে ওদের ফ্ল্যাটে পৌছে গেল।

নবাব গাড়ির হর্ন শুনেই দরজা খুলে ছুটে এল। গাড়ি থেকে লাগেজ তুলে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

উদয় ওর রুমে চলে গিয়ে, বাথরুম থেকে ক্লিন হয়ে স্লিপিং ড্রেস পরে রিলাক্স করার জন্য বিছানায় বসল, তখনই নবাব বড় গ্লাসের এক গ্লাস দুধ ও চারটে সন্দেশ নিয়ে এসে টেবিলে রেখে বলল—ছোট সাহেব আপনি এখন এই দুধ আর সন্দেশ খেয়ে নিন। এখন আর অন্য কোন জিনিষ খাওয়া চলবে না। আপনার জন্য জলের বদলে একটা কোক এনে দিচ্ছি, এই বলে নবাব উদয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উদয়—দুধ, সন্দেশ আর কোক খেয়ে শুয়ে পড়ল এবং অল্প সময়ের মধ্যে নিদ্রামগ্ন হল।

উদয় ওর ড্যাডের কাছে আর দু-দিন ছিল। এই দু-দিন ওরা কেউ বাড়ি থেকে বের হয়নি। এই দু-দিন ধরে ওরা খালি গান গেয়েছে, খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে।

যাবার দিনে সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে বললেন—তুমি এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম গান শিখেছ, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। তুমি এখন যে কোন গানের আসরে যে কোন জনপ্রিয় গায়কদের পাশে বসে গান গাইবার যোগ্যতা অর্জন করেছ। তুমি কোন সময় যে কোন গায়কের সামনে গান গাইতে দ্বিধা করবে না।

উদয় বলল ড্যাড্, আপনার আশীর্বাদ এবং গান শিক্ষাদানের যোগ্যতাই এত কম সময়ের মধ্যে গায়ক হওয়া সম্ভব হয়েছে।

সুজিত চ্যাটার্জি উদয়কে নিয়ে বাড়ি থেকে ডেট্রয়েট এয়ার-পোর্টে চলে এল। উদয় তার ড্যাড্‌কে ভক্তিভরে প্রণাম করে সজল-নয়নে প্লেনে উঠে গেল। একটু পরেই প্লেনটা আকাশভেদি গর্জন করে এয়ারপোর্ট ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে মিলিয়ে গেল।

উদয় ওর প্লেন থেকে বম্বের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমে, আবার সেখান থেকে অন্য প্লেনে করে—ব্যাংলোরে গিয়ে পৌছল।

ব্যাংলোর এয়ারপোর্ট থেকে একটা ক্যাব ভাড়া করে ওর হোস্টেলে চলে এলো।

উদয় হস্টেলে পৌঁছে, লাগেজ ওর রুমে রেখে ফাদার ফ্রানসিসের সাথে গিয়ে দেখা করল, ফাদার তখন তাঁর আফিসে বসে কাজ করছিলেন। উদয়কে দেখে পুলকিত নয়নে তার চেয়ার থেকে উঠে এসে উদয়কে আলিঙ্গন করে কপালে চুম্বন দিয়ে বললেন—মাই বয় তোমাদের সব খবর ভাল তো? তোমার দেরি দেখে, তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিলাম। কলকাতার সব থেকে নাম করা মেডিকেল কলেজে তোমাকে ভর্ত্তি করিয়ে রেখেছি। তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে এক কথায় ওরা ভর্ত্তি করে নিয়েছে, এবং ওই মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তোমার সুবিধা মত যে দিন খুসি কলকাতায় চলে যাবে। আমি শুনেছি কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে দু-একটা মাস খুব র‍্যাগিং হয়। আমি জানি তুমি মোটেই তাতে নার্ভাস হবে না। দেখতে দেখতে দু-একটা মাস কেটে যাবে, এখন হস্টেলে গিয়ে একটু রেস্ট নাও। অনেক দূর থেকে তো এসেছ? এই বলে ফাদার ফ্রানসিস্ তাঁর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। উদয়ও তার ঘরে ফিরে এলো।

উদয়কে ওর বন্ধুরা সকলে ঘিরে ধরে বলল কীরে উদয়? কী হলো? আমেরিকাতে গিয়ে একেবারে তোমার মত পাল্টিয়ে এলে? আগে তো তোমার ইচ্ছা ছিল, এডুকেসন লাইনেই হায়ার-স্টাডি করবে, এখন শুনলাম তুমি মেডিকেল লাইনে চলে যাচ্ছ? আমেরিকাতে গিয়ে তোমার স্টেপ্ মাদারকে দেখলে? তোমার স্টেপ্ মাদারই কি তোমাকে মেডিকেল লাইনে পড়তে বলেছেন?

উদয় পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল—নারে, তোমরা যা ভেবেছ সে সব কিছুই না। আমার মার মৃত্যুর পর, আমার ড্যাড্ আর

রি-ম্যারেজ করেন নি, আমার কোন স্টেপ্ মাদার নেই আর কোন ছোট ভাই-বোনও নেই, তবে থাকলে আমি খুসি হোতাম! আমার ড্যাড্ আমাকে মেডিকেল পড়তে বলেছেন। এখান থেকে পড়ে আমেরিকাতে গিয়ে হায়ার ডিগ্রি নিতে বলেছেন, তা হলে আমি আর্ত রুগ্ন লোকেদের সেবা করার সুযোগ পাব। উদয়ের এই কথা শুনে ওর সব বন্ধুরা যারা চমকপ্রদ কথা শোনবার জন্য এসেছিল, আস্তে আস্তে সবাই নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

উদয় ওর এই সব জেলাস বন্ধুদের মনোভাব দেখে ভাবল—ভেবেছিলাম এখানে বন্ধুদের সাথে আরও দু চারদিন থাকব—কিন্তু আর নয়। ফাদারকে আজই বলব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কলকাতার মেডিকেল হস্টেলে চলে যাব। এই ভেবে সে তার নিজের জিনিষ গুছতে সুরু করল।

বিকেলে প্রার্থনার সময় হস্টেলের সব ছেলে-মেয়েদের ওঃ উপাসনা মন্দির চার্চে উপস্থিত থাকতে হয়।

সেদিন বিকালে উপাসনার সময় ফাদার ফ্রানসিস্ বাইবেল থেকে পাঠ করছিলেন, সবাই তাই শুনে রিপিট করছিল। এটাই হোলো ওই মিশনারি চার্চের নিত্যকার নিয়ম। স্পেশাল উপাসনা হয় প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার সকাল সাতটায়। সেই দিন সেই সময় ব্যাংলোর শহরের অনেক সাহেব সেই উপাসনা সভায় যোগদান করতে আসেন। রেভারেণ্ড ফাদার ফ্রানসিস্ ব্যাংলোরে খুব সম্মানিত ব্যক্তি, সবাই তাঁকে ভক্তি করেন।

সেই দিনই বিকেলে উপাসনার পর, উদয় ফাদারকে বলল—ফাদার, এখানে তো আর আমার থাকার প্রয়োজন নেই, কাজেই তাড়াতাড়ি আমাকে এখান থেকে কলকাতায় চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

ফাদার বললেন—মাই সান্, কালকে তোমাকে জানিয়ে দেব, তুমি কবে কলকাতায় রওনা হয়ে যাবে। তোমার যাবার আগে

তোমাকে আমাদের একটা ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। এই ইউনিভারসিটির গণ্যমান্য-ব্যক্তিরা তোমার সাথে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এই বলে ফাদার চলে গেলেন।

পরের দিন উপাসনা সভায় ফাদার উদয়কে ডেকে বললেন—মাই সান্, আমরা ঠিক করেছি, পরশু অপরাহ্নে তিনটের সময় আমাদের এই থিয়েটার হলে তোমাকে আমরা বিদায় সম্বর্ধনা জানাবো। তার পরের দিন অন্ দ্যা থ্যার্ড ডে, তুমি কলকাতা রওনা হয়ে যাবে। তোমার প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে, ওখানে গিয়ে তোমার যা মাসিক খরচ আমাকে জানাবে। আমি তোমাকে প্রত্যেক মাসে সেই টাকা পাঠিয়ে দেব। কারণ তোমার ড্যাড্ ব্যাঙ্কে আমাকে অথরাইজ করে গিয়েছেন, যত টাকা দরকার তোমার এডুকেশনের জন্য, আমি সেই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারব। কাজেই টাকার জন্য তুমি কোন দিন কোন সমস্যায় পড়বে না। আমি কলকাতার মেডিকেল কলেজ অথারিটিকে জানিয়ে দিয়েছি, তোমার ওখানে খাওয়া, থাকা, পড়ার—যাবতীয় খরচের জন্য আমি দায়ী থাকব। ফাদার আরও বললেন—হোস্টেলে তোমার জন্য একটা সেপারেট রুম এ্যালোট করা হয়েছে, ওখানকার সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন, তোমার হোস্টেলের রুম নাম্বার একুশ। তোমার রুমে তুমি একাই থাকবে, যেমন এই হোস্টেলে তুমি একাই একটা রুম নিয়ে থাকতে। তাতে তোমার পড়ার অনেক সুবিধা হয়েছে। তোমার পড়ার সুবিধার জন্যই আমি ওই মেডিকেল কলেজের সুপারিনটেনডেণ্টকে লিখেছিলাম তোমার জন্য আলাদা একটা রুম এ্যালোট করতে। তাতে হোস্টেলের খরচ বেশী দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তুমি আমাদের কাছে তোমার দু-বছর বয়স থেকে ছিলে। তোমাকে আমরা কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। তুমি মানুষ হয়েছ, মনুষ্যত্বের সব গুণগুলি তুমি অর্জন করেছ এটাই

আমাদের সাফল্য, এটাই আমাদের গর্ব। তুমি কোন পরীক্ষায় ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হওনি। তাই তোমার বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে এই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।

উদয় বলল—ফাদার আমি একটা রিকোয়েস্ট করব?

ফাদার উদয়ের কথায় চিন্তান্বিত হয়ে বললেন—তুমি কী আবার রিকোয়েষ্ট করবে? তোমার ইচ্ছাই তো আমার ইচ্ছা। বল, উদয় —তুমি কি বলতে চাইছ।

উদয় বলল—এটাই আমার শেষ ইচ্ছা। বিদায় সম্বর্ধনার শেষের অনুষ্ঠানে আমাকে যদি বিদায়ের শেষের গান গাইবার অনুমতি দেন—এটাই আমার ইচ্ছা ফাদার।

ফাদার বললেন—এতে কিন্তু, কিন্তু করবার কী আছে উদয়? তুমি তোমার বিদায়ের গান গাইবে, এতো খুব ভাল কথা, নিশ্চয় তুমি গাইবে, এই বলে তিনি তাঁর কাজে চলে গেলেন।

উদয়ের ফেয়ারওয়েলের দিন এসে গেল, ওই মিসনারিসদের একটা স্টেজ হল আছে, সেই হলে উদয়ের বিদায়-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে।

বিদায়-সম্বর্ধনার দিনে, তিনটে বাজার আগেই একে একে সব নিমন্ত্রিত সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের সংরক্ষিত আসনে সেচ্ছা-সেবকগণ বসিয়ে দিতে লাগল। ওই শহরের বড় চার্চের বিশপ এলেন। এলেন ইউনিভার্সিটির ভাইসচ্যানসেলার। এলেন যসস্বী শিক্ষাবিদগণ, সাহিত্যিকগণ আর স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও সিনিয়র ছাত্রের দল।

ফাদার ফ্রানসিসের অনুরোধে লর্ড বিসপ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন। প্রথমেই লর্ড বিশপের সম্মানার্থে চার্চের নান্‌গণ বাইবেল থেকে স্তোত্র পাঠ করলেন।

তারপর ডদয়ের বিদায়ের সম্বর্ধনার কাজ শুরু হলো।

উদয়কে স্টেজে নিয়ে গিয়ে ফাদার ফ্রানসিস বললেন—এই উদয়

চ্যাটার্জির ফেয়ারওয়েলে আমরা একত্রিত হয়েছি, এই উদয় আমাদের মিশনের কির্ত্তী, আমাদের গর্ব। ওর ড্যাড্ মিষ্টার সুজিত চ্যাটার্জি ওর দু-বছর বয়সের সময়, আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যায়—ওকে মানুষ করবার জন্য। আমরা যতদূর জানি ওর ড্যাড ইণ্ডিয়ান হয়েও আমেরিকান সিটিজেন এবং ওই মহাদেশে পারমানেণ্টলি সেটেল্ড হয়ে আছেন। উদয়ের মা মারা যাবার পরই, উদয়ের ড্যাড্ আমাদের কাছে দিয়ে যান এবং একটি অনুরোধ করে যান—আমরা যেন উদয়কে ইংরেজী, হিন্দী এবং বাংলা এই তিনটি ভাষা শিখিয়ে দেই। সেই যে দিয়ে গেলেন, তারপর আর কোনদিন উদয়ের ড্যাড্ আসেন নি।

এই কথা শুনে সব নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এর ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

সেদিকে নজর না দিয়ে—ফাদার ফ্রানসিস বলতে লাগলেন—তবে ওর ড্যাড্ উদয়ের শিক্ষার জন্য এবং ওর সব রকম ব্যয়ের জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। আমাদের গর্ব উদয় আমাদের কাছে থেকে মানুষ হয়েছে। যারা এ পর্যন্ত উদয়ের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সবাই উদয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ। ও এখন কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়তে যাচ্ছে, ওর বিশ্বাস ও ডাক্তার হলে, অনেক রুগ্ন, অনেক আর্ত মানুষের সেবা করে আরোগ্য করার সুযোগ পাবে।

এই কথা শুনে সব নিমন্ত্রিত সম্মানিত ব্যক্তিরা করতালি দিয়ে উদয়ের এই সদ্‌ইচ্ছার প্রশংসা করলেন।

ফাদার ফ্রানসিস বললেন—লর্ড বিশপ উদয়কে সোনার ক্রস উপহার দিয়ে উদয়ের মনুষ্যত্বের গুণাবলীর প্রশংসা করছেন।

উদয়—লর্ড বিশপের—কাছ থেকে সোনার—ক্রস উপহার নিয়ে—প্রণাম করল।

ভাই চ্যানসেলার—তাঁর নিজের লেখা বই "মাই কানট্রি ম্যান"

উদয়কে উপহার দিলেন। আরও সম্মানিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে অনেক কিছু মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিলেন।

পরিশেষে ফাদার ফ্রানসিস্ বললেন—উদয় নিজেই নিজের বিদায়ের গান গেয়ে—ওর বিদায়-সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান শেষ করবে।

এই ঘোষণা শুনে—সিনিয়র ছাত্ররা করতালি দিয়ে—স্বাগত জানাল।

উদয় স্টেজের মাঝখানে টেবিলে রাখা হারমনিয়ম বাজিয়ে—সজল-নয়নে গান গাইতে লাগল—

বিদায়ের ব্যথা বাজিছে
আমার বুকে
কী গাহিব গান
ব্যথিত হৃদয়ে
বিদায় দেওয়ার ক্ষণে
অশ্রুবারি নয়নে
দিশাহারা হয়েছি
মনে-প্রাণে—
কী গাহিব গান
ব্যথিত-হৃদয়ে।

এত দরদ দিয়ে, এত করুণ-কণ্ঠে উদয় গান গাইতে লাগল। যতক্ষণ উদয় গান গাইতে লাগল, ততক্ষণ সারা হল নিকোশ কালো অন্ধকারের মতো স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। উদয়ের ব্যথিত গানের সুরে উদয়ের মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবিও বিশাদময় হয়ে গেল।

উদয় গান শেষ করে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সকলকে নমস্কার করে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল। নিমন্ত্রিত অতিথী-অভ্যাগতদের মুখের চেহারা বিশাদ-মাখানো হয়ে গেল। আস্তে আস্তে হল থেকে এক এক করে নিঃশব্দে সবাই চলে যেতে লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় উদয় উপাসনাতেও এসেছিল। উপাসনা শেষ হলে ফাদার উদয়কে ডেকে বললেন—মাই সন্, এই বিদায়ের ক্ষণে তোমার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছে, তুমি এতদিন এখানে ছিলে, তাই এখান থেকে চলে যেতে তোমার মনে ব্যথিত বিদায়ের সুর বাজছে, তুমি তোমার হায়ার স্টাডির জন্যই আমাদের ছেড়ে কলকাতায় যাচ্ছ, আমরা তোমার কাছে সব সময় আছি ও থাকব। যখন যে কোন বিষয়ে দরকার মনে হবে, এখানে চলে আসবে, কোন সময়ে দ্বিধা করবে না। আজ রাত্রে আমার কাছ থেকে তোমার সব রকম ডকুমেন্ট, যথা কলকাতার মেডিকেল কলেজের ভর্তির কাগজ, হস্টেলের কাগজ, এয়ার টিকিট প্রভৃতি নিয়ে নেবে। কাল সকাল ছটায় তোমার কলকাতায় যাবার ফ্লাইট, এই বলে ফাদার চলে গেলেন।

রাত্রে উদয় ফাদারের কাছ থেকে সব রকম ডকুমেণ্ট নিয়ে নিল। ফাদার উদয়কে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন—মাই সন্, তোমার কলকাতায় গিয়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হবে, মূল্যবান মেডিকেল বই কিনতে অনেক টাকা লাগবে, আরও টাকার প্রয়োজন হলে, লিখবে আমি পাঠিয়ে দেব। তোমাকে আরেকটা কথা বলে রাখছি —তুমি সব সময় মনে রাখবে, তোমার ড্যাডের ইচ্ছা নয় তুমি ওখানকার মেডিকেল কলেজে তোমার ড্যাডের আমেরিকার ঠিকানা দাও। তার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার পারমানেণ্ট ঠিকানা আমাদের এখানকার ঠিকানা দিয়েছি। তুমিও ওখানে গিয়ে— আমাদের এখানকার ঠিকানা দেবে। তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, তুমি স্বনামধন্য পুরুষ হও, আমরাও তাই চাই, তোমার ড্যাডেরও তাই ইচ্ছে। যাও উদয় তোমার রুমে গিয়ে সব জিনিষ গুছিয়ে শুয়ে পড়। ভোর পাঁচটায় আমাদের এখানকার লোক তোমাকে ডেকে দেবে ও তোমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

উদয় ফাদারের কাছ থেকে টাকা ও সব কাগজ নিয়ে—ফাদারকে প্রণাম করে নিজের রুমে চলে এলো।

উদয় আগের দিনই সব জিনিষ গুছিয়ে রেখেছিল, খালি ডাইনিং হলে গিয়ে খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর পাঁচটার আগেই উদয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তবুও জেগেই বিছানায় শুয়েছিল, আর ভাবছিল এই ঘরে, এই বিছানায়—কত বছর সে থেকেছে, আজ সব ছেড়ে এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে। সেই সময় দরজায় খট্-খট্ আওয়াজ হল, উদয় ঘরের ভিতর থেকে বলল—আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, বাইরে থেকে যে খট্-খট্ আওয়াজ করছিল সে বলল—আপনি দরজা খুলুন। আপনার জন্য কফি নিয়ে এসেছি।

উদয় উঠে দরজা খুলে দেখল ওদের ক্যানটিনের হেড বয় কফির পট নিয়ে দাঁড়িয়ে, হেড বয় ঘরে ঢুকে কফির পট টেবিলের উপর রেখে বলল—আপনি ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার লাগেজ নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবেন রেভারেণ্ড ফ্রানসিস সাহেব তাঁর গাড়ি নিয়ে আসবেন, তিনি আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দেবেন। এই বলে হেড বয় চলে গেল।

উদয় দেখল কফি পটে দু-কাপ কফি রয়েছে। উদয়ের দু-কাপ কফি খেয়ে ঘুমের ঘোর কেটে গেল এবং লাগেজ নিয়ে সাড়ে পাঁচটার আগেই ওর রুম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সকাল ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ফাদার ফ্রানসিস্ উদয়ের রুমে যাবার রাস্তায় এসে গাড়ি থামালেন।

ড্রাইভার দরজা খুলে উদয়কে ডাকবার জন্য ওর রুমে যাচ্ছিল। গাড়ি থামার সাথে সাথে ফাদার উদয়কে দেখলেন, কাছেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারকে ফাদার বললেন—তোমার যেতে হবে না, আর পিছনের দিককার সিটের দরজা খুলে বললেন—

উদয় এসো, আমার পাশে এসে বোস। উদয় গাড়িতে উঠে ফাদারের পাশে বসল। আর ড্রাইভার উদয়ের সব জিনিষ ক্যারিয়ারে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে গাড়ি ছুটালো। ছটা বাজার দশ মিনিট আগে উদয়কে নিয়ে ফাদারের গাড়ি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। উদয় ব্যথিত-হৃদয়ে ফাদারকে প্রণাম করে প্লেনে উঠে পড়ল।

ঠিক ছটা বাজার সাথে সাথে প্লেন ব্যাংলোর এয়ারপোর্ট থেকে আকাশভেদি গর্জন করে টেক্ অফ্ করল, তাই দেখে ফাদার ফ্রানসিস্ মনে মনে ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—তুমি আমার এই চাইল্ডকে বাঁচিয়ে রাখ, মানুষ কর, এই বোলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে—এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এলেন।

এই ঘণ্টা দুই পরে প্লেন দম্‌দম্ এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল। এক এক কোরে সব প্যাসেঞ্জার প্লেন থেকে নামতে লাগল, উদয়ও প্লেন থেকে নেমে পড়ল।

উদয় লাগেজ কাউণ্টারে এসে দেখল তার বড় সুটকেসটা অন্য সব প্যাসেঞ্জারদের লাগেজের সাথে লাগেজ কাউণ্টারে গোল হয়ে ঘুরছে। উদয় তার সুটকেসটা সেই ঘুরন্ত কাউণ্টার থেকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো ট্যাক্‌সির বিরাট লাইন। সে একটা ট্যাকসিতে তার লাগেজ নিয়ে উঠে পড়ল।

ট্যাক্‌সি ড্রাইভার মিটার ডাউন করে এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে বেরিয়ে ভি আই পি রোড ধরল। ট্যাকসি ড্রাইভার বাঙালী হয়ে উদয়কে দেখে বাঙালী ভাবতে পারে নি। তাই হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবেন স্যার ?

উদয় পরিষ্কার বাংলা ভাষায়—ট্যাক্‌সি ড্রাইভারকে বলল—আমাকে সাউথ পার্ক স্ট্রীটে সুপ্রীম মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে নিয়ে চলুন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার—উদয়ের কথা মত সাউথ পার্ক স্ট্রীটের দিকে ছুটে চলল। এই পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে উদয় সুপ্রীম মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে পৌঁছে গেল।

উদয় ট্যাকসি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, ওর লাগেজ নিয়ে সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে গিয়ে বলল—আমি উদয় চ্যাটার্জি। ব্যাংলোর থেকে এসেছি। আমার নামে একুশ নম্বর রুম এ্যালোট হয়েছে, এই তার রসিদ, এই বলে একটা কাগজ দেখালো। সেই সুপারিনটেনডেণ্ট উদয়কে একটা চাবি দিয়ে বললেন—এই চাবি দিয়ে ওই ঘরের তালা খুলে, তোমার লাগেজ নিয়ে, গুছিয়ে নেও। আর আজ থেকেই এই হোস্টেলের ক্যানটিনে খাবে।

এই কথা শুনে চাবি নিয়ে উদয় লাগেজ নিয়ে ওর ঘ:র চলে গেল। উদয় দেখল—একুশ নম্বর রুম দোতলায়, চাবি দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকে ঘরের অবস্থা থেকে নিরাশ হোলো। একটা লোহার খাট পাতা, একটা লোহার চেয়ার ও একটা লোহার টেবিল। লোহার খাটের উপর ছোবড়ার গদি পাতা। একটা জানালা রয়েছে, উদয় জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে মনে মনে বলল—বাইরের দৃশ্য ভালই, জানালার ঠিক নিচে একটা সরু রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তার পাশেই একটা বড় পার্ক। এই দৃশ্য দেখে উদয়ের মন অনেক ভাল হয়ে গেল।

স্নান সেরে এই বারটা নাগাদ ক্যানটিনে খেতে গিয়ে উদয় দেখল সব ছেলেরা হৈ-চৈ করে খাচ্ছে। কোন ডিসিপ্লিন নাই। উদয় তো একেবারে নতুন। কারোর সাথে এখনো আলাপ হয় নি. তাই একা চুপ করে খেতে বসে গেল। খেতে বসে দেখল একেবারে বাঙালী খাবার। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল আর তরকারি। ও দেখল সব ছেলেরা ডবল ডবল চেয়ে নিয়ে খাচ্ছে, ওই ক্যানটিনের কুক্ হোল উড়ে ঠাকুর। উদয়কে নতুন ছেলে দেখে তার কাছে এসে বলল—ও দাদাবাবু আপনি তো আর কিছু নিলেন না? লজ্জা

করলে কিন্তু আপনার পেট ভরবে না। এখানে সবাই যার যা লাগে চেয়ে নেয়। এই বলে ঠাকুর আরেক হাতা ভাত ও আরেক টুকরো মাছ ও মাছের ঝোল উদয়ের থালাতে দিয়ে চলে গেল।

উদয় খাওয়া সেরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ড্রাইভারকে বলল—আমাকে ভাল বিছানার দোকানে নিয়ে চলুন সেই ট্যাকসি উদয়কে নিয়ে চাঁদনি চকের একটা বেশ নাম করা বিছানার দোকানে নিয়ে গেল।

উদয়—ট্যাক্সি থেকে নেমে, ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলে সেই বিছানার দোকানে ঢুকে একটা দামি সিন্‌গেল তোষক, দুটো বালিস আর হাফ ৬জন বিছানার চাদর কিনল। আর টেবিলের উপর পাতার জন্য দুটো টেবিল ক্লথ কিনে আবার সেই ট্যাকসি কোরে হোস্টেলে ফিরে এলো।

উদয় এই সব জিনিষ এনে তার বিছানা ভাল করে পেতে নিল এবং রুমটা ভাল করে সাজাল। ব্যাংলোর থেকে আসবার সময় উদয় যিশুর একটি ফটো নিয়ে এসেছিল। সেই ফটোটা টেবিলের উপর দেয়ালে টাঙিয়ে দিল।

বিকেলে টিফিন খেতে উদয় আবার ক্যানটিনে গিয়ে দেখল অনেক ছেলেরা গোল হয়ে বসে খাচ্ছে, উদয়ও চা ও স্যানক্স্ নিয়ে এক কোণে বসে পড়ল। উদয় একাই বসে চা খাচ্ছিল। দুটো ছেলে ওর কাছে গিয়ে বসল, ওই ছেলে দুটি উদয়কে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এ বছর নতুন ভর্ত্তি হয়েছ? উদয় বলল—হাঁ ভাই। তারপর ছেলে দুটি বলল—আমার নাম সুখেন দাস আর ওর নাম অনিমেস বাসু। আমরাও এ বছর নতুন ভর্ত্তি হয়েছি। আমরা থাকি রুম নম্বর ষোল, একতলাতে। উদয় বলল—আমার নাম উদয় চ্যাটার্জি। আমি দোতলায় একুশ নম্বর রুমে থাকি। ওরা জিজ্ঞেস করল—তুমি কি একা একটা ঘরে থাক? উদয় বলল

হাঁ ভাই, আমি একটা ঘরে থাকি, আর আজই এসেছি। চা খেয়ে চল আমার রুমে, আমরা সেখানে বসে গল্প কোরব।

ওরা তিন জনে চা খেয়ে—উদয়ের সাথে উদয়ের ঘরে গিয়ে, ওরা উদয়ের ঘর সাজানো দেখে বলল—বাঃ এর মধ্যে তুমি তো তোমার ঘর খুব সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছ ?

উদয় বলল—ভাই, এতো ছোট ঘর আমাকে দিয়েছ, আমি আর ভাল কোরে সাজাতে পারলাম কোথায় ? আর একটু বড় ঘর পেলে, একটু ভাল কোরে সাজিয়ে নিতুম। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমার সব মিউজিক্যাল ইনসট্রুমেণ্ট কিনে রাখব কোথায় ? আর রেয়াজই কোরব কোথায় বসে ?

ওই ছেলে দুটির উদয়ের কথা কানেই গেল না। ওরা ওদের দুঃখের কথা বলতে লাগল—আমরা এই তিন দিন হোলো এসেছি, এই তিন দিনেই আমাদের প্রাণ অষ্টাগত। দিনের বেলা কোনমতে গড়িয়ে যাব, কিন্তু রাতের কথা মনে হলে শরীরে কাঁপুনি ওঠে। ওরা বলল—তুমি আজ রাত্রেই টের পাবে, এই বোলে ওদের দু-জনের একজন গাল দেখাল। উদয় তাকিয়ে দেখল—সেই ছেলেটির গালে, জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, তার ক্ষত-চিহ্ন।

ওই ছেলে দুটি এই বলে চলে গেলে—উদয় ভাই, আজ রাতে একটু সাবধানে থেকো। প্রথম দিনের রাত্রে এখানকার সিনিয়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে একটু বেশী অত্যাচার করে।

ওখানকার—হোস্টেলের নিয়ম ডিনার রাত আটটা থেকে সুরু হয়, আর সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। উদয় রাত নটার মধ্যেই ডিনার খেয়ে—ওর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করল না।

উদয় ভাবল—এখানকার ছেলেরা তো সবাই ভাল ফ্যামিলি থেকে এসেছে ডাক্তারি পড়তে, কাজেই এদের কাছ থেকে কোন অভদ্রচিত ব্যবহার আশা করা যায় না।

উদয় আলো জ্বেলে ওর বিছনায় শুয়েছিল, ঘুম আসছিল না। খালি অপেক্ষা করছিল কখন ছেলের দল ওকে র‍্যাগিং করতে আসবে।

রাত এগারটার পর একদল ছেলে উদয়ের ঘরে ঢুকে দেখল— উদয় চোখ মেলে শুয়ে আছে, উদয় ওদেরকে দেখে বিছানায় উঠে বসল।

ওই ছেলের দল বলল—তোমার তো সাহস দেখছি খুবই বেশী; এতো রাত্রে দরজা খুলে, আলো জ্বালিয়ে শুয়ে আছ?

উদয় বলল—তোমরা আমার ঘরে এত রাত্রে আসবে, তাই জেনে কী করে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকব।

ওই ছেলেগুলি ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল—আসতে না আসতেই আমাদের মত সিনিয়ার ছেলেদেরকে বোলছ—তুমি?—তোমরা? এখন আমাদেরকে স্যার বলবে।

ওই ছেলেদের মধ্যে যে দলপতি সে বলল—এই ছেলেটা কোত্থেকে এসেছে? এখনও কিছু ম্যানার শেখেনি। চলো একে নিয়ে আজ কিছু ম্যানার শেখাবো। কীভাবে সিনিয়ার স্টুডেন্টদের সাথে কথা বোলতে হয়। দলপতির এই কথার সাথে সাথে ছেলেরা উদয়কে চ্যাংদোলা করে ওর ঘর থেকে বের কোরে নিয়ে এলো।

উদয়কে নিয়ে এসে একটা হল ঘরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে—ওর শরীরের উপর অত্যাচার কোরতে উদ্যত হোলো।

উদয় এতোদিন মিশনারীতে মানুষ হয়েছে, তাই ওর যিশুর উপর অগাধ বিশ্বাস। উদয় চোখ বুজে আস্তে আস্তে বলল—ও, গড্, সেভ্ মি, আমি তো এদের কারোর কোন ক্ষতি করিনি?

তখনই উদয়ের মনে একটা গান এসে গেল, ওর মনে হোলো যিশুই ওকে বললেন—উদয়, তুমি এই গানটা গাও—

উদয় চোখ বুজে গান সুরু কোরল।

তোমরা আমায় মারবে বোলে—
ভয়, লাজ সব ত্যাগ কোরে
বসে আছি আমি
ওগো মার খাবার তরে।
চলে এসো ভাই সব
মারো আমায় প্রাণ ভরে
বসে আছি আমি
তোমাদের মার খাবার তরে।

সব ছেলেরা দেখল উদয় চোখ বুজে গান গেয়ে যাচ্ছে আর তার নয়নের দু-ধার দিয়ে অশ্রুবারি বেয়ে পড়ছে।

দলপতি ছেলেদেরকে বলল—কাকে ধরে নিয়ে এসেছো? এতো দেখছি হেমন্তকুমার! কী গান আর কী সুর! একে আর কোনদিন র‍্যাগিং করবে না। যাও ওকে ওর ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো।

দলপতি উদয়ের সাথে করমর্দন করে বলল—আজ থেকে তুমি আমার ছোট ভাই। নিশ্চিন্তে এখানে থাকবে। তোমার যে কোন অসুবিধা হলে, বলবে আমি দেখব, এই কথা বলে দলপতি চলে গেল, উদয় ওর ঘরে চলে এলো।

উদয়য় দরজা বন্ধ করে যিশুর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে বলল—ও গড! তোমার অপার করুণা, আজ তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে যেভাবে রক্ষা করলে, এ তোমারই করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে গাড় নিদ্রামগ্ন হলো।

সেইদিন থেকে উদয় ওই কলেজে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করতে লাগলো, আর কোনদিন কোনকিছু ঘটনা ঘটেনি। দিন দিন ওর অমায়িক ব্যবহারে এবং মেধাবী ছাত্র হিসাবে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো।

আর উদয়ের গানের রেওয়াজ শুনে, ওর গানের সুনাম দিন দিন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রত্যেক বছর ওই কলেজে বার্ষিকী

উৎসব উদ্‌যাপনের দিন উদয়ের সঙ্গীত একটা প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ালো।

এইভাবে যশে, সুনামে ওই কলেজে উদয়ের দিন, মাস, বছর গড়িয়ে যেতে লাগলো।

* * *

মিষ্টার ভার্মার নির্দেশে বিপিন ভাই মিঠুনকে ইংরাজী, বাংলা এবং হিন্দী এই তিন ভাষাতে উপযুক্ত শিক্ষক রেখে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেছিলেন। এই তিন ভাষাতেই মিঠুনের দক্ষতা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। এই তিন ভাষাতেই অনর্গল কথা বলতে শিখলো। ইংরাজী মাধ্যমে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে মিঠুন শীর্ষস্থান অধিকার করল।

মিঠুনের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতেই বিপিন ভাই মিষ্টার ভার্মাকে মিঠুন স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সেই খবর জানালেন।

মিষ্টার ভার্মা বিপিন ভাইকে বললেন—আমি মিসেসকে নিয়ে কাল বিকেল সাতটায় আপনাদের ওখানে যাব। এত ভাল সুখবর, মিঠুনকে কনগ্র্যাচুলেশন দিতে হবে তো? এটা আপনাদেরও একটা বিরাট দক্ষতা। আপনারা মিঠুনকে সুশিক্ষিত করার সুব্যবস্থা করেছিলেন, আর সেই সঙ্গে মিঠুনের গান এবং নাচও দেখব।

পরের দিন ঠিক বিকেল সাতটায় মিষ্টার এবং মিসেস্ ভার্মা বিপিন ভাইয়ের হোমে চলে এলেন। বিপিন ভাই গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মিষ্টার ও মিসেস ভার্মাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এলেন। এইরকম সম্মানিত ব্যক্তিদের বসবার জন্য আলাদা চেয়ারের বন্দবস্ত ছিল, তাঁরা সেই চেয়ারে উপবেশন করলেন।

একটু বাদে সুষমাদেবী মিঠুনকে মিষ্টার এবং মিসেস ভার্মার কাছে নিয়ে এসে বললেন—এই তোমার রাজা দাদাজী এবং দিদুস—তুমি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছো শুনে—তোমাকে কনগ্র্যাচুলেশন করতে এসেছেন। তুমি রাজা দাদাজী এবং দিদুসকে প্রণাম কর।

মিঠুন অমনি মিষ্টার এবং মিসেস ভার্মাকে প্রণাম করল, ওরা দুজনেই মিঠুনকে আদর কোরল। মিসেস (ভার্মা) একটা নেকলেসের বাক্স থেকে একটা দামী নেকলেস বের করে মিঠুনের গলায় পরিয়ে দিলেন।

মিষ্টার ভার্মা মিঠুনকে বললেন—এইবার তুমি গান শোনাও।

মিঠুন গান গাওয়ার জন্য নিচে ফরাস পাতা ছিল সেখানে গিয়ে বসল। মিঠুনের গানের শিক্ষক বেলাদি, তিনিও সেখানে গিয়ে বসলেন।

মিঠুন হারমনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে লাগলো—

আমি গাইব সে গান
ওগো ব্যথিত হৃদয়ে
যে গান শুনবে
সবাই প্রাণ ভোরে
যে গানে আছে
প্রেম ভালবাসা
তাই দিয়ে গড়ব আমি
আমার মর্ম কথা।

মিঠুনের গান গাইতে গাইতে নয়ন সজল হয়ে উঠল। এবং সেখানকার পরিবেশ ব্যথার সুরে ভরে উঠল।

মিষ্টার ভার্মা মিঠুনের গান থামিয়ে দিয়ে বললেন—আজ তোমার একটা আনন্দের দিন। তোমার গানে আজ দুঃখের সুর থাকবে কেন? এই বয়েসে সব সময়ে আনন্দের গান গাইবে।

বিপিন ভাইকে মিষ্টার ভার্মা বললেন—ওর গানের শিক্ষিকাকে একটু আজকালকার মডার্ন আধুনিক গান শেখাতে বলবেন। আর গলার স্বর একটু আস্তে কোমল করে জিজ্ঞেস করলেন—মিঠুনের এখন বয়স কত হলো।

বিপিন ভাই বললেন—এই তের থেকে চোদ্দতে পড়েছে। সেই কথা শুনে মিষ্টার ভার্মা মনে মনে ভাবলেন—তাহলে মিঠুন এখনো বেশ মাইনর, তারপর বিপিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—মিঠুন যখন মেধাবা হোয়েছে, তখন ও যে বিষয় নিয়ে পড়তে চায়, তাই ওকে পড়বার ব্যবস্থা করবেন। ওর অমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আরও চার পাঁচ বছর পড়ান। তারপর মিষ্টার ও মিসেস ভার্মা স্মিতহাস্যে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন আমরা যাচ্ছি, থ্যাঙ্কস—এই বোলে ওরা চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর মিঠুন দাদাজীকে নিয়ে লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজে ভর্ত্তি হয়ে এলো। মিঠুন খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগল। দু-বছর পরে সাইনস নিয়ে কৃতিত্তের সাথে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করল।

ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে মিঠুন ওর দাদাজী এবং দিদাজীকে বলল—আমার ইচ্ছে, আমি বড় হলে লেডি ডাক্তার হবো। আমি তো সাইনস নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট ভাল ভাবে পাশ করেছি। আমার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার কোন বাধা নেই। আমি মেডিকেল কলেজে পড়ব।

এই রকম জোরালো কথা শুনে সুষমাদেবী মিঠুনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—মিঠুনের আর সেই কৈশোরের চপলতা নেই, মনে হলো মিঠুনের ব্যক্তিত্বে একটা পরিবর্তন এসেছে এবং মিঠুনের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য ভাব ফুটে উঠেছে। এই পরিবর্তন লক্ষ করলেন সুষমাদেবী।

মিঠুনের এই কথা শুনে ওরা বললেন এই তো সবে রেজাল্ট

বেরুল, তুই একটা দিন একটু অপেক্ষা কর। এই কথা শুনে মিঠুন মুখ ভার করে ওঁদের কাছ থেকে ওর ঘরে চলে গেল।

সুষমাদেবী বিপিন ভাইকে বললেন—দেখেছ? মিঠুন এখন মেডিকেল লাইনে পড়তে চাইছে। মিষ্টার ভার্মার অনুমতি ছাড়া তো হোতে পারে না। মিষ্টার ভার্মা কিছুতেই অনুমতি দেবেন না। শুনলে রেগে যাবেন।

সুষমাদেবীর কথা শুনে বিপিন ভাই বললেন—মিঠুনের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ভাল রেজাল্ট শুনে মিষ্টার ভার্মা সেদিন মিঠুনকে কনগ্র্যাচুলেশন করতে এসেছিলেন, সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—মিঠুনের কত বয়স? আমি উত্তর দিয়েছিলাম—এই তের বছর থেকে চৌদ্দ বছরে পড়েছে। তাই শুনে তিনি বলেছিলেন আরও চার পাঁচ বছর ওকে পড়ান। ও যা পড়তে চাইবে তাই পড়াবেন। ওর অমতে কিছু কোরবেন না। কাজেই ও ডাক্তারি পড়তে চাইছে, ওকে ডাক্তারি পড়তে দাও।

সুষমাদেবী বললেন—মিষ্টার ভার্মাতো বলেছিলেন, আরও চার-পাঁচ বছর পড়াতে। এই চার-পাঁচ বছরের দু-বছর তো কেটে গেল, আর রইলো মাত্র তিন বছর, এই তিন বছরে তো ডাক্তারী পড়া হবে না।

বিপিন ভাই বললেন—মিঠুন যখন গোঁ ধরেছে ডাক্তারী পড়বে, ওকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দাও, এই তিন বছর তো পড়ুক, তারপর দেখা যাবে।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিঠুন মুখ গোমরা করে বসে খাচ্ছিল, তাই দেখে বিপিন ভাই বললেন—তুমি ব্রেকফাষ্ট খেয়ে রেডি হয়ে নাও। তোমাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে নিয়ে যাবো।

এই কথা শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ওর দাদাজীর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে দৌড়ে ওর ঘরে চলে গেল রেডি হয়ে আসতে।

অল্প সময় পরে বিপিন ভাই মিঠুনকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বম্বেতে একটা মেডিকেল কলেজে একটা সিট্ খালি পেয়ে গেলেন। আর দেরী না কোরে সেই দিনই মিঠুনকে সেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিলেন।

বাড়ীতে ফিরে এসে মিঠুনের কী আনন্দ। মিঠুনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হতে চলেছে। মিঠুন ভাবছে আর ক-বছর বাদে আমি লেডি ডাক্তার হবো, কিন্তু মিঠুন তখন জানেনা এবং ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেনি তার ভাগ্যলিপিতে কত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে।

মিঠুন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে খুব সিরিয়াসলি লেখা পড়া করতে লাগল। দাদাজীর হোম থেকেই মেডিকেল কলেজে যাতায়াত করতে লাগলো আর সন্ধ্যার পর গান ও নাচের তালিম দিতে লাগলো।

মিঠুনদের মেডিকেল কলেজের বার্ষিকী উৎসব উদযাপনের দিনে সবাই মিঠুনের গান ও নাচ দেখবার জন্য আগ্রহ-সহকারে অপেক্ষা করতো। ওই কলেজের অনেক ছেলেরা মিঠুনকে হিরোয়িন বলে ডাকতো, তাতে মিঠুন রাগ কোরত না। ও যোক্ মনে করে কোন গুরুত্ব দিতো না। ওই কলেজের কয়েকটি ছেলে শান্তাকুমার, বিদেশকুমার আরও কয়েকটি সঙ্গতিপন্ন পরিবারের ছেলেরা তার প্রতি একটু বেশী আগ্রহ প্রকাশ কোরত। মিঠুন অনেকবার লক্ষ্য করেছে দূর থেকে একদৃষ্টে তাকিয় আছে, চোখে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে —কাছাকাছি থাকলে লুকিয়ে তাকাচ্ছে আড়চোখে। তার একটা দুটো কথাতে ওদের পুলকের শিহরণ জাগে! আরও লক্ষ্য করছে তাদের চোখে কামনার অনুভূতি, তারা তার প্রতি অনুরক্ত!

এই যে ছেলেরা তার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করছে এতে মিঠুন একটা নতুন আনন্দ অনুভব করতে শিখলো! নিজের একটা সত্ত্বার উপলব্ধি এলো তার মনে কিন্তু মিঠুনের ব্যবহারে এবং চালচলনে ওই ছেলেরা নিরাশ হোলো!

এইভাবে মিঠুনের দিন, মাস বছর গড়িয়ে যেতে লাগল।

*   *   *   *

এই বছর উদয় ওর মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারে উঠল। ও প্রতি বছর পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে পাশ করছে।

উদয়ের বাথরুমে স্নান করবার একটা সময় ধার্য ছিল। প্রতিদিন ঠিক ওই সময় উদয় বাথরুমে ঢুকতো স্নান করবার জন্য। ও কল ছেড়ে দিয়ে ভুলে যেত স্নান করবার জন্য বাথরুমে ঢুকেছে। ও ভুলে গিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইত একটার পর একটা। সব ছেলেরা উদয়ের গান শোনার জন্য আগ্রহ সহকারে বাইরে দাড়িয়ে থাকতো। দশ-বারটা গান গাইবার পর উদয়ের খেয়াল হতো—আরে আমি তো স্নান করতে ঢুকেছি? আরো তো অনেক ছেলের স্নান করতে বাকি আছে? এইভেবে উদয় তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নান সেরে বাইরে বেরিয়ে আসতো। উদয়ের গান শেষ হলেই সব ছেলেরা চলে যেত। উদয়কে কোন সময়ে বিরক্ত করত না, এটাই ছিল উদয়ের একটা দৈনিক অভ্যাস।

সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্ররা ত্রিবার্ষিকী উৎসব উদযাপন করে, প্রত্যেক তিন বছর অন্তর। এই বছর হলো সে উৎসব উদযাপনের বৎসর। এই উৎসবে সঙ্গীত, নৃত্ত, কবিতা পাঠ হাস্য-কৌতুক, ইনডোর গেমস হয়। খালি সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্রেরা এই উৎসবে যোগদান করতে পারে। প্রত্যেক মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নই ঠিক করবে, কারা এই উৎসবে যোগদান করবে। যারা সঙ্গীত, নৃত্ত, স্পোর্টসে পারদর্শি তারা তো যোগদান করবেই, আর যারা যোগদান করবে তাদেরকে ঠিক করবে ছাত্র-ইউনিয়ন।

আগের বার এই ত্রিবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীনগর শহরে। এই বছর এই উৎসব কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেই জায়গা

ঠিক করবার জন্য বম্বেতে সব মেডিকেল ছাত্র-ইউনিয়ন নেতারা একটি বৈঠকে বসবেন। ইউনিয়নের সব নেতারা সেই বৈঠকে যোগদান করবার জন্য বম্বেতে রওনা হয়ে গিয়েছেন।

এই কয়েকদিন হলো সুপ্রীম মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ইউনিয়নের নেতাদ্বয়, তাপস সেন ও রুদ্র গুপ্ত বম্বেতে বৈঠকে যোগদান করে ফিরে এলেন। পরের দিনই এই মেডিকেল কলেজের সব ছাত্রদের একটা সভা ডেকে তাপস সেন ও রুদ্র গুপ্ত বললেন—এবার সর্ব ভারতীয় মেডিকেল ছাত্রদের ত্রিবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হবে আমাদের এই কলকাতায়। কাজেই আমাদের এখানকার মেডিকেল কলেজগুলির দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্রদের এবং ছাত্রীদের থাকার সুবন্দবস্ত করতে হবে। এই উৎসব চলবে সাতদিন ধরে। এই সামনের মাসের বিশ তারিখে এই উৎসব উদযাপনের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। আমাদের স্বনাম-ধন্য ডক্টর সোমেন মিত্র সকাল নটায় এই উৎসব উদবোধন করবেন। আপনারা কে কে এই উৎসবে যোগদান করতে চান, আমাদের ইউনিয়ন অফিসে লিখিতভাবে জানাবেন। আজ এই পর্যন্ত শেষ. এই বলে সেদিনকার সভা সমাপ্তি হলো।

মেডিকেল ছাত্রদের এই ত্রিবার্ষিকী উৎসবের খবর সারা ভারতের মেডিকেল কলেজগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। সব মেডিকেল ছাত্রদের নাম বাছাই সুরু হয়ে গেল। এই উৎসবের গান, নাচ, কবিতা পাঠ, ইনডোর গেমস্ সব কিছুতেই একটা প্রতিযোগিতা হয়। কৃতী, ছাত্র, ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

এদিকে কলকাতার সব কলেজের মেডিকেল ছাত্র-ইউনিয়ন নেতারা একবাক্যে তাপস সেন ও রুদ্র গুপ্তের উপর সব ভার দিয়ে বললেন—আপনাদের চেষ্টায় এবার এই উৎসব কলকাতায় উদযাপিত হতে যাচ্ছে, আপনারাই এখানকার—সাইট ঠিক করে সর্ব-ভারতের মেডিকেল কলেজগুলোকে সব কিছু জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা

করুন এবং এখানকার—মেডিকেল কলেজগুলিকেও সময় করে জানিয়ে দেবেন। আমাদের কোন কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আমাদেরকে জানালে আমরা সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। এই বলে সব মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের নেতারা চলে গেলেন।

তাপস সেন রুদ্র গুপ্তকে বলল—চলো কোন কাফেতে গিয়ে একটু রিলাকস্ করি, এই বলে ওরা নিরালা কাফেতে গিয়ে বসল।

তাপস বলল—আমাদের উপর একটা বিরাট দায়ীত্ব পড়ল। আমরা যেরকম ফাইট করে কলকাতায় এই উৎসব উদযাপন করার জন্য ওই কমিটিকে দিয়ে সিদ্ধান্ত করিয়েছি, তাতে কলকাতার সুনাম, আমাদের সুনাম যাতে থাকে সেই ভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

রুদ্র গুপ্ত দ্বীপ্তকণ্ঠে বলল—নিশ্চয়ই, আমাদের সুনাম রাখতেই হবে। তুই আমার উপর সব ছেড়ে দে। দু-একদিনের মধ্যে আমাদের পার্টিতে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলব।

তাপস সেন বলল—রুদ্র তোর কথা শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তোর তো আবার পার্টি-অফিসে সব নেতাদের সাথেই যোগাযোগ আছে। তুই তাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা ভাল সাইট সিলেক্ট কর। এটা হলো তোর আমার নয়, সর্বভারতীয় ব্যাপার এবং কলকাতার সুনাম।

রুদ্র বলল—এসম্বন্ধে আমি খুব সচেতন। আমি আমাদের পার্টির নেতাদের সাথে আলোচনা করে দু-একদিনের মধ্যে সব ফাইনাল করে ফেলব। তাপস, তুই ঠিক কর আমাদের কলেজের কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীরা এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে।

আমি এখন যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের ক্যাডারদের একটা সিক্রেট মিটিং আছে, এই বলে রুদ্র গুপ্ত বাই বাই বলে চলে গেল।

রুদ্র গুপ্ত ওদের পাটির লোকদের সাথে অনেকগুলো বাড়ি দেখল, কিন্তু কোন বাড়িই তার পছন্দ হলো না। অবশেষে একটা বাড়ি দেখে রুদ্রের খুব পছন্দ হলো। মনে মনে বলল—এই সাইট যে দেখবে তারই পছন্দ হবে। আর কাউকে কিছু না বলে পরের দিন সকালে রুদ্র তাপসকে সেই সাইট দেখাতে নিয়ে গেল।

তাপস দেখেই বললো—বাঃ! কলকাতা শহর থেকে এই উপকণ্ঠে ভালই হয়েছে। সামনে অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের পাশ দিয়ে—গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে কলস্বরে। তাপস গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল জাহাজ যাতায়াত করছে, এপার থেকে ওপার দেখা যায়, কিন্তু বহু দূর। দক্ষিণা বাতাস সোঁ-সোঁ করে বইছে। গঙ্গার বড় বড় ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। তাপস মনে মনে ভাবল ভাল সাঁতারুও এত বড় এবং গভীর গঙ্গা ও ঢেউ দেখে সাঁতার কাটতে গঙ্গায় নামতে সাহস করবে না। তার থেকে পুরীর সমুদ্রে নেমে সাঁতার কাটতে সাহস পাবে।

রুদ্র ও তাপস ঘুরে ঘুরে বিরাট কমপাউণ্ড নিয়ে বাড়িটি দেখল। সেই কমপাউণ্ডের চারিদিকে ইটের বাউণ্ডারি ওয়ালের বদলে হেজ্ দিয়ে বাউণ্ডারি ওয়াল করা রয়েছে। হেজের বাউণ্ডারি ওয়াল দেখা যেত আগের দিনে ইংরেজ সাহেবদের বাড়িতে এবং বড় বড় জমিদারদের বাড়িতে। এটা একরকম কাঁটাগাছের ঝাড়। দু-ফুট, আড়াই-ফুট উঁচু কাঁটা লতাপাতাতে ঘেরা হয়ে থাকে, তবে সপ্তাহে একদিন মালি গাছগুলির পাতা, ডাল প্লেন করে কেটে সমতল করে রাখতে হয়, যাতে কোন যায়গা উঁচু-নিচু না দেখা যায়। খালি বাউণ্ডারি ওয়াল হেজ দিয়ে ঘেরা নয়, আরও অনেকগুলি রাস্তা আছে—দুটো রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিংএ যাবার রাস্তা। স্টেজ হলে যাবার রাস্তা। বিরাট ডাইনিং হল আছে। সেই ডাইনিং হলে যাবার রাস্তা, প্রত্যেক বিল্ডিং এবং হলের সামনে গেট রয়েছে। সেই সব বিল্ডিং এবং হলে সেই গেটের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এই

সব রাস্তার বাউণ্ডারি ওয়াল এবং গেট হেজ দিয়ে তৈরী। সেই গেটগুলির হেজ লাল, সাদা, নীল লতা ফুলে ঢাকা।

রুদ্র বলল—একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ? এই হেজগুলো লাল, নীল, ও অন্য রঙের ইলেকট্রিক বাতিতে ভরে রয়েছে। রাত্রে যখন এই বাতিগুলো জ্বলবে তখন কি অপূর্ব দেখাবে? দেখছ? দুটো তিন তলা বিল্ডিং পাশাপাশি রয়েছে। চল, গিয়ে দেখি, এই দুটো বিল্ডিংএ কত লোক থাকতে পারবে।

তাপস ও রুদ্র বিল্ডিং দুটো দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করল। ওরা স্থির করল—একটাতে থাকবে ছাত্রদের দল, আরেকটাতে থাকবে ছাত্রীদের দল। যারা এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে তারা তো থাকবেই, আর যারা দেখতে আসবে তারাও কিছু থাকতে পারবে। তারপর যদি এই বিল্ডিংএ না কুলয়, বাদ বাকি ছাত্র এবং ছাত্রীরা আমাদের কলকাতায় মেডিকেল হস্টেলগুলিতে থাকবে, কোন অসুবিধা হবে না।

তাপস বলল—রুদ্র, তুমি আজই এই প্রাসাদের মালিকের সাথে কথা বলে ফাইনাল করে ফেল।

রুদ্র বলল—আগে বৃটিশের রাজত্বের সময়ে এই প্রাসাদের মালিক ছিলেন রায় বাহাদুর উমাশংকর। তারপর আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই জমীদারেরও জমীদারি চলে গেল। এই প্রাসাদের মালিক এখন একজন ধনী মাড়োয়ারী। এই মালিকের পূর্বপুরুষ কয়েক লাখ টাকা দিয়ে এই প্রাসাদ কিনেছিলেন, সেই থেকে এরা এই প্রাসাদ ভালভাবে মেনটেন করছেন। এই মালিক সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্রদের উৎসব হবে জেনে দু-সপ্তাহের জন্য এই প্রাসাদ আমাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন, কোন টাকা নেবেন না।

চল তাপস, হলঘরটা দেখবি, এই বলে রুদ্র তাপসকে হলঘরে নিয়ে গেল। তাপস দেখল একটা বিরাট হল ঘর। বড়

সিনেমা হলের মত হল ও স্টেজ। দর্শকদের জন্য সুন্দর করে চেয়ার সাজিয়ে পাতা রয়েছে। কলকাতায় আধুনিক থিয়েটার হলের মত আলো ফোকাসের সুব্যবস্থা রয়েছে।

তারপর রুদ্র তাপসকে বলল—চল, এবার তোকে দেখাব আরেকটা হলঘর, যেখানে বিশিষ্ট মাননীয় অতিথি-অভ্যাগতদেরকে অভ্যর্থনা করে এনে বসান হয়।

তাপস রুদ্রের সাথে সেই হলঘরে ঢুকবার সিঁড়ির ধাপগুলি দেখে অবাক, বিস্মিতকণ্ঠে বলল—দেখেছ? সিঁড়ির ধাপগুলি? এযে একেবারে আমাদের রাজভবনের লম্বা লম্বা চওড়া চওড়া সিঁড়ির ধাপের মত। চল ভিতরে যাই, এই বলে রুদ্র তাপসকে সেই হলঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। তাপস দেখল—সারি সারি ভেলভেটের সোফায় সাজানো রয়েছে আর উপরে ঝাড়বাতির আলোতে ঝলমল করছে।

তাপস বলল—সেই জমিদার রায়বাহাদুর উমাশংকর যাঁর এই প্রাসাদ ছিল তাঁর সৌন্দর্য্যবোধের ভূয়সী প্রশংসা করছি। আর এখন যে মালিক হয়েছেন তাকেও প্রশংসা করছি যে তিনি এইভাবে সুন্দর করে এই প্রাসাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন।

রুদ্র বলল—এই প্রাসাদে সব রকম স্টাফ রয়েছে। আমাদের যত লোকই আসুক, তাদের খাদ্যের এবং পরিবেশনের ব্যবস্থা এরাই করবে। খালি খাদ্যের ব্যাপারে যা ব্যয় হবে তাই আমাদের দিতে হবে। এরা সব সময় এখানে থাকবে এবং দেখবে যাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়।

তাপস বলল—এ রকম ভাল যায়গা, আর এত সুব্যবস্থা আর কোথায় পাওয়া যাবে? কালই সব মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের জানিয়ে দেব এই প্রাসাদের ঠিকানা দিয়ে। আমাদের উৎসব তো এই মাসের বিশ তারিখে, আর তো মাত্র দু-সপ্তাহ সময় আছে। সব দেখে, সেইদিনই ওই প্রাসাদের কেয়ার-

টেকারের সাথে ফাইনাল কথাবার্তা বলে তাপসও রুদ্র হস্টেলে ফিরে এলো।

ওরা দুজনে হস্টেলে ফিরে এসে রাত্রে ডিনার খেয়ে, বসে গেল চিঠি লিখতে, ভারতের সব মেডিকেল কলেজগুলির লিস্ট বের করে। প্রত্যেক মেডিকেল কলেজ ইউনিয়ানের সম্পাদককে লিখল এই উৎসব যেখানে অনুষ্ঠিত হবে তার ঠিকানা দিয়ে এবং সেখানে পৌঁছবার রাস্তার ম্যাপও দিল, আরও লিখল—এই উৎসব উদযাপিত হবে বিশ তারিখে, কাজেই যারা এই উৎসবে প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করবে তাদের একদিন আগে অর্থাৎ উনিশ তারিখের মধ্যে আসা চাই, এবং তাদের নাম, কলেজের নাম, কি বিষয়ে অংশ-গ্রহণ করবে পরিষ্কার করে আগেই লিখে পাঠাবার জন্য।

ওদের দুজনের সব চিঠি লিখতে রাত কাবার হয়ে গেল। নির্মল আকাশ পরিষ্কার হয়ে স্নিগ্ধ রোদ নেমে এলো, কিন্তু ওরা সে রকম ক্লান্তি অনুভব করল না। হাত, মুখ ধুয়ে চলে গেল নিকটেই একটা ছোট কাফেতে। সেখান থেকে চা খেয়ে আবার হস্টেলে ফিরে এলো। চিঠিগুলো সর্বভারতীয় মেডিকেল কলেজের—লিস্ট দেখে মিলিয়ে দেখতে লাগল, যাতে কোন নাম বাদ না পড়ে যায়। যখন দেখল সব ঠিক্ হয়েছে, তখন ব্যাগের মধ্যে সব চিঠিগুলি ভরে ক্যানটিনে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে জি-পি-ওতে চলে গেল। সেখানে সব চিঠিতে স্ট্যাম্প্ লাগিয়ে পোষ্ট করে দিল।

তারপর দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—আমাদের আপাতত কাজ শেষ। এখন আমরা আমাদের কলেজের এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের লিস্ট তৈরি করব যাতে আমাদের কলেজ থেকে কোন একটা বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে।

তাপস রুদ্রকে বলল—দেখ, তুই ছাড়া আমাদের এই উৎসবের জন্য এই রাজপ্রাসাদ কেউ ঠিক করতে পারতো না। আমাকে আর

সব যায়গায় টেনে নিয়ে যাস না। তুই সব ঠিক করে ফেল। যখন অসুবিধা মনে করবি তখন ডাকবি। আবৃত্তিতে কে বিচারক হবেন, নাচে কে বিচারক হবেন, গানে কে বিচারক হবেন, ইনডোর গেমসে কে বিকারক হবেন? তুই সব স্বনামধন্য, যসস্বী মনীষীদের কাছে গিয়ে বিচারক হবার প্রস্তাব জানাও। আমাদের এই সর্ব-ভারতীয় মেডিকেল ছাত্রদের উৎসবের কথা শুনলে, ওই সম্মানীত-ব্যক্তিগণ বিচারক হতে রাজি হবেন। ঠিক আছে রুদ্র এইসব যসস্বী মনীষীদের কাছে আমিও তোর সাথে যাব। একা একা এই মাননীয় ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া ভাল দেখায় না।

দু-তিন দিনের মধ্যে তাপস সেন ও রুদ্র গুপ্ত স্বনামধন্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দুজন করে বিচারক ঠিক করে ফেলল।

সাত দিনের ভিতর সুপ্রীম মেডিকেল ছাত্র-ইউনিয়নের সম্পাদকের লেটার বক্স ভরে যেতে লাগল সর্বভারতীয় মেডিকেল কলেজগুলি থেকে আসা চিঠিতে।

তাপস ও রুদ্র তাদের সাহায্যের জন্য আরও দুজন ছেলে ওদের ইউনিয়ন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে নিয়ে ফাইনাল সব চার্ট তৈরি করতে লেগে গেল। উৎসবের প্রতিযোগিতায় কে কে অংশ গ্রহণ করবে তাদের আলাদা লিস্ট তৈরি করতে লাগল। সব আইটেমের জন্য আলাদা লিস্ট হলো।

সব লিস্ট ফাইনাল তৈরী হলে তাপস ও রুদ্র মিলিয়ে দেখল। আবৃত্তির লিস্টে আছে একশ কুড়ি জন ছাত্র-ছাত্রীদের নাম। তার মধ্যে কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীদের নামই বেশী। আর সব থেকে কম নাচের লিস্টে নাম। মাত্র দশজনের। একজন বম্বে থেকে, আর চারজন সাউথ ইণ্ডিয়া থেকে, আর গানের লিস্টে নাম আছে তাও বেশী না মাত্র পঁচিশজন। কলকাতা থেকে নাম দিয়েছে পনেরজন, আর সব যায়গা থেকে মাত্র দশজন।

রুদ্র বলল—দেখেছ? কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি ও গানেতে প্রথম স্থান অধিকার করবেই। কত নাম দিয়েছে? সর্ব-ভারতীয় ব্যাপার তো? কলকাতা কখনো পেছিয়ে থাকবে না।

কলকাতার সব মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ইউনিয়নের সভাপতি এবং সম্পাদকগণ সুপ্রীম মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের সভাপতি এবং সম্পাদক তাপস সেন ও রুদ্র গুপ্তকে এই উৎসব পরিচালনা করবার ভার দিলেন। যাতে এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। যাতে কলকাতার মেডিকেল ছাত্রদের বদনাম না হয়।

সেইজন্য তাপস সেন ও রুদ্র গুপ্ত উঠে-পড়ে লেগে গেলো। প্রথমে স্বনামধন্য ডক্টর সোমেন মিত্রের কাছে এই উৎসব উদ্‌বোধন করার জন্য অনুনয় বিনয় করে বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

ওরা হাওড়া ষ্টেশনে সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্রদের ত্রিবার্ষিকী উৎসব এই লিখে ব্যানার তৈরী করে একটা কাউন্টার খুলল আঠার তারিখ থেকে। সেখানে বাই টার্ণ দুজন করে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিতে লাগল। যাতে বাইরের ছাত্র-ছাত্রীরা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে সেই উৎসবের স্থানে যেতে সাহায্য পায়।

এই উৎসবের জন্য যে প্রাসাদ ঠিক করা হয়েছে তার কেয়ার-টেকারের সাথে রুদ্র গুপ্তের ফাইনাল কথা হয়েছে। যত লোক আসবে সবার খাবার বন্দবস্ত তাকে করতে হবে। আর থাকার বন্দবস্ত করবে রুদ্র গুপ্ত। যারা এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করবে তারা ছাড়া কলকাতার কোন ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রাসাদে থাকতে পারবে না।

রুদ্র ওই প্রাসাদের কেয়ারটেকারের কাছ থেকে দুখানা মিনি বাস পেয়ে গেল আর তিনখানি প্রাইভেট কার ভাড়া করল এক সপ্তাহের জন্য। উনিশ তারিখ থেকে ওরা ওদের সাহায্যের জন্য আরও পঁচিশজন ছেলে নিয়ে এসে আঠার তারিখ দুপুরে ওই প্রাসাদে

এসে গেল। ওরা ওই পঁচিশজন ছেলেকে উৎসবের ব্যাজ দিল, এবং কার কোথায় কী কাজ করতে হবে সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলল। দুটি ছেলেকে ভার দিল দুই মিনি বাসের। তাদেরকে বলল— তোমরা উনিশ তারিখ সকাল থেকে হাওড়া ষ্টেশনে মিনি বাস নিয়ে থাকবে, সেখানে আমাদের এই উৎসবের কাউন্টার খোলা হয়েছে। বাইরে থেকে যত ছাত্র-ছাত্রীরা আসবে এই উৎসবে যোগদান করতে তাদেরকে এই প্রাসাদে নিয়ে আসবে। সারাটা দিনই লেগে যাবে তোমাদের হাওড়া থেকে বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আসতে।

এই উৎসব কী ভাবে পরিচালনা করবে তার একটা চার্ট রুদ্র আর তাপস বসে ঠিক করে ফেলল। প্রত্যেক দিনই এক একটা আইটেম অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম দিন বিশ তারিখ ডক্টর সোমেন মিত্র এই উৎসব উদবোধন করবেন।

তারপর সর্বভারতের সব মেডিকেল কলেজগুলির ছাত্র এবং ছাত্রীরা আলাদা আলাদা ভাবে সারি করে দাঁড়াবে নিজেদের কলেজের ব্যানার নিয়ে। রুদ্র গুপ্ত ডক্টর সোমেন মিত্রকে নিয়ে আলাদা আলাদা কলেজের ব্যানার নিয়ে দাঁড়ান সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে আসবে। তখন প্রত্যেক কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের দলপতি ডক্টর সোমেন মিত্রের সাথে তার কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় করাবে।

এই ভাবে সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ডক্টর সোমেন মিত্রের পরিচয় হতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হবে।

তারপর ডক্টর সোমেন মিত্র সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে লাঞ্চে বসবেন ওই প্রাসাদের ডাইনিং হলে। সে দিনে আর কোন প্রোগ্রাম থাকবে না।

পরের দিন একুশ তারিখ উৎসব সুরু হবে অপরাহ্ন তিনটের সময়। সে দিন খালি আবৃত্তি হবে।

তারপরের দিন বাইশ তারিখ সেদিনও অনুষ্ঠান সুরু হবে অপরাহ্ন তিনটের সময়। সেদিনকার অনুষ্ঠানে শুধু গান হবে।

পরের দিন তেইশ তারিখ, সেদিনও উৎসব সুরু হবে বৈকালে চারটের সময়। সেদিনকার অনুষ্ঠানে শুধু নাচ হবে।

পরের দিন হবে হাস্যকৌতুক, আর তার পরের দিন হবে ইনডোর গেমস্।

তার পরের দিন এই উৎসবের কম্পিটিসনে যারা শীর্ষস্থান অর্জন করেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

তাপস রুদ্রকে বলল—আমরা এই অনুষ্ঠান পরিচালনার যে চার্ট করেছি, কেউ অপছন্দ করবে না। প্রত্যেক দিনই উৎসব শেষ হতে রাত বেশী হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যারা কলকাতার হস্টেলে ফিরে যাবে তাদের কোন অসুবিধা হবে না।

উনিশ তারিখ সকাল থেকেই সব ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে থেকে হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌঁছতে লাগল। ওই দু জন সেচ্ছাসেবক মিনি বাস করে হাওড়া ষ্টেশন থেকে ওদেরকে এই উৎসবের প্রাসাদে নিয়ে আসতে লাগলো। রুদ্র, যারা উৎসবের প্রতিযোগিতায়—অংশ-গ্রহণ করবে সেই ছাত্র-ছাত্রীদের লিস্ট দেখে ছাত্রদেরকে ছেলেদের বিল্ডিংয়ে এবং ছাত্রীদেরকে মেয়েদের বিল্ডিংএ থাকবার বন্দবস্ত করে দিতে লাগলো। দুটো বিল্ডিংই উনিশ তারিখ দিনের শেষে পূর্ণ হয়ে গেলো।

সব ছাত্র-ছাত্রীরা অপরাহ্নে এই শহর প্রান্তে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে লাগলো, গঙ্গায় তখন ভরা জোয়ার। প্রবল স্রোত বয়ে যাচ্ছে কলস্বরে। গঙ্গার এতো ঢেউ, এত গভীরতা এবং প্রবল বায়ু সবাইকে মুগ্ধ করলো। অপরাহ্ন পার হয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। আকাশে ফুটে উঠলো রাশি রাশি তারা। কিছু ছেলে-মেয়েরা আনন্দিতাশয্যে পাড়ে বসে গলা ছেড়ে গাইতে লাগলো।

এরা সবাই সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের দল। এদের চাল চলন, আচার-ব্যবহারে কোন অশোভনতা ছিল না।

কিছুক্ষণ বাদেই রাত্র নেমে এলো। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাসাদে ফিরে এসে প্রাসাদের রাত্রের চাকচিক্য দেখে বিমোহিত হলো—ভাবলো! এ কোন দেশের রাজপ্রাসাদ? সবাই একদৃষ্টে আলোর দীপান্বিতা দেখতে লাগলো। সব হেজগুলি নানা রকম রঙের আলোতে আলোময় হয়ে রয়েছে। প্রাসাদের গেটগুলির আচ্ছাদনে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে তারার দল নেমে এসে ঝিক্‌মিক্ করছে। সবাই রাত্রে এই সুন্দর আলোকজ্জ্বলময় প্রাসাদের চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। মাননীয় অতিথী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা হলে ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলোকচ্ছটা এবং রাজকীয় আসনের ব্যবস্থা দেখে ভাবতে লাগলো, ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর আগেও ছিল এখনো আছে।

বিশ তারিখ সকাল দশটার কিছু আগে রুদ্র গুপ্ত ডক্‌টর সোমেন মিত্রকে এই উৎসব উদ্‌বোধন করবার জন্য নিয়ে এসে মাননীয় অতিথী-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা হলে—বসিয়ে রেখেছে। সেখানে সব কর্মকর্তারা তাঁর সাথে আলাপ-পরিচয় করতে ব্যস্ত।

রুদ্র গুপ্ত মাইকে ঘোষণা করলো—কমরেডস্ দশটা বাজার দশ মিনিট আগে আপনারা হলে গিয়ে নিজেদের সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ুন। মাননীয় স্বনামধন্য ডক্‌টর সোমেন মিত্র ঠিক দশটায় আমাদের এই সর্বভারতীয় ত্রিবার্ষিকী মেডিকেল ছাত্রদের উৎসব উদ্‌যাপন করবেন। এই ডক্‌টর মিত্র, এত কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও, এতো এ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও সব বাতিল করে দিয়ে এসেছেন আমাদের সাথে পরিচিত হবার জন্য।

এই কথা শুনে সবাই করতালি দিয়ে ডক্‌টর মিত্রের এই ত্যাগের জন্য প্রশংসা করলো।

রুদ্র গুপ্ত বলতে লাগল—ডক্‌টর মিত্রের এই উৎসব উদ্‌বোধন

করার পর, তিনি একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন। তারপর আপনারা আমাদের কর্মসূচী অনুযায়ী এই হলের সামনের খোলা যায়গায় প্রত্যেক কলেজের আলাদা আলাদা ব্যানার নিয়ে আলাদা সারী করে দাঁড়াবেন। ডক্টর মিত্র আপনাদের কাছে যাবেন আর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরিচিত হবেন। সবাই হলে বসুন। এখন ডক্টর মিত্র উদবোধন করতে যাচ্ছেন।

অল্প সময়ের মধ্যে রুদ্র গুপ্ত ডক্টর মিত্রকে নিয়ে হলে প্রবেশ করলেন। সব ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে ডক্টর মিত্রকে অভ্যর্থনা করলো।

ডক্টর মিত্র তার আসনে বসলেন। সব ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের আসনে বসালো।

রুদ্র গুপ্ত মাইকে বলল—এবার ডক্টর মিত্র উদবোধন ভাষণ দেবেন।

ডক্টর মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন তোমাদের এই সর্ব-ভারতীয় ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে ভূয়সী প্রসংশা করছি। এই উৎসব উদবোধন করার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করলে তিনি আসতেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলে তিনিও সব কাজ ফেলে দিয়ে আসতেন, কিন্তু তোমরা তাঁদের কাছে না গিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছ, তাতে আমি খুব গর্ববোধ করছি। ডাক্তারদের যে একটা আলাদা দায়িত্ব আছে, সেটা তোমরা বুঝেছ জেনে, আমি ডাক্তার হয়ে গর্ববোধ করছি।

আমিও তোমাদের মত একদিন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম। এখন আমার ডাক্তার হিসাবে দেশব্যাপী সুনাম হোয়েছে। আমার এই জীবনের শেষ প্রান্তে তোমাদেরকে বোলবো একটা কথা। সব সময় মনে রাখবে, তোমরা আর্ত—রুগ্ন মানুষদের সেবা করার জন্য যা সুযোগ পাবে, পৃথিবীতে আর কেউ সে সুযোগ পাবে না। আর্তের সেবা করে তোমরা তোমাদের মানব-জীবন সার্থক কর।

এই কথা শুনে সব ছাত্রদের মধ্য থেকে একটি লম্বা ফর্সা চেহারার ছাত্র তার চেয়ার থেকে উঠে স্টেজে এসে ডক্টর মিত্রের দু-হাত জড়িয়ে ধরে বলল—আপনি সুপার ম্যান, আপনার উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করব।

ডক্টর মিত্র রুদ্রকে জিজ্ঞেস করলো—এই ছেলেটি কোন কলেজের? কি নাম?

রুদ্র বলল—স্যার! একে আমি ভাল করে চিনি, এর নাম উদয় চ্যাটার্জি। এতো আমাদের কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সব পরীক্ষায় বরাবর ফার্ষ্ট হয়।

ডক্টর মিত্র উদয়কে বললেন—তোমার কথায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার কোন প্রয়োজন হলে আমার কাছে চলে আসবে। উদয় অবনত হয়ে নমস্কার করে ওর চেয়ারে এসে বসল।

এরপর রুদ্র গুপ্ত আবার মাইকে বলল আপনারা খোলা যায়গায় প্রত্যেক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা সারি করে দাড়ান ডক্টর মিত্র আপনাদের সাথে পরিচয় করতে যাচ্ছেন।

এই কথা শুনে সব ছাত্র-ছাত্রীরাও হল থেকে বেরিয়ে দিশাহারা হয়ে গেল কে কোথায় দাঁড়াবে। কিন্তু পরে দেখল তাদের প্রত্যেক কলেজের ইউনিয়নের সম্পাদক আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরে রুদ্র গুপ্ত ডক্টর মিত্রকে নিয়ে সেখানে গিয়ে পর পর কলেজে ছাত্র ইউনিয়ান সম্পাদকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। ডক্টর মিত্র তাদের সাথে করমর্দন করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন কলকাতা কেমন লাগছে? বোর ফিল করছ না তো?

সবার সাথে পরিচয় করাবার পর রুদ্র ডক্টর মিত্রকে মাননীয় অতিথী-অভ্যাগতদের গেষ্ট হলে নিয়ে বসিয়ে মাইকে বলল—কমরেডস্! এবার আপনারা ডাইনিং হলে গিয়ে আপনাদের সংরক্ষিত আসনে বসুন। ডক্টর মিত্র আপনাদের সাথে বসে লাঞ্চ

করবেন। সবাই এক যোগে করতালি দিয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করল।

সব ছাত্রছাত্রী ডাইনিং হলে গিয়ে যে যার সংরক্ষিত আসনে বসল।

রুদ্র গুপ্ত ডক্টর মিত্রকে ডাইনিং হলে নিয়ে এসে তাঁর জন্য সংরক্ষিত স্থানে বসালো। ডক্টর মিত্রের সাথে আরও দশজন ছাত্র-নেতা ওই টেবিলে বসল।

ওই প্রাসাদের ক্যানটিন স্টাফই খাদ্য পরিবেশন করতে লাগলো। তাদের পরিবেশনের গুনে সবাই পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে লাগলো।

লাঞ্চের শেষে রুদ্র গুপ্ত দাড়িয়ে বলল আমাদের উৎসব আজ এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। কাল আবার অপরাহ্ন তিনটায় আমাদের উৎসবের আবৃত্তির অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

রুদ্র ডক্টর মিত্রকে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

রুদ্র গুপ্ত বেশ ভাল ভাবেই জানে আবৃত্তি যারা করবে, বেশীর ভাগ আবৃত্তি কোরবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। তাই পরের দিন তিনটের আগেই আবৃত্তির বিচারক-হিসাবে বিশ্বভারতী থেকে একজন প্রফেসারকে নিয়ে এসে অতিথী হলে বসিয়ে জলযোগের আপ্যায়নের ব্যাবস্থা করলো।

সেই অতিথী হল থেকে রুদ্র গুপ্ত মাইকে বলল—প্রিয় কমরেডস: এখনি আমাদের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে। আপনারা হলে গিয়ে যার যার আসনে বসুন।

সবাই যে যার আসনে বোসবার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। যারা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করবে তাদের আসন আলাদা। তারা তাদের আসনে গিয়ে বসলো।

ঠিক তিনটের সময় রুদ্র গুপ্ত দুজন বিচারক নিয়ে হলে প্রবেশ করলো। বিচারকদ্বয় তাঁদের আসনে বসলেন।

রুদ্র গুপ্ত আবৃত্তির অংশ-গ্রহণকারিদের লিস্ট দেখে বলল—প্রথম আবৃত্তি করবে কলিকাতার দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্রী মীরা গুহ।

মীরা গুহ স্টেজে এসে দাঁড়িয়ে সকলকে নমস্কার কোরে বোলল আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পূজারিণী আবৃত্তি করছি।

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান, শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য শীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজ-মহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়ালো আসি।
শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা, এ কথা নাহি কি মনে,
অজাত শত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্য রচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা অথবা নির্বাসনে।

* * *

মীরা গুহর আবৃত্তি শেষ হলে, অর্চনা বোস আবৃত্তি করতে এসে বলল—আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বন্দীবীর আবৃত্তি করছি, বলে সুরু করল।

পঞ্চ-নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে 'গুরুজীর জয়'-ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ॥

* * *

এই ভাবে অনেক ছেলে অনেক মেয়ে কবিতা আবৃত্তি করল।

রুদ্র গুপ্ত বলল—কমরেডস্! আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন বম্বে মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রী মিঠুন কাপুর, পাঞ্জাবের মেয়ে এবার বাংলায় আবৃত্তি করবেন।

এই ঘোষণা শুনে সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মিঠুন কাপুর একেবারে বাঙ্গালী মেয়ের পোষাকে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল—আমি যদিও পাঞ্জাবী, কিন্তু আমি কলকাতায় এসেছি এই বঙ্গদেশে, কাজেই আমি বাংলায় আবৃত্তি কোরব।

সবাই করতালি দিয়ে মিঠুন কাপুরকে উৎসাহিত করল।

মিঠুন কাপুর বলল—আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, 'পণরক্ষা' আবৃত্তি করছি।

সবাইকে হাত তুলে অবনত-মস্তকে নমস্কার করে শুরু করল।

মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই, করো করো সবে সাজ
আজমির গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-পহরে যে যাহার ঘরে সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গ-তোরণে নাকাড়া বাজিতে বাহিরে আসিলো ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা মারাঠি অশ্বখুরে।
মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ আনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন গর্জিলা দুমরাজ॥

* * *

মিঠুন কাপুরের আবৃত্তি শেষ হলে সে কী করতালি! একে তো মিঠুন কাপুরের এই অনিন্দ সুন্দর মুখশ্রী, মধুর কণ্ঠস্বর, তার উপর আবৃত্তি করার নিপুণতা, সবাই তার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল।

রুদ্র গুপ্ত বলল—আপনারা কেউ আসন ছেড়ে উঠবেন না।

মাননীয় বিচারকেরা শীঘ্রই তাঁদের রায় দেবেন কে প্রথম স্থান অধিকার করল।

অল্প সময়ের মধ্যে বিচারকদ্বয় একটা কাগজে তাদের রায় লিখে রুদ্র গুপ্তকে দিলেন।

রুদ্র গুপ্ত সেই বিচারকদ্বয়ের দেওয়া কাগজ পড়ে বলল—মাননীয় বিচারকদ্বয়ের রায় শুনুন—আমরা উভয়ই একমত হয়ে আমাদের অভিমত জানাচ্ছি বম্বের মিঠুন কাপুর আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—

বিচারকদ্বয় উঠে দাঁড়ালেন। রুদ্র গুপ্ত ঘোষণা করল। আজকের মত অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। আগামী কাল কর্মসূচী অনুযায়ী তিনটায় গানের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

রুদ্র গুপ্ত বিচারকদ্বয়কে নিয়ে তাদেরকে গাড়িতে পৌছিয়ে দিতে গেল।

পরের দিন ঠিক তিনটেতে গানের অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। দুজন নামী-গায়ক বিচারকের আসনে কাগজ-কলম নিয়ে এসে বসলেন। তাঁরা অংশ-গ্রহণকারিদেরকে নম্বর দিয়ে ঠিক করবেন, কে বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করল।

এই উৎসবের পরিচালক রুদ্র গুপ্ত মাইকে ঘোষণা করল। এই গানের অনুষ্ঠান খালি রবীন্দ্র সঙ্গীত গানের অনুষ্ঠান নয়, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেও তাকে অন্য সুরের গানও গাইতে হবে। হিন্দী গানও গাইতে হবে। সুতরাং যারা খালি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার জন্য নাম দিয়েছেন এবং অন্য গান গাইবেন না, তাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ করে কোন লাভ হবে না।

এই কথা শোনার পর কলিকাতার অনেক অংশ-গ্রহণকারি নাম প্রত্যাহার করে নিল।

রুদ্র গুপ্ত দেখল মাত্র সাতজনের নাম থাকলো আর বাদ বাকি সকলে নাম প্রত্যাহার করে নিল।

রুদ্র গুপ্ত বলল—এবার আপনাদের সামনে আসছে আমাদের ক'লকাতার সুপ্রীম মেডিকেল কলেজের ছাত্র উদয় চ্যাটার্জি। তিনি আপনাদেরকে তার গানে মুগ্ধ করবে।

উদয় চ্যাটার্জি স্টেজে উপস্থিত হয়ে সবাইকে অবনত-মস্তকে নমস্কার করল। বিচারকদ্বয়কেও নমস্কার করল। সবাই এই দীর্ঘদেহী সুপুরুষ তরুণ উদয় চ্যাটার্জিকে দেখল। ঠোঁটের উপরে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা, গায়ের রঙ উত্তম গৌরবর্ণ, মেদবিহীন দেহ, মাথার কেশ বড় হয়ে পিছনে চলে গিয়েছে, চুড়িদার পায়জামা ও লখনৌ কাজ করা পাঞ্জাবি পরিহিত। গলায় ক্রুশসহ সোনার চেন।

উদয় চ্যাটার্জি সবার অনুরোধে দুটোর যায়গায় পর পর সাতটা গান গাইলো।

রুদ্রে গুপ্ত বললো—আপনারা সারা রাতভর গান শুনলেও আপনাদের গান শোনার আগ্রহ মিটবে না। এখন এই উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত, কাজেই উদয় চ্যাটার্জিকে আর গান গাইবার অনুরোধ করবেন না।

এরপর আরও পাঁচজন গান গাইলো। তবে দুটো কোরেই তারা গাইলো। কেউ তাদেরকে আর গান গাইতে অনুরোধ করল না।

এইবার রুদ্র গুপ্ত জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করল—এখন যিনি গান গাইবেন, ইনি হলেন আজকের এই গানের অনুষ্ঠানের শেষ গায়িকা। ইনি হলেন বম্বের সেই ছাত্রী মিঠুন কাপুর। যিনি আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

রুদ্র গুপ্ত মিঠুন কাপুরকে আহ্বান করে বলল—এইবার আপনি আসুন।

মিঠুন কাপুর সকলকে করজোড়ে নমস্কার করে প্রশান্ত মুখে হারমোনিয়াম নিয়ে গান সুরু করলো। প্রথম গান শেষ হোতেই শতকণ্ঠে বলল—কমরেড আরেকখানা, এইভাবে ছাত্রদের

অনুরোধের উপর অনুরোধে মিঠুন চারখানা গান গাইবার পর মাইকের সামনে এসে নমস্কার করে বিনিতভাবে বলল—আমার এক সাথে এতো গান গাইবার অভ্যেস নেই। আমি একখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শেষ করছি। এই বলে মিঠুন গান শুরু করলো।

আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে॥

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্দ্ধ-পানে।
আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে॥

দর্শক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ দেখল, মিঠুন কাপুর গান গাইছে আর তার দু নয়ন বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এতো দরদ দেওয়া গান শুনে সবাই মুগ্ধ নয়নে মিঠুনের পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে একটা পবিত্র আলো দেখতে পেল।

গান শেষ হলে মিঠুন কাপুর মুখ নিচু করে তার আসনে গিয়ে বসল।

রুদ্র গুপ্ত বলল—কমরেডস্ আপনারা একটু স্থির হয়ে বসুন। একটু পরেই বিচারকদের রায়ে জানতে পারা যাবে গানে কে প্রথম স্থান অধিকার কোরল।

পনর মিনিট কেটে গেল, কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল, যেই

পঁচিশ মিনিট হোলো, তখন বিচারকদ্বয় রুদ্র গুপ্তকে তাদের রায় লিখে কাগজ দিলেন।

রুদ্র গুপ্ত ঘোষণা করতে উঠে দাঁড়ালো। হল একদম হয়ে গেল নিকোশ কালো অন্ধকারের মত নিতব্ধ।

রুদ্র গুপ্ত বিচারকদের রায়ের কাগজ কয়েকবার নিজে নিজে পড়ে, উদয় চ্যাটার্জি ও মিঠুন কাপুরকে ডেকে স্টেজে নিয়ে এসে বলল—

আপনারা বিচারকদ্বয়ের রায় শুনে বিস্মিত হবেন না। আপনারাও এই রায় সানন্দে স্বাগত জানাবেন। এই বলে রুদ্র গুপ্ত উদয় চ্যাটার্জির এক হাতের সাথে মিঠুন কাপুরের এক হাত এক সাথে করে উপরে তুলে ধরে বলল—বিচারকদ্বয়ের রায়—এই দুজন প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

এই ঘোষণা শোনার পর সব ছাত্র-ছাত্রীদের করতালির শব্দে হল ফেটে যায় আর কী!

অনুষ্ঠান শেষ হলে উদয় চ্যাটার্জি ও মিঠুন কাপুর এক সাথে হল থেকে বেরিয়ে যে যার নিজের বিল্ডিংএ চলে গেল। কেউ কারোর সাথে কোন কথা বোলল না, বা কেউ কারোর দিকে তাকালোও না।

রুদ্র গুপ্ত ঘোষণা করলো—আজকের মত আমাদের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। কাল কর্মসূচী অনুযায়ী নাচের অনুষ্ঠান সুরু হবে অপরাহ্ন তিনটেতে।

মিঠুন তার কামরাতে ফিরে এসে এক অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে উঠল ভয়ে ও দুর্ভাবনায়। আজ গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তার পাপাজী ও মামিজীর কথা মনে হোলো, আর সজল হয়ে উঠল চোখ দুটো।

সব মেয়েরা, মেয়েদের বিল্ডিংএ ফিরে এসে মিঠুনকে ঘিরে আনন্দ প্রকাশ করছিল, কিন্তু মিঠুন তার বিচলিত মন নিয়ে তাদের আনন্দে অংশ নিতে পারছিল না। তার এই রকম ম্লান মুখ দেখে সব ছাত্রীরা হতাস হয়ে মিঠুনের কাছ থেকে চলে গেল।

পরের দিন সকালে মিঠুন তাদের কলেজের নেতাকে বলল—আমাকে বম্বে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন আমার আর এখানে থাকতে মন চাইছে না। আমার রাজা দাদাজীর অনুমতি না নিয়ে এখানে এসেছি। তিনি জানতে পারলে খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। আরেকটা কথা মিঠুন তাদের নেতাকে বলল—আজ নাচের অনুষ্ঠান থেকে আমি নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি, আমি আর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাই না।

মিঠুনের কলেজের ছাত্র-নেতা বলল—আর দুটো দিন অপেক্ষা কর। তোমার গানের ও আবৃত্তির প্রথম পুরষ্কার নিয়ে নাও। তারপর আমরা সবাই একসাথে চলে যাব। এখানে বেড়াবার জন্য আর থাকব না।

পরের দিন মিঠুন নৃত্যের অনুষ্ঠানে যোগ দিল না। সারাদিন শুয়েই দুর্ভাবনায় কাটালো। অপরাহ্ন পার হয়ে বিকেলে শুভ্রা-বসনে, নিকটেই নির্জন নিরিবিলি গঙ্গার তীরে গিয়ে বোসল। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গঙ্গায় ভরা জোয়ার কলস্বরে বয়ে যাচ্ছে। মন্থর গতিতে গঙ্গার বুকে ভেসে যাচ্ছে নৌকো, ষ্টিমার ইত্যাদি। মিঠুন এক মনে গঙ্গার এই দৃশ্য দেখতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো—আমার আপনজন বোলতে তো কেউ নেই। যে আমার এই বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় মন অসাড় হয়ে উঠলো। আর চিন্তা করতে ভাল লাগে না। ভাগ্যের পায়ে নিরূপায় ভাবে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সেই সময় মিঠুন দূর থেকে দেখল সাদা ধব ধবে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে তার দিকে সোজা চলে আসছে উদয় চ্যাটার্জি।

কোন ভণিতা না করে উদয় চ্যাটার্জি মিঠুনের পাশে বোসলো। তাতে মিঠুন অশ্বস্তি অনুভব কোরলো না বা কোন অনুযোগ কোরলো না।

উদয় বললো—আমরা আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কি সিনিয়র কি জুনিয়র, সবাই তুমি আমি কোরেই কথা বলি। আমার কথা শুনে বোধহয় বিস্মিত হয়ে ভাবছ জানা নেই চেনা নেই, হঠাৎ তোমার পাশে বোসলাম আর আলাপ শুরু করে দিলাম, নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

মিঠুন বলল—এখনও আমি তোমার ব্যবহারে বিস্মিত হইনি বা কিছু ভাবিওনি, তোমার ব্যবহারে কোন অশোভোনতা পাই নি, এখন বল তুমি কি বলতে এসেছ।

উদয় বলল—প্রথম আমার নিজের জীবনের কথা কিছু বোলবো। কেন বলছি, তাও পরে বোলব।

এই বোলে উদয় বলতে লাগল—আমার ড্যাড্ একজন খাঁটি বাঙ্গালী, নাম সুজিত চ্যাটার্জি, কিন্তু তিনি আমেরিকান সিটিজেন হয়েছেন এবং আমেরিকাতেই স্থায়ী ভাবে বাস করছেন। আমার মা ছিলেন আমেরিকান লেডী। আমি মাকে আমার দু-বছর বয়সেই হারাই। সেই থেকে আমার ড্যাড্ আমাকে ব্যাঙলোরে মিশনারীদেয় কাছে দিয়ে যান। সেই থেকে অনাথ শিশুর মত মিশনারীদের কাছেই মানুষ হয়েছি। তাদের শিক্ষায়, শিক্ষিত হয়েছি। কলকাতায় এই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার আগে পর্য্যন্ত তাদের কাছেই ছিলাম। আমার ড্যাড্ আমাকে ব্যাঙলোরে কোনদিন দেখতে আসেন নি। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার আগে আমেরিকাতে গিয়ে ড্যাডের সাথে দেখা করে এসেছি। মনে করেছিলাম আমেরিকাতে গিয়ে স্টেপ মাদার ও স্টেপ ভাই বোনদের দেখতে পাব, কিন্তু আমার ড্যাড্ আমার মামের মৃত্যু পর আর রি-ম্যারেজ করেন নি। এবার গিয়ে আমেরিকাতে ড্যাডের সাথে মাস দুয়েক ছিলাম। আমার ড্যাড্ ভাল গান জানে, ড্যাডই আমাকে গান শিখিয়েছেন। ড্যাড্ বলেছেন কোনদিন ইণ্ডিয়াতে আসবেন না, এখান থেকে পাশ করে আমেরিকাতে

হায়ার ডিগ্রি নিতে বলেছেন। আমারও তাই ইচ্ছে, তবে আমার ইণ্ডিয়াতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করার ইচ্ছে। আমার তো আর একমাস বাদেই ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়েই আমি আমার ড্যাডের কাছে চলে যাব। আমি আমার শৈশবকাল থেকেই একা একাই থেকেছি। ড্যাড্ বা মাম্-এর স্নেহ ভালোবাসা পাইনি।

আচ্ছা তোমাকে আমার এতো কথা বললাম কেন, জান? আমি খুবই দুঃখী। কাজেই অন্যের দুঃখ দেখলে বুঝতে পারি এবং তার সেই দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করি।

সেদিন স্টেজে তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে তুমিও আমার মত খুবই দুঃখীনী। আমি যেমন আমার দুঃখের কথা খুলে বলেছি, তুমিও তোমার দুঃখের কথা খুলে বলো। আমি কথা দিচ্ছি। কাউকে বোলবো না এবং আপ্রাণ চেষ্টা কোরব যাতে তোমার সেই দুঃখ ঘোচাতে পারি।

মিঠুন উদয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল দৃপ্ত সতেজ সত্যের ছাপ মুখের উপর। মিঠুন আর উদয়কে অবিশ্বাস করতে পারলো না, তারপর বোলতে লাগলো, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে আমার মন বোলছে তোমাকে সব দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তুমি তোমার ড্যাড্কে এত বছর পর খুঁজে পেয়েছ, কিন্তু এখনো আমি আমার পাপাজী অথবা মামিজীকে খুঁজে পাই নাই। তাঁরা কে, তাঁদের কি নাম তাও আমি জানিনা। এটা খুব গোপন খবর। খালি তোমাকেই বলছি। আমার বম্বের দিদাজী যে আমাকে শৈশবকাল থেকে মানুষ কোরছেন, এখনো তাঁর কাছেই আছি। তিনি আমাকে বোলেছেন বম্বের আমার আর এক রাজা দাদাজী আমার তিন বছর বয়সের সময় এই দিদাজীর কাছে রেখে গিয়েছেন মানুষ করার জন্য। আমার জন্য সেই রাজা দাদাজী অঢেল টাকা খরচ করছেন আমাকে ভালভাবে মানুষ করে তোলার জন্য। গান, নাচ সব ভাল ভাবে শেখাবার বন্দবস্ত করেছেন। আমি

দিদাজীর কাছে শুনেছি ওই রাজা দাদাজী বম্বের একজন কুখ্যাত দুবৃত্ত। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার মন দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় অসার হয়ে গেছে এবং মনে হচ্ছে বম্বে ফিরে গেলেই আমি বিপদাপন্ন হয়ে পড়ব।

মিঠুনের সব কথা শুনে উদয় স্থির করলো যে কোরেই হোক বাঁচাতে হবে এই বিপন্না নারীকে। এই দুবৃত্তের কবল থেকে মুক্ত কোরতে হবে। তার এই প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখমণ্ডলে।

উদয় বলল—কোন আত্মমর্যদাসম্পন্ন পুরুষ সমর্থন কোরতে পারে না, কোন সম্ভ্রান্ত নারীর উপর এরকম জঘন্য অত্যাচার। তুমি থাক বম্বেতে আর আমি থাকি কলকাতায়, এই রকম দুবৃত্তদের সাথে লড়তে হবে বুদ্ধি দিয়ে। সামনা সামনি লড়ে ওদের সাথে পারা যাবে না।

তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে ওই গঙ্গার তীরে। আকাশের মাঝখানে আধখানা চাঁদ আকাশে ফুটে উঠেছে রাশি রাশি তারা, চাঁদের আলো অতি ম্লান। অন্ধকার ভেদ করে বেশীদূর দেখা যায় না। নির্মেঘ আকাশে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখী। তাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা গেল।

মিঠুনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। চোখে পুঞ্জিভূত বেদনা। কিন্তু অশ্রু নেই এক ফোঁটাও। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উদয়ের দিকে।

উদয় বলল তোমাকে বাঁচানোর একটা পথই খোলা আছে। কালই চলো আমরা ম্যারেজ রেজেস্ট্রী করে ফেলি। আমি বাই বার্থ আমেরিকান সিটিজেন। সে রকম যদি খুবই বিপদাপন্ন হও, তাহলে আমি আমার ম্যারেড ওয়াইফকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যেতে পারব অথবা আমেরিকান এমব্যাসিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারব। তবে এটা ভেব না, আমাদের ম্যারেজ রেজেস্ট্রী হলে,

কোন দিনই দাবি কোরবো না যে তুমি আমার বিবাহিতা ওয়াইফ। যেদিন তুমি বিপদ থেকে মুক্তো হবে, সেই দিনই আমরা আমাদের এই রেজেস্ট্রি ম্যারেজ বাতিল করিয়ে নেবো।

মিঠুন ম্লান হাসি হেসে বলল—উদয় তোমার এই আত্মত্যাগের প্রস্তাব, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

উদয় বললো—আমাদের এই রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, এটা একটা আমাদের গোপন দলিল। এক কপি থাকবে তোমার কাছে আর এক কপি আমার কাছে। সাক্ষ্য-হিসাবে থাকবে আমাদের কলেজ ইউনিয়নের ছাত্র-নেতা রুদ্র গুপ্ত এবং তাপস সেন। তারা অতীব বিশ্বাষযোগ্য। তারা কোন সময় এই রেজেস্ট্রি ম্যারেজের কথা প্রকাশ করবে না। এই বোলে উদয় মিঠুনের সাথে করমর্দন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুজনেই দেখল কখন দুজনের হাত একসঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে কারোর খেয়াল নেই। উদয় কিছু বোলতে যাচ্ছিল, মনে হোলো যেন সামলে নিলো নিজেকে।

মিঠুন উদয়ের হাত ধরাতে ওর মনে হোলো ও যেন একটা অবলম্বন পেয়েছে, আর কোন দুর্ভাবনা নেই, আশঙ্কা নেই, মুখে ফুটে উঠলো একটা আনন্দের আভাস।

ওরা দেখলো রাত অনেকটা হয়ে গিয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। শোনা যাচ্ছে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা ডাক আকাশে ফুটে উঠেছে রাশি রাশি তারা। ওরা গঙ্গার তীর থেকে ডাইনিং হলে চলে এসে, পাশাপাশি বোসে ডিনার খেয়ে যে যার বিল্ডিং-এ চলে গেল।

সেই রাত্রেই উদয় ওদের নেতা রুদ্র ও তাপসকে ওদের রেজেস্ট্রী ম্যারেজ সম্বন্ধে বোলে রাখলো।

পরের দিন সকাল দশটায় মিঠুন ও উদয় মাননীয় অতিথী হলে দেখল রুদ্র ও তাপস ওদের জন্য অপেক্ষা কোরছে। ওরা চারজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আলিপুর ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে উদয় চ্যাটার্জি ও মিঠুন কাপুরের ম্যারেজ রেজেস্ট্রির জন্য দরখাস্ত দেওয়া হলো আর ওরা দুজন রুদ্র গুপ্ত আর তাপস সেন তাতে সাক্ষী থাকলো। অল্প সময়ের মধ্যে কিছু টাকা বেশী খরচ কোরে দু কপি ম্যারেজ-সার্টিফিকেট নিয়ে ওরা সকালে ওদের উৎসবের প্রাসাদে ফিরে এলো। তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। ওরা চারজন এক জায়গায় বোসে লাঞ্চ কোরলো। তারপর যে যার বিল্ডিংএ চলে গেল।

তিনটের সময় হাস্যকৌতুকের অনুষ্ঠান সুরু হলো। এই অনুষ্ঠান দেখবার জন্য হল পরিপূর্ণ হয়ে উপছে পড়ছে। মিঠুন ও উদয় পাশাপাশি বসে দেখছিল। ওদের বেশ ভালই লাগছিল। হাস্যকৌতুক দেখে প্রাণ খুলে হাসছিল। বম্বের ছাত্ররা উদয় ও মিঠুনের ঘনিষ্ঠতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। বম্বের অনেক সঙ্গতিপন্ন ছাত্ররা মিঠুনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো, কিন্তু সফল হয়নি।

কিছুক্ষণ হাস্যকৌতুক দেখার পর মিঠুন উদয়কে বলল—এখানকার গঙ্গার তীর খুবই আনন্দদায়ক। চল আমরা গঙ্গার তীরে গিয়ে বসি।

উদয়ও বলল—চলো, মিঠুন। এই বোলে ওরা গঙ্গার তীরে গিয়ে পাশাপাশি বসলো। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে গঙ্গার তীরে। গঙ্গার অগণিত ঢেউ ফুলে ফেঁপে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো মিষ্টি হাওয়া মিঠুনের চুলে হাত বুলিয়ে গেল।

এ দুদিন উদয়ের সাথে মিশে মিঠুন বুঝতে পারলো, উদয়ের তার প্রতি কোন শালীনতাবিহীন দৃষ্টি নেই। তাকে তার এই বিপদ থেকে উদ্ধার করাটাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিঠুনের কাছ থেকে বম্বের দাদাজী দিদাজীর সব কথা শুনে উদয় বললো—মিঠুন তোমার জীবন আমার থেকেও অতীব দুঃখের। তোমার ও আমার জীবনের একটা জিনিষ মিলে যাচ্ছে। তুমিও

তোমার পাপাজী ও মামিজীর কাছে মানুষ হওনি, আমিও আমার ড্যাড্ বা মামের কাছে মানুষ হইনি। তুমি মানুষ হয়েছো ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে যদিও তাঁরা এক দুর্বৃত্ত দল দ্বারা পরিচালিত। আর আমিও মানুষ হয়েছি ধর্মপ্রাণ সর্বত্যাগী—মিশনারিসদের কাছে। কাজেই আমরা কেউই খারাপ শিক্ষা পাইনি, পেয়েছি মানুষের মনুষ্যত্যের শিক্ষা। তুমি যাতে এই দুর্বৃত্তদের কবোল থেকে বাঁচতে পার, সেইজন্যই তোমার পুণ্যময়ী দিদাজী তোমার গোপন কথা সব তোমাকে বলেছেন।

উদয় বলতে লাগলো—আমাদের এই ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হবার পর, আমার মনে এই চিন্তা এসেছে তোমাকে বিপদমুক্ত করা আমার শুধু পবিত্র কর্তব্য নয়, আমার দায়িত্ব।

মিঠুন বলল—তুমি যা বলছ উদয়, সবই মানুষের মত মানুষের কথা। আমি দিদাজীর কাছে শুনেছি এই দুর্বৃত্তদল যাকে তারা পছন্দ করবে না এবং যে তাদের কথা শুনবে না, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। দিদাজী বলেছেন—তাঁর কুড়ি বছরের ছেলেকে এই দুর্বৃত্তরা গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে দিয়েছে। এই দুর্বৃত্তদের দলপতি হলেন আমার রাজা দাদাজী যিনি ভার্মা সাহেব বলে পরিচিত। কাজেই যা আমরা করব খুব ভেবে-চিন্তে করতে হবে।

উদয় বলল—আমি এখনি ওই দুর্বৃত্তদের দলের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি না। তোমার কাছ থেকে ঈসারা না পেলে কোন কিছুই করব না।

মিঠুন বলল—আমার আর এখানে থাকতে প্রাণ চাইছে না। সব সময় একটা আতঙ্ক যে রাজা দাদাজী না টের পেয়ে যায়। কাজেই কালই আমি উষাকালে রওনা হবো। একটা কথা—তোমাকে আমার কলেজের ফোন নাম্বার দেবো, একদিন দুদিন পর পর আমরা ফোনে যোগাযোগ করবো।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে অন্ধকার আলোর আবছায়ায় উদয় মিঠুনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দম্‌দম্‌ এয়ারপোর্টের দিকে। ট্যাকসিতে উঠে উদয় ওর কলকাতার ও আমেরিকার ফোন নম্বর দিল। মিঠুন ভাবল উদয়ই এখন তার জীবনের একমাত্র ভরসা।

এয়ারপোর্টে এসে ট্যাকসি থেকে নেমে, প্লেনে ওঠবার জন্য রওনা হলো। প্লেনের ভিতর ঢুকবার ঠিক আগে মিঠুন জলভরা চোখে হাসি হাসি মুখ তুলে উদয়ের দিকে তাকালো। মিঠুন দেখলো উদয় তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

উদয় ফিরে এলো ওর কলেজের হোস্টেলে।

ঘণ্টা দুই এর মধ্যে মিঠুন বম্বের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে এসে পৌঁছে গেল। একটা ট্যাকসি নিয়ে ওর দাদাজী ও দিদাজীর বাড়িতে চলে এলো। ওরা জানতেন মিঠুনের আরও তিনদিন পর ফেরার কথা। তিনদিন আগে চলে আসতে দিদাজী মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার শরীর ভালতো? তুমি তিন দিন আগেই ফিরে এলে?

মিঠুন বলল—দিদাজী আমার এই বয়সে তোমাদের ছেড়ে একদিনও থাকিনি। কাজেই এতোদিন তোমাদেরকে ছেড়ে এত দূরে থেকে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, আমি আর থাকতে পারলাম না। তাই তোমাদের কাছে ছুটে এলাম।

দিদাজী মিঠুনের এই মিষ্টি কথা শুনে মিঠুনকে আলিঙ্গন করে কপালে চুম্বন করলেন।

মিঠুন জিজ্ঞেস করলো—রাজা দাদাজী কি আমার কোন খোঁজখবর নিয়েছিলেন?

দিদাজী বললেন—না, সে রকম বিশেষ কিছু খোঁজখবর নেন নি। তবে তোমার দাদাজীকে বলেছেন দু'মাস বাদে তাঁর সমুদ্রকা সুন্দরী হোটেলে একটা বিশেষ নাচের অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনবান ব্যক্তিগণ

উপস্থিত থাকবেন। সেই অনুষ্ঠানে তোমাকে নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। সেইজন্য সবকিছু বাদ দিয়ে তোমাকে খালি নৃত্যের উচ্চতর নিপুনতা শিক্ষা দিতে বলেছেন।

মিঠুন এই কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর ভাবলো তাহলে তো দেখছি বিপদ এসেই গেছে।

মিঠুন ওর মেডিকেল কলেজের ইউনিয়ন অফিস থেকে উদয়ের সাথে কথা বলতো। তার এই নৃত্যের অনুষ্ঠানের কথাও জানিয়ে দিল, তবে উদয়কে বলল—এখনই ভয়ের কিছু কারণ নেই, সেরকম কিছু জানতে পারলে দিদাজী আমাকে জানিয়ে দেবে।

এই ভাবে ওদের টেলিফোনে কথাবার্তা বোলে দেড় মাস কেটে গেল।

একদিন উদয় ফোনে মিঠুনকে বললো—এই কয়েকদিন হলো আমার ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এখন একবারে চুপচাপ বসে আছি। ড্যাডের সাথে কথা বলে ঠিক করেছি পরশুদিন আমেরিকাতে চলে যাব। তোমাকে যে আমেরিকার ফোন নম্বর দিয়েছিলাম, সেই ফোন নম্বর কি তোমার কাছে আছে?

মিঠুন বলল—দাঁড়াও, আমার নোট বইটা দেখে বলছি। নোট বই দেখে মিঠুন বলল, হাঁ, তোমার আমেরিকার ফোন নম্বর আছে। আর তোমার ড্যাডের নামও লেখা আছে সুজিত চ্যাটার্জি। ওরা ফোন রেখে দিল।

এর কয়েকদিন পরে একদিন হোটেলের অফিসে বসে কাজ করতে করতে মিস্টার ভার্মা ভাবলেন—আর তো সাতদিন পরই অনেক ধনবান ব্যক্তিরা আসবেন তার হোটেলে দেশ-বিদেশ থেকে। তাদের জন্যই এই চিত্তাকর্ষক নৃত্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে এইসব অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীদেরকে বিয়ে করবার জন্য পছন্দ করে নেওয়ার।

মিষ্টার ভার্মা ভাল করেই জানে এদের যদি এই সুন্দরীদেরকে পছন্দ হয়ে যায় তবে যে-কোন মূল্য দিতে এরা চিন্তা করবে না।

এই কথা ভেবে মিষ্টার ভার্মা নিজেই ড্রাইভ করে বিপিন ভাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে না জানিয়ে মিষ্টার ভার্মাকে আসতে দেখে বিপিন ভাইয়ের ভীত-চকিত দৃষ্টি ফুটে উঠলো চোখে। তাড়াতাড়ি মিষ্টার ভার্মাকে বিপিন ভাই বাড়ির ভিতর নিয়ে এলেন।

মিষ্টার ভার্মা মনে করেছিলেন এসে দেখবেন মিঠুন নাচ শিখছে। সেই নাচ দেখবার জন্যই তিনি এসেছিলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন মিঠুন একটা মোটা বই নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

মিষ্টার ভার্মা মিঠুনের কাছে গিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী পড়ছ?

রাজা দাদাজীকে দেখে ম্লান হাঁসি হেসে মিঠুন বলল—আমি ডাক্তারী বই পড়ছি।

মিষ্টার ভার্মা গম্ভীর স্বরে বললেন—এখন তোমার কোন ইয়ার?

মিঠুন প্রশান্ত মুখে বলল—এবার আমি থার্ড ইয়ারে উঠেছি।

মিষ্টার ভার্মার রাগে মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি ঠোঁট চেপে হেসে বললেন—এই কয়েকদিন আগে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পেপারে দেখেছিলাম বম্বের মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মিঠুন কাপুর কলকাতার সর্বভারতীয় ত্রিবার্ষিকী মেডিকেল ছাত্রদের উৎসব অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে এবং আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এখন বুঝতে পারলাম তুমিই সেই মিঠুন কাপুর। আমি খুব খুসী হয়েছি, কিন্তু নাচে প্রথম হতে পারলে না কেন?

মিঠুন মৃদুকণ্ঠে বলল—আমি ইচ্ছা কোরেই নাচের অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ করি নাই।

মিষ্টার ভার্মা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—তাহলে তো তুমি সর্বভারতীয়

একজন ট্যালেনটেড আর্টিষ্ট হয়েছ। এই বোলে তিনি বিপিন ভাইকে নিয়ে আরেকটা ঘরে চলে গেলেন।

প্রথমেই মিষ্টার ভার্মা রূঢ় ভাষায় তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন—আপনি আমাকে ভাল কোরেই চেনেন, কেউ আমার অবাধ্য হয় এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আপনি ভাল কোরে জানেন মিঠুনের জন্যে কেন এত টাকা খরচ কোরে ট্যালেনটেড করা হচ্ছে। ওকে আপনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করলেন আমাকে না জানিয়ে? এই স্পর্ধার কি শাস্তি হওয়া উচিত আমি ভাবতে পাচ্ছি না। আর তো আপনাকে একমুহূর্ত্তও বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে মিষ্টার ভার্মা বললেন—এখনি আমার গাড়িতে মিঠুনকে আর যে পাচটি মেয়ে আছে, সবাইকে তুলে দিন। আর এক দণ্ডও এরা কেউ এখানে থাকবে না। আমার হোটেলে ওদেরকে আমি নাচ শেখাবার ব্যবস্থা করব। আমার নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা এখানে নজরবন্দী থাকবেন। চাকর, ঠাকুর সব লোককে আজ রাতেই এখান থেকে সরিয়ে নেব। আপনাদের খাবার হোটেল থেকে আসবে। আমি গিয়ে গাড়িতে বসছি, সব মেয়েদেরকে আমার গাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। আরেকটা গাড়ি এসে এদের সব জিনিষপত্র নিয়ে যাবে, এই কথা বোলে মিষ্টার ভার্মা বিরক্তিভরে বিপিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তার গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

এই কথাগুলো বিপিন ভাইয়ের মনে চাবুকের আঘাতের মত লাগল। সারা বাড়িতে বিসাদের ছায়া নেমে এলো। সুষমাদেবী ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মিঠুনের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। বিপিন ভাই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তাই দেখে মিঠুন ধরা গলায় সজল নয়নে বলল—দাদাজী, দিদাজী আমাদের জন্যে চিন্তা কোরে কোন লাভ নেই, এই বলে সব

মেয়েদেরকে নিয়ে মুখ বিষণ্ণ করে মিষ্টার ভার্মার গাড়িতে গিয়ে বসল।

কারোর মুখে কোন কথা নেই। মনে একটা বিপুল উৎকণ্ঠা নিয়ে মিষ্টার ভার্মার সাথে যেতে লাগলো। অন্য সব মেয়েদের থেকে মিঠুনের মনের জোর একটু বেশী আছে। ও নিশ্চিত জানে উদয়কে ফোনে ওর বিপদের কথা জানালে সে চলে আসবে তাকে সাহায্য করতে। মনে মনে ভাবলো দেখি কি রকম বিপদ হতে পারে।

ওদের গাড়ি যখন সমুন্দরকা সুন্দরী হোটেলে প্রবেশ করছে, সমুদ্রের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে। আর সমুদ্রে ঢেউ এসে সেই রাস্তার দু-পাশে আছড়ে পড়ছে, তাই দেখে মিঠুন শুকনো হাসি হেসে বলল—রাজা দাদাজী আমাকে এমন সুন্দর জায়গায় এতদিন আনেন নি কেন? আমার সারা জীবন এরকম সুন্দর জায়গায় থাকাতে কোন আপত্তি নেই।

মিঠুনের কথা শুনে মিষ্টার ভার্মার চোখে ফুটে উঠলো একটা কৌতুকের হাসি। তিনি হাসি মুখে বললেন—তোমার জন্যই তো আমার এত উৎকণ্ঠা। আমার ইচ্ছা তোমাকে কোন দ্বীপের রাণী কোরে পাঠাতে। তখনি গাড়ি এসে হোটেলের গেটে থামল।
মিষ্টার ভার্মা গাড়ি থেকে নেমে সব মেয়েদেরকে বললেন—আমার সাথে এসো। সব মেয়েদেরকে নিয়ে তাঁর নিজের বিলাসবহুল আরামদায়ক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় চলে এলো। তার কামরায় প্রবেশ কোরে মিসেস ভার্মাকে বললেন—মিঠুনকে সমেত এই পাঁচটি মেয়েকে বিপিন ভাইর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি।

মিসেস্ ভার্মা মিষ্টার ভার্মার দিকে তাকিয়ে দেখল মিষ্টার ভার্মা রাগে সাদা হয়ে গিয়েছে। ভীত, চকিত-দৃষ্টি ফুটে উঠলো তার চোখে।

নির্মম হাসি হেসে মিষ্টার ভার্মা বললেন—সেখানে গিয়ে

দেখলাম বিপিন ভাই সব মেয়েকে পণ্ডিত তৈরী করছে। সঙ্গীত বা নৃত্য শেখাবার নাম নেই, আমি এদের জন্যে জলের মত অর্থ দিয়েছি, কিন্তু গিয়ে দেখলাম কাউকে ডাক্তার, কাউকে ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করছে। মেয়েদের ফিউচার সব নষ্ট করে দিয়েছে। সব স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছিল।

ধীর কণ্ঠে মিষ্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে বললেন—ডার্লিং তুমি ভাল কোরে জান এটাই আমার লাস্ট গেম। তুমি তো ক্যাবারে নর্ত্তকীদের চার্জে এতদিন ছিলে। তুমি এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই মেয়েদেরকে নৃত্যে পারদর্শী করে দাও, যাতে এদের নৃত্যানুষ্ঠান দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। তুমি এদেরকে আলাদা আলাদা ঘরে রেখে, তুমি সব বন্দবস্ত কর। তুমি সব সময় এদের তদারকি করবে। তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। আর কেউ এদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে না।

মিসেস্ ভর্মা বুঝে নিলেন—মিস্টার ভার্মা কী বলতে চাইছেন। তিনিও সব সুব্যস্থা করবার জন্য মেয়েদেরকে নিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিষ্টার ভার্মার কথায় এবং ব্যবহারে সব মেয়েদের আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওদের মুখ। হিম হয়ে গেল ওদের বুকের ভিতরটা।

মিসেস্ ভার্মা প্রত্যেক মেয়েকে আলাদা রুমে রেখে প্রত্যেককে আলাদা ভাবে বললেন—তোমরা যদি ভাল ভাবে থাক, তাহলে তোমাদের উপর কোন রকম রুঢ় ব্যবহার হবে না, আর যদি চালাকি করে পালাবার চেষ্টা কর, তাহলে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হবে।

মিঠুনকে থাকার জন্য একটা ভাল রুমে নিয়ে এলেন। সেই রুমে টেলিভিশন, রেডিও, এয়ারকনডিসন সবই আছে, কিন্তু টেলিফোন নেই।

মিঠুন মিসেস্ ভার্মাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ-কণ্ঠে বলল—দিদাজী, দাদাজীকে বলে আর দুটো বছর ডাক্তারী পড়বার সুযোগ করিয়ে দিন। তারপর আপনারা যা বলবেন, তাই শুনব।

মিসেস্ ভার্মা ম্লান হাসি হেসে বললেন—আমি সব বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মিষ্টার ভার্মা যা স্থির করেন, তাই করেন। তার কথার অবাধ্য হলে জীবন-সংশয় হতে পারে। আমার নিজের দুঃখের কথা আমার হৃদয়ের মধ্যে সব সময় কাঁটার মত বিঁধছে। কাউকে বোলে মন হাল্কা করার উপায় নেই। তুমি মিষ্টার ভার্মার কথার অবাধ্য হইও না। যদি সুযোগ পাও, তখন ইচ্ছা-অনুযায়ী কাজ করতে পার।

মিসস্ ভার্মা সব মেয়েদেরকে বললেন—আর সাতদিন পরে আমাদের এই হোটেলে নৃত্যানুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে অংশ-গ্রহণ করতে হবে। সেই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক ধনবান নির্মন্ত্রিত অতিথীবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন, তাদেরকে তোমাদের নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করতে হবে। আজ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তোমাদেরকে পুরুষদের মনোমুগ্ধকর পোষাক পরিয়ে নৃত্যের কলা-কৌশল শেখাব।

মিঠুন মিসেস্ ভার্মার কথা শুনে উদ্বেগে চিন্তান্বিত হয়ে স্থির করল—এদের সাথে এমন ভাব দেখাতে হবে, যাতে মিষ্টার ভার্মার আমার উপর কোনরূপ সন্দেহ না হয়। আমি অভিনয়ে চুড়ান্ত করব, দেখি আমার ভাগ্যে আরও কী আছে।

*　　　　*　　　　*

সেই চিত্তাকর্ষক নৃত্যের প্রদর্শনীর দিন, রাত দশটা থেকে নিমন্ত্রিত অতিথীগণ আসতে লাগলেন। সেই প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিত অতিথী ছাড়া বাইরের লোকের প্রবেশ নিশেধ ছিল। তাদেরকে ককটেল ড্রিঙ্কস পরিবেশন করা হাচ্ছল।

রাত এগারটার মধ্যে সব অতিথীবৃন্দ নিজের নিজের আসনে উপবেসন করলেন।

নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হোলো। হলে কোন জোরালো আলো ছিল না। অতিথীগণ ক্যাণ্ডেলের অস্পষ্ট আলোকে মদিরা পান করছিলেন।

অর্দ্ধ-নগ্না-বসনা হয়ে প্রত্যেকটি মেয়ে এক-একজন আলাদা আলাদা ভাবে নৃত্য পরিবেশন করছিল।

মিঠুন ওর নৃত্য পরিবেশন করল উর্দ্ধ-নগ্না-বসনা হয়ে। ফোকাসের জোরালো নানা রঙের আলোতে অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীদের চোখ, গাল, অনাবৃত নগ্ন-বক্ষ আর কুঞ্চিত নাভির অপূর্ব দৃশ্য দেখে এবং কঁচুলির অভ্যন্তর থেকে তাদের স্ফীত বক্ষ আরও স্ফীত হয়ে উঠছে দেখে, অ্যারাবিয়ানরা সেই উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণীদের অনাবিল সৌন্দর্য্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে। ওরা উদ্দাম হয় ওই তরুণীদের বুকভরা মধু লুঠ করার জন্য।

সবার নাচ হয়ে গেলে, মাইকে ঘোষণা করল—মাননীয় অতিথীবৃন্দ আপনারা এই সুন্দরী নৃত্য-পটিয়সীদের নৃত্য দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছেন।

এই সুন্দরীদের অনাবিল সৌন্দর্য্য অবলোকন করে ঘনিষ্ঠ ভাবে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। এখন এইসব সুন্দরী যুবতীরা তাদের বক্ষে নম্বর লাগিয়ে—এসে দাঁড়বে, খালি দু-মিনিটের জন্য। আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্রে সব কিছুই জানানো আছে। কাজেই এই অপ্সরাদের দেখে আপনাদের যা বক্তব্য কাগজে লিখে, স্টেজের কাছে বাক্সতে রেখে, আপনাদের বাসস্থানে চলে যান। কাল সকাল দশটায় মিষ্টার ভার্মার অফিসে দেখা করবেন, তিনিই আপনাদের সাথে ফাইনাল কথা বলবেন।

এই ঘোষণা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্টেজে রঙিন আলো জ্বলে উঠল আর মেয়েরা তাদের বুকে নম্বর লাগিয়ে লাইন করে দাড়াল।

দু-মিনিট—তারপর মেয়েরা যে যার রুমে চলে গেল, ব্যথিত হৃদয়ে, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পরের দিন সকাল দশটায় মিষ্টার ভার্মা হাসি মুখে তার অফিসে এসে দেখলেন বেশ কয়েক জন গত রাত্রের নৃত্যানুষ্ঠানের নিমন্ত্রিত ধনবান ব্যাক্তিরা বসে আছেন। তার মধ্যে একজনকে দেখে খুবই পুলকিত হোলেন। তিনি বহির্জগতে রোণাল্ড বোলে পরিচিত, কুয়েতের অধিবাসী এবং পৃথিবীব্যাপী কুখ্যাত ব্যবসায় লিপ্ত। তিনি মিঠুনকে বিয়ে করার জন্য পাঁচ লাখ টাকা উপঢৌকন দিতে রাজী আছেন।

আর সবার সাথে অন্য মেয়েদের ব্যপারে কথা সেরে, মিষ্টার ভার্মা মিষ্টার রোণাল্ডের সাথে মিঠুনের বিয়ের পাকা কথা বলে, বললেন—কাল এই সময়ে আমার অফিসে আসবেন ক্যাস্ টাকা নিয়ে, আপনাকে এবং সেই স্বপ্নের অপ্সরাকে নিয়ে আমার মিসেস ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে আপনাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ সম্পন্ন করিয়ে দেবেন। কালই আপনি আপনার নিউলি ম্যারেড ওয়াইফকে নিয়ে দেশে চলে যাবেন। আমার দায়িত্ব আপনাদের দু'জনকে রেজেস্ট্রি ম্যারেজ সম্পন্ন করিয়ে প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া।

এই টাকার অঙ্কের কথা ভেবে মিষ্টার ভার্মার মুখে ফুটে উঠলো তার সফলতার আনন্দের আভাস!

রোণাল্ড মিষ্টার ভার্মার সথে করমর্দন করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, আজই বিকেলে আপনার টাকা দিয়ে যাব।

তারপর মিষ্টার ভার্মা মিসেস ভার্মাকে কোমল-কণ্ঠে বললেন—মিঠুনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ও তো একজন মেডিকেল ছাত্রী। বহির্জগতের আলো দেখেছে। ওকে ম্যানেজ করাই কষ্ট হবে। ওকে বুঝিয়ে বোলব—আমার কথায় অবাধ্য হলে চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে মিসেস ভার্মা মিঠুনকে মিষ্টার ভার্মার কাছে

নিয়ে এসে বসাল—মিষ্টার ভার্মা মিঠুনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়ন।

মিঠুন দেখল মিষ্টার ভার্মা তার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাই দেখে মিঠুনের মনে পড়ে গেল—সে কী করবে বোলে স্থির করে রেখেছে। অমনি চূড়ান্ত অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হোলো।

মিঠুন মনের বিপুল উৎকণ্ঠা চেপে চক্ষু বিস্ফারিত করে বলল—রাজা দাদাজী, আপনি আমাকে ডেকেছেন? এ আমার কী সৌভাগ্য!

মিঠুনের কথায় মিষ্টার ভার্মার হৃদয় একটু নরম হোলো। পরক্ষণেই ভাবলেন—এতো দেখছি ওভার স্মার্ট।

মিষ্টার ভার্মা মনের ভাব প্রকাশ না করে ধীর-কণ্ঠে বললেন—আজ তোমার জীবনের সব কথা বলব। তোমার সাথে আমার আর কোন দিন দেখা হবে না। সেইজন্য তোমার জীবনের সব কথা আমার জানানো কর্ত্তব্য। তা না হলে তুমি সারা জীবন ধরে চিন্তা করবে—তুমি কে?—তুমি কলকাতার মেয়ে, এখন তোমার বয়স উনিশ বছর। ষোল বছর আগে তোমার যখন তিন বছর বয়স তখন তোমার পেয়ারের আংকেল তোমাকে শেষ করে দেবার জন্য, কলকাতার সন্নিকটে সন্ধ্যার আবছায়ায় রেললাইনের ধারে ফেলে পালিয়ে যায়, বুঝেছ মিঠুন? এই হোলো তোমাদের কলকাতার আংকেল। আমার বিশ্বস্ত অনুচর ম্যাক তার জীবন বিপন্ন করে রেলের চাকার নিচ থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে এনেছে। আমি অজস্র টাকা খরচ করে তোমাকে সঙ্গীতে পারদর্শিণী এবং নৃত্যে পটিয়সী করে তুলেছি। আমি মনে করি তোমার লেডি ডাক্তার হয়ে কোন লাভ হবে না। মেয়েরা এই পৃথিবীতে জন্মেছে আরাম করার জন্য।

মিঠুনের ভেসে উঠলো সেই পুরনো দিনের স্মৃতী। আর অমনি মনে হোলো পাপাজী মামিজীর কথা।

মিষ্টার ভার্মা গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন—তোমার খুব ধনবান

—ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে আমার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করব। একটা কথা মনে রাখবে—আমার কেউ অবাধ্য হয় এটা আমি পছন্দ করি না এবং বরদাস্তও করতে পারি না। অবাধ্য হলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হয়। কাল সকাল দশটায় তুমি রেডি হয়ে থাকবে, মিসেস্ ভারমা তোমাকে ও মিষ্টার রোণাল্ডকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে তোমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ সম্পন্ন করাবেন। আর কালই বিকেলের ফ্লাইটে তোমাকে নিয়ে মিষ্টার রোণাল্ড তার দেশে চলে যাবেন। আশাকরি তুমি শান্তিপুর্ণ ভাবে আমার এই আদেশ মেনে নেবে। এই বলে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি হেনে মিষ্টার ভার্মা ওই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই কথা শুনে মিঠুনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হিম হয়ে গেল বুকের ভিতরটা। শরীরের ভিতর কী রকম করে উঠলো। কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে বসে থাকলো চোখ বুজে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পেলো সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস্ ভার্মা। তাকে দেখে অঝোরধারায় কেঁদে ফেললো, আর বলল—আমি আর ভাবতে পারছি না। কাল দশটায় আপনার সাথে যাব।

মিঠুন বুজতে পারল সে নজরবন্দী হয়ে আছে। সারা রাত বিনিদ্রায় কেটে গেল। কী করে উদয়কে আমেরিকাতে তাদের বাড়িতে তার এই বিপদের খবর দেবে। নোট বই খুলে ফোন নম্বর দেখে দেখে মুখস্থ করে ফেলেছে, কিন্তু কী কোরে ফোন করবে কোন রাস্তাই খুঁজে পেল না। দুশ্চিন্তায় মন অসাড় হয়ে গেলো—আর চিন্তা করতে পারছে না। ভাগ্যের পায়ে নিরুপায় হয়ে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

পরের দিন সকাল দশটারসময় মিঠুন নয়ন-মুগ্ধ পোষাকে সজ্যিতা হয়ে মিসেস্ ভার্মার সাথে মিষ্টার ভার্মার অফিসে গিয়ে দেখল মিষ্টার ভার্মা তাঁর পিতৃতুল্য বয়স্ক একজন বহুমুল্য পোষাক পরিহিত লোকের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

মিঠুনকে চিত্তাকর্ষক সাজে দেখে সেই ধনবান ব্যক্তি একদৃষ্টে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

মিষ্টার ভার্মা ওদের দুজনকে বললেন—উইস্ ইউ হ্যাপি ম্যারেড লাইফ। আর মিষ্টার রোণাল্ড উঠে দাঁড়িয়ে বাই বাই বোলে মিসেস্ ভার্মা ও মিঠুনের সাথে রওনা দিল।

মিসেস ভার্মা ওদেরকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যেতেই, রেজিস্ট্রেশন অফিসার বললেন—এইমাত্র মিষ্টার ভার্মার ফোন পেয়েছি, এখনি সব বন্দবস্ত করে দিচ্ছি। এই বলে সেই অফিসার তিন কপি ফর্ম বের করে লিখে দুজনকে দিয়ে তারিখ দিয়ে সই করালেন। ওরা দুজনেই লিখলো আমরা দুজনেই স্বেচ্ছায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্চি।

মিঠুন ও রোণাল্ড দুজনে এক এক কপি করে নিল আর অফিসে এক কপি থাকল। দুজনে করমর্দন করে মিসেস্ ভার্মার সাথে ওই অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে বসল। মিসেস ভার্মা মিঠুনের পাশপোর্ট রোণাল্ডের হাতে দিলেন আর দুটো এয়ার টিকিট দিয়ে বললেন—আজ বিকেল চারটায় আপনাদের ফ্লাইট। এই ফ্লাইটেই আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল সকাল নটায় লণ্ডন পৌছবে। সেখান থেকে অন্য ফ্লাইটে আপনার দেশ কুয়েতে চলে যাবেন। আমার অনুরোধ মিষ্টার রোণাল্ড আপনি আপনার এই নিউলি ম্যারেড ওয়াইফকে খুব যত্নে রাখবেন। এ খালি সুন্দরী নয়, সর্বগুণসম্পন্না।

তারপর মিসেস ভার্মা ওদেরকে মৃদু হেসে বললেন—আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে, বম্বে শহর ঘুরে এয়ারপোর্টে চলে যাবেন।

মিষ্টার রোণাল্ড মিঠুনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুজলো মিঠুনেরও এখন ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা। তাই মিসেস ভার্মাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ওরা গাড়ি নিয়ে মেরিন ড্রাইভের দিকে চলল। মিঠুনের একটা হাত রোণাল্ডের হাতের মধ্যে দৃঢ় করে ধরা রয়েছে।

মিঠুন রোণাল্ডের দিকে ঘৃণায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে পর মুহূর্তে মুখে হাসি ফুটিয়ে ভাবল—এই বম্বেতে কেউ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আসবে না। একমাত্র উদয় ছাড়া। উদয়কে এখনি যে-কোন উপায়ে ফোন করতেই হবে। পরক্ষণে হাসি হাসি মুখ তুলে রোণাল্ডের দিকে তাকিয়ে মিঠুন বলল—ডার্লিং আমার একটা অনুরোধ রাখবে? ডার্লিং বলাতে রোণাল্ডের মুখমণ্ডল খুশীতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল, বলল—বল ডার্লিং আমাকে কী করতে হবে। আমি নিশ্চয়ই করব।

মিঠুন উচ্ছল হয়ে উঠে বলল—চল, তুমি আর আমি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসি।

রোণাল্ড চক্ষু বিস্ফারিত করে বলল—খালি এই তোমার অনুরোধ? চল, তোমাদের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে আসি।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মিঠুনের মেডিকেল কলেজের সামনে থামাল। মিঠুন আর রোণাল্ড ওদের কলেজে প্রবেশ করল।

রোণাল্ডকে ওদের অফিস রুমে বসিয়ে মিঠুন সুমধুর কণ্ঠে বলল—ডার্লিং তুমি একটু বস, আমি দেখে আসি প্রিন্সিপাল আছেন কি-না। এই বোলে মিঠুন কলেজের ভিতর চলে গেল।

মিঠুনের সুচতুর অভিনয়ে রোণাল্ড কিছুই সন্দেহ করতে পারলো না।

মিঠুন ওদের ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে উদয়কে ওর আমেরিকার বাড়িতে ফোন লাগাল। একটু পরে আমেরিকা থেকে অপারেটর বলল—উদয় চ্যাটর্জির সাথে কথা বলুন। অমনি ফোনে উদয়ের গলার স্বর ভেসে উঠল।

মিঠুন ভেজা ভেজা গলায় সব ঘটনা উদয়কে বলল। পরিশেষে তাকে একথাও বলল—কাল সকাল ন'টায় সময় আমরা লণ্ডন এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌছব। তুমি যদি সেই সময় লণ্ডন এয়ারপোর্টে

এসে আমাকে এই দুর্বিত্তর কবল থেকে উদ্ধার করতে না পার, তবে তোমার কাছ থেকেও আমি হারিয়ে যাব, আর কোনদিন দেখা পাবে না। লণ্ডন-এয়ারপোর্টে পৌঁছানর এক ঘণ্টা পর কুয়েতে যাবার ফ্লাইট, সেই ফ্লাইটেই রোণাল্ড আমাকে নিয়ে যাবে। তার কাছে এক কপি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট রয়েছে। কাজেই আমাকে নিয়ে যেতে তার কোন অসুবিধা হবে না। আমি আর দেরী করতে পারছি না। কলেজের অফিসে রোণাল্ডকে বসিয়ে রেখেছি।

উদয় দৃপ্ত সতেজ-কণ্ঠে বলল—মিঠুন, তুমি একটুকুও আতঙ্কিত হবে না। তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা আমার নৈতিক দায়িত্ব এবং পবিত্র কর্তব্য। তুমি লণ্ডনে পৌঁছবার আগেই আমি পৌঁছে যাব। তুমি হাসি মুখে রোণাল্ডের সাথে চলে যাও।

মিঠুন উদয়ের সাথে কথা বলে মনের বিষণ্ণতা কাটিয়ে, মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি রোণাল্ডের কাছে এসে বলল – প্রিন্সিপাল আজকে ভীষণ ব্যস্ত।

দু'জনে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসল। তারপর ওরা ঠিক করল – হোটেলে ফিরে, লাঞ্চ সেরে, লাগেজ গুছিয়ে এই তিনটে নাগাদ এয়ারপোর্টে রওনা দেবে।

ওরা হোটেলে ফিরে এসে দু'জনে এক সঙ্গে ডাইনিং হলে বসে লাঞ্চ করল। লাঞ্চ শেষ হলে মিঠুন রোণাল্ডকে শান্তকণ্ঠে বলল— তুমি তোমার ঘরে গিয়ে একটু রিলাকস করে নাও আর আমিও আমার ঘরে গিয়ে একটু রিলাকস করি। ঠিক তিনটের সময় আমারা হোটেলের গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে রওনা দেব। এই বলে যে যার রুমে চলে গেল।

মিঠুন তার রুমে গিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাজ-পোষক না বদলিয়ে নরম বিছানার উপর শরীর এলিয়ে দিল। তার মনের নিরানন্দের ভাব, দুর্ভাবনা সব কেটে গেল। একদিন তো

বিনিদ্রায় কেটেছে। শুয়ে পড়ার সাথে সাথে গভীর নিদ্রামগ্ন হলো।

তিনটে বাজার অল্প কিছু আগে মিসেস ভার্মা মিঠুনের পিছনের রুমের কাছে এসে দেখল—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। অত জোরে দরজা ধাক্কার শব্দে মিঠুনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মিঠুন দরজা খুলে দিল।

মিঠুনের ওই রকম অবিন্যস্ত বেশভূষা দেখে মিসেস ভার্মা বললেন—কী ব্যাপার তুমি এখনো ঘুমচ্ছো? তোমাদের তিনটের সময় এখান থেকে রওনা হতে হবে না? আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে। এই দশ মিনিটের মধ্যে তুমি রেডি হয়ে নাও। এই বলে মিসেস ভার্মা চলে গেলেন।

ঠিক চারটের কিছু আগে ওরা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল।

মিষ্টার ভার্মার অনুচরেরা দেখলো মিস্টার রোণাল্ড মিঠুনকে নিয়ে প্লেনে উঠলো এবং কিছুক্ষণ বাদে প্লেন ছেড়ে চলে গেল।

মিষ্টার ভার্মা তার অনুচরের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

পরের দিন ঠিক সকাল ন'টার সময় ওদের প্লেন লণ্ডন এয়ার-পোর্টে এসে পৌছল।

সেদিন উদয় মিঠুনের ট্রাঙ্কল পেয়ে সেই দিনই বিকেলের ফ্লাইটে আমেরিকা থেকে রওনা দিয়ে, আজ সকাল সাতটায় লণ্ডন এয়ারপোর্টে এসে পৌছে গেল।

উদয় দেখল মিঠুনের প্লেনও ঠিক ন'টার সময় এসে পৌছেছে এবং একে একে সবাই প্লেন থেকে নামছে।

উদয় দূর থেকে তাকিয়ে দেখল—এক জন প্রৌঢ় ব্যক্তি মিঠুনের হাত দৃঢ় ভাবে ধরে প্লেন থেকে সিড়ি বেয়ে নামছে।

দূর থেকে উদয় রুমাল নেড়ে ঈশারায় মিঠুনকে জানালো—সে এয়ারপোর্টে এসেছে।

উদয় কাস্টম-গণ্ডির বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাসপোর্ট ও কাস্টমসের চেকিং শেষ হয়ে গেলে রোণাল্ড মিঠুনের হাত দৃঢ়ভাবে ধরে বেরিয়ে আসতেই, উদয় চেঁচিয়ে বলল—মিঠুন ডার্লিং তুমি এসে গিয়েছ? মিঠুন রোণাল্ডের হাত জোরে ঝাকুনি দিয়ে ওর কবল মুক্ত হয়ে দৌড়ে উদয়কে জড়িয়ে ধরল।

রোণাল্ড এই জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে দিশেহারা হয়ে ওদের দিকে কোপদৃষ্টিতে তাকিয়ে দৌড়ে গিয়ে মিঠুনের হাত ধরে বলপূর্বক উদয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

একটি সুন্দরী যুবতীকে দুজন পুরুষের এই টানাটানির অদ্ভুত দৃশ্য দেখে একটা ভীড় জমে গেল। আর সাথে সাথে পুলিশও এসে গেল।

পুলিশ ওদের তিনজনের কথা শুনে তিনজনকেই আদালতে বিচারকের দরবারে উপস্থিত করল।

মাননীয় বিচারপতি দু'জনেরই ম্যারেজ সারটিফিকেট দেখে বললেন—উদয় ও মিঠুনের ম্যারেজ সারটিফিকেট অনেক আগেকার আর রোণাল্ডের সারটিফিকেট তো এই সেদিনকার।

তারপর সব কাগজপত্র দেখে মাননীয় বিচারপতি ধীরকণ্ঠে বললেন—মিঠুন তোমার সব কাগজপত্র দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বয়স বাইশ বছর। কাজেই তুমি এখন সাবালিকা, তুমি যার সাথে খুসী যেতে পার এবং যেখানে খুসী যেতে পার। আইনত তোমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, সো হউ আর সেট্ এ্যাট্ লিবার্ট। আর রোণাল্ডকে বললেন—তুমি এই মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জোর-জবরদস্তি করবে না—তাহলে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হবে, আর পুলিশকে নির্দেশ দিলেন—এরা এই দেশ ছেড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত এদের উপর নজর রাখতে।

উদয় ও মিঠুন হাত ধরাধরি করে কলহাস্যে আদালত কক্ষ

থেকে বেরিয়ে গেল। রোণাল্ড একদৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে একটু জোরেই বলল—ব্লাডি ভার্মা চিটেড্ মি এ হিউজ এ্যামাউন্ট।

উদয় মিঠুনকে নিয়ে এয়ারপোর্টের কফেতে গিয়ে বসল। উদয় স্ন্যাকস ও কফির অর্ডার দিল। মিঠুন জলভরা চোখে হাসি হাসি মুখ তুলে উদয়ের দিকে তাকাল। ওর চোখের চাউনি উদয়কে আরও সজীব করে তুলল।

উদয় মৃদু গলায় বলল—চলো মিঠুন ড্যাড্‌কে ফোন করে আসি। কাল সকাল দশটায় ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে আসতে। আজকে আমরা বিকেলের ফ্লাইটে রওনা দিয়ে কাল সকাল দশটায় ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাব।

ওরা দু'জনেই ফোন করতে উঠে গেল। এয়ারপোর্ট পাবলিক ফোন থেকেই উদয় ওর ড্যাড্‌কে ফোনে বলল—এখানে আসবার আগে তো তোমাকে সব কথা বলে এসেছি। মিঠুন এখন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে, ওকে দুবৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। আমরা কাল সকাল দশটায় ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাব। আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি নিয়ে আসবে। ড্যাড্ মিঠুনের সাথে একটু কথা বল, এই বলে রিসিভার মিঠুনের হাতে দিল।

মিঠুন ফোনের রিসিভার ধরেই সুমধুর কণ্ঠে বলল—প্রণাম ড্যাড্, আপনার কথা উদয়ের কাছে অনেক শুনেছি, আপনি উদয়ের ড্যাড , আমার পাপাজী।

অপর দিক থেকে উদয়ের ড্যাড্ বললেন—তোমার কণ্ঠের স্বর এতো সুইট, তুমি দেখতেও নিশ্চয় খুবই সুন্দর। কাল তো তোমরা আসছ? কালই দেখা হবে এই বলে ফোন রেখে দিলেন।

মিঠুন উদয়ের ড্যাড্‌কে পাপাজী বলাতে সুজিত চ্যাটার্জির দুশ্চিন্তায় বুক কেঁপে উঠল আর অমনি টিঙ্কুর মুখ-চোখের উপর ভেসে

উঠল। মনে পড়ল টিঙ্কুর ঠোঁটের নিচে একটা গোলাকার কালো দাগ আর হাতে কব্জির কাছে উল্কি লেখা A. S.। যে লোকটা এই দুটি অক্ষর টিঙ্কুর হাতে মেশিন দিয়ে এঁকে ছিল, তার কথাও মনে পড়ল। সে বলেছিল সাব, এ যে খুকুর হাতে লিখিয়ে নিলেন, খুব ভাল হোলো—ওর একটা নিশানা থেকে গেল হারিয়ে গেলে এই নিশানা দেখে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরের দিন তার কন্‌টিনেণ্টাল গাড়ি নিয়ে সুজিত চ্যাটার্জি দশটার কিছু আগে ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন। ঠিক দশটা বাজার সাথে সাথে প্লেনটা লণ্ডন থেকে ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে এসে নামল।

উদয় মিঠুনকে নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে ওর ড্যাডের সামানে—দাঁড়াল।

উদয় মিঠুনকে বলল—মাই ড্যাড্, সুজিত চ্যাটার্জি। মিঠুন অমনি অবনত হয়ে পা-ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সুজিত চ্যাটার্জি মিঠুনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে, মিঠুনের মুখ তুলে একদৃষ্টে দেখলেন—দেখলেন সেই মুখ। সেই ঠোঁটের নিচে গোলাকার কালো দাগ—তৎক্ষণাৎ মিঠুনের হাত ঘুরিয়ে দেখলেন—সেই A. S. দুটি অক্ষর হাতে কব্জির কাছে পরিষ্কার জ্বল জ্বল করছে।

সব ভুলে আবেগের স্বরে সুজিত চ্যাটার্জি বলে উঠলেন—টিঙ্কু, তুমি বেঁচে আছো ?

সুজিত চ্যাটার্জির মুখে ওর নাম টিঙ্কু শোনাতে মিঠুনের পরিষ্কার ভেসে উঠলো সেই পুরনো দিনগুলির ছবি। মনে পড়ল মিষ্টার ভার্মার কথা। মিষ্টার ভার্মা এখানে আসার একদিন আগে আমাকে বলেছিলেন—তোমার তিন বছর বয়সের সময় তোমার আংকেল তোমাকে রেল লাইনের উপর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। এই কথাটাই তার বার বার মনে হতে লাগল—আর তার স্থির বিশ্বাস হোলো

এই সেই শয়তান আংকেল। অধৈর্য্য হয়ে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে অঝোর-ধারায় কেঁদে ফেলে বলল—আংকেল—তোম্ হামারা জীবনকো বরবাদ করদিয়া? তোমারা হাম কেয়া বিগাড়া?

এই কথা বোলে মিঠুন জ্ঞান হারিয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল।

উদয় দিশা হারিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ওর ড্যাডের মুখের দিকে তাকিয়ে বেহুসের মত দাঁড়িয়ে থাকল।

সুজিত চ্যাটার্জি আনত মুখে উদয়কে বলল—ওকে কোলে করে গাড়িতে নিয়ে এসে পিছনের সিটে শুইয়ে দাও। ভয়ের কোন কারণ নেই। শক্ পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

ড্যাডের কথা শুনে ওর সম্বিত ফিরে এলো। উদয় ওর একটা হাত মিঠুনের গলার নিচে দিল আরেকটা হাত দুই উরুর নিচ দিয়ে দৃঢ় করে ধরে কোলে তুলে গাড়ির পিছনের সিটে শুইয়ে দিল।

সুজিত চ্যাটার্জি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। চোখ-মুখে ফুটে উঠল তার অনুশোচনার বেদনা। যেতে যেতে মাঝ পথে একটা ওষুধের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে উদয়কে বলল—আমি একটা ওষুধ নিয়ে আসছি মিঠুনের জন্য।

সেই ফার্মেসির মালিক সুজিত চ্যাটার্জির বিশেষ পরিচিত, সুজিত চ্যাটার্জি তাঁকে বললেন—আমার দুটো ওষুধের বিশেষ প্রয়োজন, একজন শকে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—তার জ্ঞান ফেরানোর জন্য একটা ওষুধ, আর এমন আরেকটা ওষুধের প্রয়োজন যা খেলে দশ মিনিটের মধ্যে যে কোন প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে।

সেই পরিচিত ফার্মেসির মালিকের সুজিত চ্যাটার্জির উপর কোন সন্দেহ না কোরে, ওই দুটো ওষুধই দিলেন।

গাড়িতে ফিরে এসে উদয়কে জ্ঞান ফেরানোর ওষুধ দিয়ে উদয় চ্যাটার্জি বললেন—বাড়িতে পৌঁছে মিঠুনকে এই ওষুধটা খাইয়ে দেবে। দেখবে কিছুক্ষণ বাদেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।

বাড়িতে পৌঁছে মিঠুনকে আলতভাবে কোলে করে ও ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর ওই ওষুধ খাইয়ে দিয়ে, চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিস্পলক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

*　　　　*　　　　*

উদয় চ্যাটার্জি ওর ঘরে গিয়ে বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে চুপ করে রইল ক্ষণকাল, তারপর টেবিল-চেয়ারে বসে, ব্লাটিং-প্যাড নিয়ে লিখল—

মাই ডিয়ারেস্ট সন্ উদয় !

আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি, আমি যে পাপ করেছি তার কোন ক্ষমা নেই। আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনা। আমি অনেক ভেবে স্থির করলাম—আমার নিজের হাতে মৃত্যুই হোলো আমার পাপের একমাত্র শাস্তি।

আমি আমার মৃত্যুর আগে আমার সব অপরাধ স্বীকার করে যেতে পারছি বলে, মনে একটু শান্তি পাচ্ছি।

উদয়, তোমার মা মিসেস্ লুসিকে যেকোন কারণেই হোক না কেন—আমি তাঁকে আমার ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে হত্যা করেছি।

উদয়, তোমার ওয়াইফ মিঠুন। যার আসল নাম টিঙ্কু। তার মা আমার বন্ধু-পত্নী মিলির উপর আক্রোশের বশে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য টিঙ্কুকে তার তিন বছর বয়েসের সময় এক সন্ধ্যায় আবছায়ায় রেললাইনে ফেলে দিয়ে আমেরিকাতে পালিয়ে এসেছিলাম। তোমার মনে পড়বে—এর আগে তুমি যখন এখানে এসেছিলে, তোমকে বোলেছিলাম—যে-কোন কারণেই হোক—ইণ্ডিয়াতে যাবার আমার কোন পথ নেই। আমি তোমাকে বলেছিলাম একদিন সেই কারণ বোলব, আজ তোমাকে সেই কারণ বোলে যাচ্ছি—

টিঙ্কুর জ্ঞান ফিরে এলে, টিঙ্কুর পাপাজী অলক সেন অথবা

টিঙ্কুর মামিজী মিলি সেনকে তাদের কলকাতার বাড়িতে ফোন কোরে সব বলবে। এদের কাউকে না কাউকে বাড়িতে পাবে। এই টেবিলের উপর একটা নোট বইতে টিঙ্কুর পাপাজী ও মামিজীর কলকাতার ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা আছে।

তারপর পুলিশকে ফোন করে বলবে আমার ড্যাড্ কমিটেড সুইসাইড, তারা এসে আমার ডেড্বডি নিয়ে যাবে, তোমাকে আর কষ্ট কোরে আমার ডেড্বডি ডিস্পোজ করতে হবে না।

টিঙ্কুর পাপাজী ও মামিজী এখানে এলে আমার বডি মরগে গিয়ে সনাক্ত করবে।

আমি এখন সেচ্ছায় বিষপান করলাম। আর দশ মিনিটের মধ্যে আমার প্রাণ আমার দেহ থেকে বেরিয়ে অনন্তর সঙ্গে মিশে যাবে। পড়ে থাকবে আমার এই বিসাক্ত দেহখানি

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—তোমরা যেন জীবনে সুখী হও।

ইতি—

তোমার ড্যাড্—সুজিত চ্যাটার্জি

তারপর সুজিত চ্যাটার্জি অন্য কিছু ভাববার আগে বিষ পান করল চিঠি আর নোট বই টেবিলের উপর রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দশ মিনিটের মধ্যেই চীর-নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

* * *

ওষুধ খাওয়াবার দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই মিঠুনের জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল উদয় ম্লান মুখে সজল-নয়নে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মিঠুনের জ্ঞান ফিরে আসতে উদয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—এখন কেমন আছ?

মিঠুন বিছানার উপর উঠে বসে বলল—মনের অন্তস্থলে কী রকম গোলমাল পাকিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

নবাব গরম দুধ এনে দিল, তাই খেয়ে মিঠুন অনেকটা সুস্থ্যবোধ করে নিস্প্রীহকণ্ঠে বলল—আমার উপর দিয়ে এই কদিন ধরে যে নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুরতা বয়ে গিয়েছে, তাতে দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় আমার মন অসাড় হয়ে গেছে, তার উপর তোমার ড্যাড্‌কে দেখে, আমার পূর্ব-স্মৃতি মানষপটে ভেসে উঠল আর মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। এখন অনেক ভাল বোধ করছি। উদয়, তুমি তোমার ড্যাড্‌কে দেখে এস—তিনি কি করছেন।

মিঠুনের কথা শুনে উদয়ের চিন্তা-শক্তি লোপ পেয়ে গেল। মন্ত্রচালিতের মত ওর ড্যাডের ঘরের কাছে গিয়ে দেখল—দরজা ভেজান আছে।

উদয় উৎকণ্ঠিতস্বরে বলল—ড্যাড্‌ আমি আসব? কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে উদয় কোন উত্তর বা শব্দ শুনতে পেল না। একটু অপেক্ষা করে দরজা ঠেলে খুলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে ব্যথিত-হৃদয়ে দেখল—ওর ড্যাড্‌ বিছানায় শায়িত অবস্থায় রয়েছে, দেহ অসাড়। ভীত-নয়নে তাকিয়ে দেখল শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না? শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কোন লক্ষণ দেখল না। বুকের উপর কান রেখে বুজল—ওর ড্যাড্‌ মৃত, অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

উদয় শোকাচ্ছন্ন হয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—ড্যাড্‌, তুমিই আমার একমাত্র আপনজন ছিলে, আজ তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে গেলে।

উদয়ের ক্রন্দন শুনে মিঠুন দৌড়ে ওই ঘরে গিয়ে দেখল—উদয় ওর ড্যাডের বুকের উপর মাথা রেখে অঝোরে কেঁদে কেঁদে কতসব দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে।

মিঠুন উদয়কে ওর ড্যাডের অসাড় দেহের উপর থেকে সরিয়ে

নিয়ে একটা চেয়ারে বসাল। তারপর একটা চাদর দিয়ে ওর ড্যাডের মৃতদেহ ঢেকে দিল। তারপর দেখল একটা চিঠি টেবিলের উপর রয়েছে। একটা নোট বই দিয়ে চাপা দেওয়া আছে।

মিঠুন চিঠিটা নিয়ে পড়ল। তারপর চিঠিটা উদয়কে দিয়ে বলল—তুমি পড়ে দেখ। তোমার ড্যাড্ সুইসাইড করেছেন। এখন আমাদের কিছু করার নেই। এটা পুলিশ কেস। এখনি পুলিশকে ফোন করে দিচ্ছি, পুলিশ এসে ডেড্‌বডি নিয়ে যাবে। তারপর এনকোয়ারি শেষ হলে, ওরাই ডেডবডি ডিসপোজ করবে। উদয়, তুমি কেঁদ না, কার মৃত্যু কী ভাবে হবে। বিধাতাই ঠিক করে রেখেছেন, তার অন্যথা কোন সময় হয় না।

এই বলে মিঠুন পুলিশকে ফোন করে এই সুইসাইডের মৃত্যুর কাহিনী বোলল।

উদয় তার ড্যাডের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী পড়ে দিশাহারা হয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এই মিনিট পনরর মধ্যেই পুলিশের ভ্যান কুঁই কুঁই আওয়াজ করে ওদের বাড়ির সামনে এসে থামল।

পুলিশ বাড়িতে ঢুকে—সুজিত চ্যাটার্জির ডেড্‌বডি, টেবিলের উপর রাখা একটা ওষুধের শিশি এবং সুজিত চ্যাটার্জির মৃত্যুকালিন লেখা চিঠি নিয়ে গেল, আর বলে গেল তিন দিন ডেড্‌বডি মর্গে রাখা হবে, যদি কোন আত্মীয় ইণ্ডিয়া থেকে আসে তাদেরকে দেখাবার জন্য।

* * *

মিঠুন টেবিলের উপর থেকে নোট বইখানি নিয়ে ওদের কলকাতার বাড়ির ফোন নম্বর নিয়ে, ফোনের অপারেটরকে সেই ফোন নম্বর দিয়ে কলকাতায় লাগিয়ে দিতে বলল। মিঠুন অপারেটারকে অনুরোধ করে বলল—একজনের মৃত্যুর খবর দিতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি ফোনে কথা বলা একটু জরুরী হয়ে পড়েছে।

আমেরিকান অপারেটার বলল—ইণ্ডিয়ার মধ্যে কলকাতায় তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ককল কানেক্ট করা খুবই দুরুহ ব্যাপার, তবে আমি চেষ্টা করছি যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

কলকাতায় তখন রাত দশটা হবে। অলক ও মিলি একটু আগে ডিনার সেরে শুয়ে পড়েছে, সেই সময় অতর্কিতে ফোন বেজে উঠল। এতো রাত্রে হঠাৎ ফোনের শব্দে অলক উৎকণ্ঠিত হয়ে ফোন ধরল।

কলকাতার অপারেটর বলল—আপনি অলক সেন? আমেরিকা থেকে আপনার মেয়ে টিঙ্কু কথা বলছে—আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলুন। ফোনে অমনি টিঙ্কুর মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল। পাপাজী আমি টিঙ্কু বলছি। আমি ভাল আছি। মামাজী কোথায়?

অলক বিহ্বল হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বলল—মিলি, আমাদের হারানো টিঙ্কু কথা বলছে। মিলি তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধরে শুনতে পেল টিঙ্কু বলছে—মামিজী কালই তোমরা এখানে চলে এসো। আমার খুবই বিপদ। উদয়ের ড্যাড্ সুজিত চ্যাটার্জি আজ সুইসাইড করেছে। আমেরিকার ফোন নম্বর, ঠিকানা দিয়ে বলল—তোমরা আসবার আগে আমাকে ফোনে জানাবে, তোমাদেরকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যাব।

অপারেটার সময় হয়ে গিয়েছে দেখে ফোন কেটে দিল।

টিঙ্কুর ফোন পেয়ে ওর গলার স্বর শুনে অলক ও মিলি আনন্দিতাশয্যে সারারাত কথা বলে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিল ওদের চোখে-মুখে এক অনাবিল আনন্দ ফুটে উঠল।

উষার আলোকে নিল আকাশ থেকে স্নিগ্ধ রোদ নেমে এসেছে, আর দেরী না করে অলক ও মিলি গাড়ি নিয়ে ওদের সলিসিটার বাসুসাহেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

বাসুসাহেব তাঁর প্রাতঃভ্রমণ সেরে সবেমাত্র বাড়ি ফিরে অলক ও মিলিকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এতো সকালে কী ব্যাপার?

বাসুসাহেব সব শুনে বলেলন—সেই পুরনো ডিসি ডিডির কেস নম্বর আছে ?

অলক সেন বললেন—আছে, ওই কেস সংক্রান্ত সব কাগজ আছে।

তখন সলিসিটার বললেন—এখন তো মাত্র সাতটা বাজে, আপনাদের মনের অবস্থায় অধৈর্য্য হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু লালবাজারে গিয়ে এখন তো কাউকে পাব না। আমি রেডি হয়ে থাকব, আপনারা ঠিক সাড়ে ন'টায় আমার এখানে চলে আসুন, দেখি কী করা যায়।

অলক আর মিলি বাড়িতে চলে এসে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টিঙ্কুর দুঃশ্চিন্তায় এতদিন ওদের মনের ভিতরটা হু-হু করে উঠত নিদাম মধ্যাহ্নের মত, কিন্তু টিঙ্কুর সাথে কথা বলার পর ওদের চোখে-মুখে এক অনাবিল আনন্দ ফুটে উঠল। খালি ভাবনা যত তাড়াতাড়ি টিঙ্কুর কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।

ঠিক সাড়ে নটায়—ওরা, সলিসিটার বাসুসাহেবের বাড়িতে এসে পৌঁছে গেল। বাসুসাহেবও রেডি হয়েই ছিলেন। বাসুসাহেব ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

লালবাজারে পৌঁছে বাসুসাহেব ডিসি ডিডির সাথে দেখা করার জন্য শ্লিপ দিলেন। শ্লিপ পেয়ে ডিসি ডিডি বাসুসাহেবকে ডেকে পাঠালেন। বাসুসাহেব মিষ্টার এবং মিসেস্ সেনকে নিয়ে ডিসি ডিডির অফিস রুমে প্রবেশ করলেন।

বাসুসাহেব ডিসি ডিডিকে বললেন—উনিশ বছর আগেকার ঘটনা—মিষ্টার এবং মিসেস্ সেনকে দেখিয়ে বললেন—এদের বন্ধু সুজিত চ্যাটার্জি একজন আমেরিকান সিটিজেন। আক্রোশের বসে সে এদের তিন বছরের মেয়ে টিঙ্কুকে নিয়ে পালিয়ে যায়। আপনার এই অফিসে সেই ব্যাপারে কেস স্টার্ট হয়, এই বলে বসুসাহেব

ডিসি ডিডিকে সেই কেস নম্বর দিলেন। আজ সেই কিড্‌নাপ গার্ল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সে এখন আমেরিকাতে সেই আসামী সুজিত চ্যাটার্জির বাড়িতে রয়েছে। কাল রাতেই টিঙ্কুর টেলিফোন পেয়ে জানতে পেরেছি। আরও জানা গেল সুজিত চ্যাটার্জি গত কাল আত্মহত্যা করেছে।

ডিসি ডিডি সলিসিটারের কাছ থেকে সব শুনে সেই পুরনো কেস-ফাইল আনিয়ে সব খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়ের স্বরে বললেন—আশ্চর্য্য! ইন্‌ভেসটিগেশন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে—আসামী সুজিত চ্যাটার্জি একাই আমেরিকাতে পালিয়ে গিয়েছিল, সে তো কোন বেবী নিয়ে যায় নি। তার কাছে তো কোন বেবীর পাসপোর্ট ছিল না। এটা কী করে সম্ভব হোলো? সেই মেয়েটি টিঙ্কু এখন আমেরিকাতে। সেই আসামীর বাড়িতে?

একজন সিনিয়ার ইন্‌সপেক্টারকে ডেকে, ডিসি ডিডি এই কেসের ব্যাপার সব কিছু বুঝিয়ে বলে, অবশেষে ভ্রু-যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করে বললেন—মেয়েটিকে যখন কিডনাপ করে ছিল তখন তার বয়স ছিল তিন বছর, আর এখন ওর বয়স হয়েছে বাইশ বছর। এখন সে সাবালিকা খালি ওর একটা জবানবন্দী নেওয়া দরকার। আসামী তো সুইসাইড করেছে, কাজেই আমাদের আর কিছু করণীয় নেই। তবে ডিটেল রিপোর্ট দিয়ে কেসটা ফাইল করতে হবে। আপনি মিষ্টার ও মিসেস সেনকে নিয়ে আজই আমেরিকাতে রওনা হয়ে যান। ওদেরকে নিয়ে পাশপোর্ট আফিসে গিয়ে তিনখানা পাশপোর্ট করে, আমেরিকান এম্‌বাসিতে গিয়ে ভিসা নিয়ে আজই রাত্রের ফ্লাইটে রওণা হয়ে যান। যা ফরেণ-কারেন্সি দরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে নিন। আমি কেস ফাইলে সব অর্ডার লিখে দিয়েছি। কোন অসুবিধা হবে না। এই বলে সেই কেস ফাইল ডিসি ডিডি সেই অফিসারকে দিলেন।

ইন্‌সপেক্টার গুহ, মিষ্টার ও মিসেস্ সেনকে নিয়ে ডিসি ডিডির

অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। সলিসিটার বাসুসাহেবও ওই অফিস থেকে বেরিয়ে মিষ্টার এবং মিসেস সেনকে বললেন—'ওই দেশে গিয়ে যদি কোন অসুবিধা হয় তবে আমাকে ফোনে জানাবেন। এই বলে বাসুসাহেব তাঁর অফিসে চলে গেলেন।

পাশপোর্ট, ভিসা, এয়ার টিকিট সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর অপরাহ্নে মিসেস্ সেন ফোনে টিঙ্কুকে জানিয়ে দিলেন কবে কোন সময় ওরা ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে পৌঁছাবে। টিঙ্কু উচ্ছল হয়ে মামিজীকে জিজ্ঞাসা করল—মামিজী আমি তো এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছি—আমাকে এতদিন পর দেখে কী চিনতে পারবে? মামিজী কোমল-কণ্ঠে বললেন—তুই তো আমার মেয়ে, তোকে কেন চিনতে পারবে না? সময় হয়ে যাওয়াতে ফোন কেটে গেল।

ফোনে মামিজীর কথা মত টিঙ্কু নির্দিষ্ট সময়ে একাই একটা ক্যাব নিয়ে ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে এসে তার পাপাজী ও মামিজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। উদয় টিঙ্কুর সাথে এয়ারপোর্টে যেতে চেয়েছিল। টিঙ্কু উদয়কে বলেছিল—এখনি আমার সাথে তোমার এয়ারপোর্টে যাওয়া পাপাজী ও মামিজীর কাছে ভাল নাও লাগতে পারে। বাড়িতে এসে তোমার সাথে আলাপ-পরিচয় হবে এইসব বিবেচনা করে টিঙ্কু একাই এয়ারপোর্টে গিয়েছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে কলকাতা থেকে প্লেনটি ডেটরয়েট এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। সব যাত্রীরাই একে একে প্লেন থেকে নেমে এলো।

টিঙ্কু উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তাকিয়ে দেখল সব যাত্রীদেরকে, কিন্তু ওর পাপাজী বা মামিজীকে বড় হয়ে কোন দিন দেখেনি—তাই চিনতে পারল না। তারপর কাস্টম বেষ্টনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

দূর থেকে টিঙ্কুকে দেখে, টিঙ্কুর সেই কালো বিউটি স্পট দেখতে পেয়ে, মিসেস্ মিলি সেনের চক্ষুদ্বয় আনন্দে ঈষৎ বিস্ফারিত হলো। ক্ষণকাল হতবাক থেকে, আবেগভরে টিঙ্কুকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

উদ্ভাসিত নয়নে তাকিয়ে বলল—তুই এতোদিন কোথায় পালিয়ে ছিলি আমাকে ছেড়ে ?

টিঙ্কুর নয়ন-যুগল আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, ওরা উভয়েই আনন্দে আত্মহারা হল, উভয়েরই নয়ন-যুগল হতে অশ্রুবারি স্রোতের মত প্রভাহিত হতে লাগল।

ক্ষণকাল পরে মিসেস্ সেন আত্মস্থ হলে, টিঙ্কুকে ভেজা ভেজা গলায় বললেন—তোমার পাপাজীকে প্রণাম কর। টিঙ্কু ওর পাপাজীর কাছে গিয়ে পা-ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সেই পুলিশ ইন্‌সপেকটর যিনি কলকাতা থেকে এসেছিলেন—তিনি মিষ্টার সেনকে বললেন—আপনাদের মানষিক অবস্থা আমি বেশ উপলব্ধি করতে পারছি আমি আপনাদের বেশী সময় নষ্ট করব না। টিঙ্কুকে দুই, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, মর্গে সুজিত চ্যাটার্জির ডেড্‌বডি দেখে, ফিরে যাব। আমার আর কিছু করণীয় নেই।

টিঙ্কুর কাছ থেকে যা জানবার সেইসব কথা জিজ্ঞেস করে। সেই অফিসার চলে গেলেন।

টিঙ্কু ওর পাপাজী ও মামিজীকে নিয়ে একটা ক্যাব ভাড়া করে উদয়ের বাড়িতে চলে এলো। টিঙ্কু যে ঘরে শয়ন করত, সেই ঘরে ওর পাপাজী ও মামিজীকে নিয়ে এসে বলল—আমি এই ঘরে এই তিন দিন ধরে একাই থাকি, আর উদয় ওর ড্যাড্ সুজিত চ্যাটার্জির ঘরে থাকে, আমি উদয়কে ডেকে নিয়ে আসছি তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। এই বলে টিঙ্কু উদয়কে ডেকে নিয়ে এসে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলল—এত বছর পরে আমি আমার পাপাজী আর মামিজীকে ফিরে পেলাম।

অলক সেন উদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল—একটি কমনীয় কান্তি তরুণ যুবক।

উদয় ক্ষণকাল নীরব থেকে দুজনের পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে আবেগ-

ভরে বলল—আমার তো আর কেউ নেই, আপনাদেরকে আমিও পাপাজী ও মামিজী বলে ডাকব।

মিসেস্ সেনের হৃদয়-স্পর্শ করল না। তিনি উদয়ের কথায় উদ্ধতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের কী দুজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে? তোমরা কী এখন স্বামী-স্ত্রীর মত আছ?

এই কথা শুনে উদয়ের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ক্ষণকাল নীরব থেকে ঈষৎ হেসে উত্তর দিল, টিঙ্কুর জীবনের ঘটনা খুবই করুণ। আপনি টিঙ্কুর কাছ থেকেই সব শুনবেন। তবে যে কথাটি আপনি জানতে চেয়েছেন, আপনার জ্ঞাতার্থে আমি জানাচ্ছি—আমাদের মধ্যে বিয়ে নিয়ে কোনদিন আলোচনা হয় নি। আলোচনা করবার ফুরসৎ আমরা পাই নি। তবে টিঙ্কুকে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এই কয়েক মাস হোলো আমাদের ম্যারেজ রেজেস্ট্রি হোয়েছে। সেটা একটা গোপন দলিল মাত্র সেই গোপন দলিলের সাহায্যে লণ্ডন এয়ারপোর্ট থেকে টিঙ্কুকে দুবৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছি। এখন আপনারা এসে টিঙ্কুর সব দায়িত্ব নিয়েছেন, এখন আর সেই গোপন দলিলের কোন প্রয়োজন নেই। এই বলে উদয় অবনত মুখে পকেট থেকে সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সারটিফিকেট বের করে সকলের সামনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

মিষ্টার অলক সেন তাকিয়ে দেখল—উদয়ের মুখমণ্ডলে দৃপ্ত সতেজ সত্যের ছাপ।

টিঙ্কু গভীর নিশীথের অন্ধকারের মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকল উদয়ের দিকে।

তারপর মিষ্টার ও মিসেস্ সেনের দিকে করুণ-নয়নে তাকিয়ে আবেগভরে উদয় বলল—আমার দু-মাস বয়স থেকে আমি পিতৃ-মাতৃ হারা, ব্যাংলোরে মিশনারিসদের কাছে, নান্‌দের কাছে মানুষ

হয়েছি। শেষে কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ কারেছি। এই বৎসর সর্বভারতীয় মেডিকেল ছাত্রদের ত্রিবার্ষিকী সম্মেলন এই কলকাতারই উপকণ্ঠে উদযাপীত হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে টিঙ্কুর সাথে আমার আলাপ হয়। একদিন গঙ্গার তটে বসা ওর আতঙ্কগ্রস্ত মুখমণ্ডল দেখে, ওকে জিজ্ঞাসা করাতে ওর বিপদের কথা, দুঃখের কথা জ্ঞাতো হলাম। স্থির করলাম ওকে দুবৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করতে। এই রেজিস্টেশন ম্যারেজ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় দেখলাম না, সেই জন্যই আমরা রেজেস্ট্রি ম্যারেজ করে ছিলাম। আমি কোন দিনই স্বামীত্বের দাবীর কথা চিন্তা করি নাই।

আমার ড্যাড্ তার মৃত্যুকালিন চিঠিতে তার অপরাধের কথা, পাপের কথা সব স্বীকার করে গিয়েছেন। টিঙ্কু সেই চিঠি পড়েছে। সেই চিঠি এখন এখানকার পুলিশের কাছে, তিনি আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন।

তারপর উদয় অশ্রু-সজল-নয়নে উদাস দৃষ্টিতে টিঙ্কুকে বলল—তুমি তোমার হারানো পাপাজী ও মামিজীকে ফিরে পেলে আর আমি একা হয়ে গেলাম। পৃথিবীতে আমার নিজের লোক বলতে আর কেউ থাকল না। আমি আবার ব্যাংলোরে মিশনারিস ফাদারের কাছে ফিরে যাব এবং মিশনারিসদের মত জীবন-যাপন করব। আর তোমার যদি আমাকে কোন সময় প্রয়োজন হয়—দ্বিধা না করে আমাকে খবর দিও, আমি চিরজীবন তোমারই থাকব। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, এই বলে উদয় অবনত মস্তকে ওর ঘরে চলে গেল।

উদয়ের শেষ কথাগুলো দূরাগত বংশীধ্বনীর ন্যায় টিঙ্কুর চিত্তলোকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

উদয়ের এই নির্ভীক স্পষ্ট কথা শুনে সকলের মনের মধ্যে একটা উত্তাল বেদনার ঢেউ ফুটে উঠল। খালি সেই বেদনার ঢেউ পৌছল না মিসেস্ মিলি সেনের হৃদয়-মন্দিরে।

উদাস করা নিঃশব্দ ভাব ভঙ্গ করে মিসেস্ সেন আগুন-ঝরা

দৃষ্টিতে বললেন—এখানে বসে আর কারুর কোন কথা শুনব না। কালই সকালের ফ্লাইটে আমরা রওনা হবো। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না, তারপর মিষ্টার অলক সেনকে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তুমি এখনি গিয়ে কালকে আমাদের যাবার সব বন্দবস্ত করে ফেল।

মিষ্টার অলক সেন বি. ও. এ. সি অফিসের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে কাল সকালের ফ্লাইটে যাবার সব বন্দবস্ত করে টিঙ্কুর ঘরে এসে দেখলেন—টিঙ্কুর মামিজী ওকে কোলে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে, তুজনেরই নয়ন-যুগলে আনন্দাশ্রু।

সেই রাত্রে ওদের কারুর চোখে ঘুম এলো না। বিনিদ্রায় রজনী কাটিয়ে দিল, খালি টিঙ্কুর সাথে কথা বলে। ওরা টিঙ্কুর কাছ থেকে শুনলো—উদয় কী করে দুবৃত্তর কবল থেকে লণ্ডন এয়ারপোর্টে গিয়ে টিঙ্কুকে উদ্ধার করে এনেছে, আর সেই দিনই টিঙ্কুকে দেখে সুজিত চ্যাটার্জি আত্মহত্যা করলো। কিন্তু মিসেস সেনের মনে একটুকুও রেখাপাত হল না। কথা বলতে বলতে টিঙ্কু ওর মামিজীর কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে [illegible] ওরা ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এলেন। সকলেই লাউঞ্জে বসলেন! একটা স্বস্তির নিশ্বষ ফেলে মিসেস্ সেন বললেন—ওই কুখ্যাত বাড়ি থেকে চলে এসে অনেক মনে শান্তি পাচ্ছি। হাসিভরা মুখে টিঙ্কুকে বললেন—উদয় যতই তোমার উপকার করুক—যখন মনে হয় উদয় সুজিত চ্যাটার্জির পুত্র তখনি আমার মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

প্লেন ছাড়তে আর মাত্র পনের মিনিট বাকি। সব যাত্রীরা প্লেনে ওঠবার জন্য লাউঞ্জ থেকে প্লেনের দিকে এগোচ্ছে। ওরাও তিন জনে উঠে দাঁড়ালেন। ওরা সেই সময় তাকিয়ে দেখলেন—উদয় খুব জোরে তাদের দিকে হেঁটে আসছে। ওরা আর প্লেনের দিকে না এগিয়ে ক্ষণকাল দাঁড়ালেন। পা-ছুঁয়ে মিষ্টার ও মিসেস

সেনকে প্রণাম করে উদয় বেদনাময় মুখমণ্ডলে বলল—আপনারা আমাকে অপনাদের পুত্র বলে গ্রহণ করুন—

অলক সেন উদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল—মুখটা যেন শ্মশান থেকে ফেরা এক মাতৃহীন যুবকের মত।

টিঙ্কু দেখল, উদয়ের অশ্রুসজল মনটা তখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লো। মনে হলো সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে ওদের দুপাশে।

তাই দেখে মিসেস্ সেন টিঙ্কুর হাত ধরে প্লেনের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে লাগলেন

মিষ্টার সেন উদয়কে বললেন—তুমি দুঃশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। টিঙ্কুর বা তার মামিজীর এখন মনস্থির নেই। কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওদের সাথে আলোচনা করে যদি টিঙ্কু তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের বিবাহের বন্দবস্ত করবো। তুমি মন খারাপ করনা—এই বলে মিষ্টার সেনও প্লেনে ওঠবার জন্য অগ্রসর হোলো।

প্লেন গর্জন করে টেক-আপ করে দূর থেকে দূরে উড়ে চলে গেল।

উদয় সেই প্লেনের দিকে উদ্বেলিত মন নিয়ে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকল। মনে হলো ওর হৃদয় ও দেহের থেকে বেরিয়ে ওই প্লেনের সাথে ছুটে চলে গেল।

সমাপ্ত